উন্মীলন

বার্ষিকী ২০২৩

ক্যান্টনমেন্ট পাবলিক স্কুল এন্ড কলেজ মোমেনশাহী

স্মরণীয় মুহূর্ত

এসএসসি পরীক্ষা ২০২৩ সালে ময়মনসিংহ বিভাগে শ্রেষ্ঠত্ব অর্জনকারী শিক্ষার্থীবৃন্দের সাথে অধ্যক্ষ মহোদয় ও শিক্ষকবৃন্দ।

ভাষা, সাহিত্য, সংস্কৃতির সমৃদ্ধি ছাড়া
কোন জাতিই উন্নতি করতে পারে না।

-বঙ্গবন্ধু

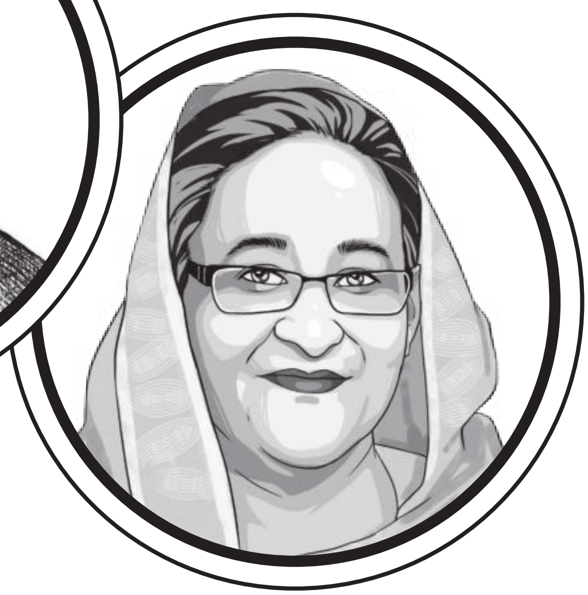

Cantonment Public School and College Momenshahi

CPSCM

بسم الله الرحمن الرحيم

পবিত্র ধর্মগ্রন্থের বাণী

رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا

হে আমার প্রতিপালক!
আমার জ্ঞান বৃদ্ধি করুন
-সুরা ত্বহা: ১১৪

CPSCM

ক্যান্টনমেন্ট পাবলিক স্কুল এন্ড কলেজ মোমেনশাহীর শিক্ষাযাত্রার শুরু থেকেই তার লক্ষ্য উদ্দেশ্য একটি মনোগ্রামে কতগুলো চিহ্নায়নের মাধ্যমে বর্ণনা করা হয়েছে। আক্ষরিকভাবে ব্যাখ্যা করলে যে বিষয়টি প্রথমেই আমাদের সামনে আসে তা হলো একটি বৃত্ত যার ব্যাকগ্রাউন্ড হলুদ। বৃত্তের মাঝে রয়েছে সবুজ পাতায় বেষ্টিত একটি খোলা বই এবং এর উপরে রয়েছে একটি প্রজ্জ্বলিত মোমবাতি। বৃত্তের ব্যাকগ্রাউন্ড হলুদ ছাড়া রয়েছে আরো চারটি রং- লাল, নীল, সবুজ এবং আকাশি। এ ছাড়াও মনোগ্রামটিতে যে বিষয়টি সুস্পষ্ট তা হলো তিনটি শব্দ -শান্তি, শৃঙ্খলা ও দেশপ্রেম এবং একটি সাল ১৯৯৩।

মনোগ্রামের বাহ্যিক ব্যাখ্যার পেছনে রয়েছে তার কিছু অন্তর্নিহিত অর্থ। হলুদ রংয়ের বৃত্তটি জ্ঞান, বিদ্যা ও শক্তির প্রতীক। সবুজ পাতাগুলো কোমলমতি শিক্ষার্থীদের প্রতীক হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে যারা প্রতিষ্ঠানের বৃত্তের মধ্যে পরম যত্নে লালিত হচ্ছে। বৃত্তের ভেতরে অপর রংগুলো লাল, নীল, সবুজ এবং আকাশি চার হাউসে বিভক্ত শিক্ষার্থীদের প্রতিটি হাউসের রং। ১৯৯৩ সালে প্রতিষ্ঠিত শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানটি সগৌরবে এগিয়ে চলছে। একটি খোলা বই -এর উপর সদা প্রজ্জ্বলিত মোমবাতিটি সঠিক শিক্ষায় শিক্ষিত হয়ে শিক্ষার্থীদের সতত দীপ্তি ছড়ানোর প্রতীক হিসেবে চিহ্নায়িত হয়েছে। শান্তি, শৃংখলা ও দেশপ্রেম শব্দ তিনটিই বলে দেয় প্রতিষ্ঠানের মূলমন্ত্র কী। এই মূলমন্ত্র বুকে ধারণ করে শিক্ষার্থীরা শান্তি ও শৃঙ্খলার সাথে শিক্ষা কার্যক্রম সমাপ্ত করে দেশপ্রেমে উজ্জীবিত হচ্ছে। নিজের জীবন আলোকিত করার সাথে সাথে সকলের মাঝে আলো ছড়াচ্ছে।

উন্মীলন

বার্ষিকী ২০২৩

ক্যান্টনমেন্ট পাবলিক স্কুল এন্ড কলেজ মোমেনশাহী

এক নজরে সিপিএসসিএম

এক নজরে আমাদের শিক্ষাঙ্গন

প্রতিষ্ঠাকাল	:	৪ মার্চ ১৯৯৩। স্কুল শাখার মাধ্যমে যাত্রা শুরু। ১৯৯৯ সালে কলেজ শাখার কার্যক্রম শুরু হয়।
মূলমন্ত্র	:	শান্তি, শৃঙ্খলা ও দেশপ্রেম
বর্তমান অধ্যক্ষ	:	লে. কর্নেল শামীম আহমেদ, পিএসসি, এএসসি
মোট শিক্ষক	:	১১৭ জন
মোট শিক্ষার্থী	:	৪৩২৫ জন
শিক্ষামাধ্যম	:	বাংলা ও ইংরেজি
শিক্ষা কার্যক্রম	:	প্রাক-প্রাথমিক (নার্সারি ও কেজি) প্রাথমিক (১ম থেকে ৫ম) মাধ্যমিক (৬ষ্ঠ থেকে ১০ম) উচ্চ মাধ্যমিক (বিজ্ঞান, মানবিক ও ব্যবসায় শিক্ষা)
সহশিক্ষা কার্যক্রম	:	বিভিন্ন বিষয়ে ২৮টি সোসাইটির মাধ্যমে সহশিক্ষামূলক কার্যক্রম পরিচালিত হয়।

প্রতিষ্ঠানের বিশেষ অর্জন

- ২০০৮ সালে ঢাকা শিক্ষা বোর্ডে অন্যতম শ্রেষ্ঠ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের মর্যাদা লাভ।
- ২০১০ সালে এইচএসসি পরীক্ষার ফলাফলে মেধা তালিকায় ১৯তম এবং ২০১১ সালে ২০তম স্থান অধিকার।
- ২০১২ সালের জেএসসি ও ২০১৩ সালের এসএসসি পরীক্ষার ফলাফলে ঢাকা শিক্ষা বোর্ডে যথাক্রমে ১৪তম ও ১৯তম স্থান অধিকার।
- ২০১৬ সালে বাংলাদেশে সকল ক্যান্টনমেন্ট পাবলিক স্কুল ও কলেজের মধ্যে সামগ্রিক বিবেচনায় মাধ্যমিক পর্যায়ে 'রানার আপ' হয়ে সেনাবাহিনী প্রধানের ট্রফি অর্জন।
- জাতীয় শিক্ষা সপ্তাহ-২০১৬ ও ২০১৭ এর মূল্যায়নে জেলা পর্যায়ে কলেজ শাখা শ্রেষ্ঠ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের গৌরব অর্জন।
- ২০২৩ সালে এসএসসি পরীক্ষায় ময়মনসিংহ বিভাগে শ্রেষ্ঠত্ব অর্জন।

প্রকাশনা পর্ষদ

প্রধান পৃষ্ঠপোষক
মেজর জেনারেল নকিব আহমদ চৌধুরী
বিএসপি (বার), এনডিসি, পিএসসি
জেনারেল অফিসার কমান্ডিং, ১৯ পদাতিক ডিভিশন
এরিয়া কমান্ডার, ঘাটাইল এরিয়া

প্রধান উপদেষ্টা
ব্রিগেডিয়ার জেনারেল দেওয়ান মোহাম্মদ মনজুর হোসেন
এসইউপি, এসপিপি, এএফডব্লিউসি, পিএসসি
কমান্ডার ৭৭ পদাতিক ব্রিগেড ও সভাপতি পরিচালনা পর্ষদ
ক্যান্টনমেন্ট পাবলিক স্কুল এন্ড কলেজ মোমেনশাহী

সম্পাদনা পর্ষদের সভাপতি
লে. কর্নেল শামীম আহমেদ, পিএসসি, এএসসি
অধ্যক্ষ
ক্যান্টনমেন্ট পাবলিক স্কুল এন্ড কলেজ মোমেনশাহী

সম্পাদক
মোঃ তারিকুল গণি, সহকারী অধ্যাপক

সম্পাদনা সহযোগী (বাংলা):
রুবীনা আজাদ, প্রভাষক
মাহবুবা নূরুন্নেছা, সিনিয়র শিক্ষক
মোঃ আমিরুল ইসলাম, সহকারী শিক্ষক

ফটোগ্রাফি ও অ্যালবাম প্রস্তুতকরণ:
ফয়সল আহমেদ, প্রদর্শক
মাঈনউদ্দীন আহমেদ মাহী, সিনিয়র শিক্ষক
মোঃ লিয়াকত আলী খান, সহকারী শিক্ষক
মুহাম্মদ জানে আলম, প্রদর্শক

রিপোর্ট তৈরি:
রাবেয়া আক্তার, প্রভাষক
আমিরুল ইসলাম, সহকারী শিক্ষক
এস.এম. সোলায়মান, জুনিয়র শিক্ষক

কম্পোজ
মোঃ রেজাউল করিম, নিম্নমান সহকারী
মোঃ গোলাম সারোয়ার, নিম্নমান সহকারী
মোঃ মশিউর রহমান, নিম্নমান সহকারী

সহ-সম্পাদক
মাহবুবা নূরুন্নেছা, সিনিয়র শিক্ষক

সম্পাদনা সহযোগী (ইংরেজি):
সাবিনা ফেরদৌসি, সহকারী অধ্যাপক
মোঃ মনোয়ার হোসেন, সিনিয়র শিক্ষক
মোঃ মাসুদ রানা, সিনিয়র শিক্ষক

অঙ্গ সজ্জা, গ্রাফিক্স ডিজাইন নিশ্চিতকরণ
মোঃ লিয়াকত আলী খান, সহকারী শিক্ষক
সুমাইয়া আফরিন আফসানা, সহকারী শিক্ষক
মুহাম্মদ জানে আলম, প্রদর্শক

শিক্ষার্থী প্রতিনিধি:
আহনাফ ইবনে তারিক অর্ক, শ্রেণি: ১২শ, শাখা: আই, রোল: ৬৮
ফাবিহা হক, শ্রেণি: ১২শ, শাখা: ই, রোল: ৪০৮
মো. সামিউল ইসলাম খান, শ্রেণি: ১০ম, শাখা: গ, রোল: ৭১
বর্ণি বিনতা দত্ত, শ্রেণি: ১০ম, শাখা: ক, রোল: ১৪

প্রকাশকাল
অক্টোবর, ২০২৩

ডিজাইন ও মুদ্রণ:
অর্নেট কেয়ার, ৮৭, নয়াপল্টন, ঢাকা-১০০০
ফোন: ০১৯১১৫৪৬৬১৩

CPSCM

প্রধান পৃষ্ঠপোষকের বাণী

শিশুর আত্মিক-মানসিক বিকাশে সহায়তা দিয়ে মননশীল প্রজন্ম গড়ে তোলার জন্য অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি করার অন্যতম দায়িত্ব শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের। একটি আদর্শ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান কেবল শিক্ষার্থীর একাডেমিক ভালো ফলাফলই নিশ্চিত করে না, বরং পাঠ্যক্রমের পরিপূরক সহপাঠক্রমিক শিক্ষাকে সমান গুরুত্ব দিয়ে শিক্ষার্থীর পরিপূর্ণ বিকাশকে নিশ্চিত করে। ক্যান্টনমেন্ট পাবলিক স্কুল এন্ড কলেজ মোমেনশাহী শিক্ষার্থীদের সৃষ্টিশীলতার বিকাশে সহপাঠক্রমিক কার্যক্রমের অংশ হিসেবে প্রতিবছরের ধারাবাহিকতায় এবারও বার্ষিক মুখপত্র 'উন্মীলন' প্রকাশ করছে জেনে আমি অত্যন্ত আনন্দিত।

এই মাহেন্দ্রক্ষণে আমি গভীর শ্রদ্ধাভরে স্মরণ করছি বাঙালি জাতির অবিসংবাদিত নেতা, স্বাধীনতার স্বপ্নদ্রষ্টা জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে, যাঁর নেতৃত্বে আমরা পেয়েছি আমাদের প্রিয় মাতৃভূমি বাংলাদেশ। আমি আশা করি, শিশুমনের সুপ্ত প্রতিভা বিকাশের মাধ্যমে আজকের শিশুদের ভবিষ্যৎ-এর জন্য প্রস্তুত করতে এই প্রকাশনা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে। 'উন্মীলন' এর পাতায় পাতায় আমাদের শিশুদের লেখায় ভাষাসংগ্রাম ও মুক্তিযুদ্ধের চেতনা এবং স্বদেশপ্রেমের প্রতিফলন ঘটেছে, যা প্রকৃতপক্ষে এই বার্ষিকী প্রকাশের আসল উদ্দেশ্যকে মহিমান্বিত করে তুলেছে।

'উন্মীলন-২০২৩' প্রকাশের পিছনে সভাপতি, অধ্যক্ষসহ যাদের মেধা, মনন ও সৃষ্টিশীল প্রয়াস রয়েছে তাদের সকলকে জানাই আন্তরিক অভিনন্দন।

মহান আল্লাহ তা'আলার নিকট এই প্রতিষ্ঠানের সকল সদস্যের উত্তরোত্তর সাফল্য, সমৃদ্ধি ও মঙ্গল কামনা করছি। মহান আল্লাহ আমাদের সকলের সহায় হোন।

জয় বাংলা

মেজর জেনারেল নকিব আহমদ চৌধুরী, বিএসপি (বার), এনডিসি, পিএসসি

জেনারেল অফিসার কমান্ডিং, ১৯ পদাতিক ডিভিশন ও এরিয়া কমান্ডার, ঘাটাইল এরিয়া

এবং

প্রধান পৃষ্ঠপোষক

ক্যান্টনমেন্ট পাবলিক স্কুল এন্ড কলেজ মোমেনশাহী

সভাপতির বাণী

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম

ক্যান্টনমেন্ট পাবলিক স্কুল এন্ড কলেজ মোমেনশাহী প্রতিবছরের মতো এবারও বার্ষিক ম্যাগাজিন 'উন্মীলন' প্রকাশ করতে যাচ্ছে জেনে আমি অত্যন্ত আনন্দিত।

শিক্ষার উদ্দেশ্যই হচ্ছে মানুষের ভেতর বিরাজমান সুপ্ত সম্ভাবনাকে উন্মীলিত করা। শুভবোধসম্পন্ন মানবিক মানুষ গড়ে তুলতে হলে প্রতিটি শিক্ষার্থীকে তার অন্তর্নিহিত সৃজন-প্রতিভা বিকাশের সুযোগ দিতে হবে। তাদের ভেতর যে অমিত সম্ভাবনা রয়েছে তা মুকুলিত হবার জন্য চাই উর্বর ক্ষেত্র আর যথাযথ পরিচর্যা। আর সেকারণেই আমাদের দেশে শিক্ষা ব্যবস্থায় নিয়মিত পাঠ্যক্রমের পাশাপাশি সৃজনশীল শিক্ষায় গুরুত্বারোপ করা হয়েছে। ক্যান্টনমেন্ট পাবলিক স্কুল এন্ড কলেজ মোমেনশাহী এ ব্যাপারে বরাবরই দায়িত্বশীল ভূমিকা পালন করে এসেছে। 'উন্মীলন' একদিকে যেমন শিক্ষার্থীদের মননশীলতা ও সৃজনশীলতার স্বাক্ষর বহন করে অন্যদিকে তেমনি প্রতিষ্ঠানের বছরব্যাপী কর্মকাণ্ডের একটি অমূল্য সংকলন হিসেবেও এর আত্মপ্রকাশ ঘটে।

কোমলমতি শিক্ষার্থীরা তাদের লেখায়, আঁকায় সুকুমার মনের ভাবনাগুলোকে রূপায়িত করেছে উন্মীলনের পাতায় পাতায়। আমি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি এর সীমিত পরিসরে আজ যাদের সাহিত্যের পথে যাত্রা শুরু হলো, অদূর ভবিষ্যতে তারা বৃহত্তর অঙ্গনে পরিভ্রমণ করবে।

পরিচালনা পরিষদের সভাপতি হিসেবে আমি আন্তরিকভাবে প্রত্যাশা করি এ প্রতিষ্ঠানের সাফল্যের গৌরবোজ্জ্বল ঐতিহ্য এবং সর্বজনবিদিত ধারাবাহিক সুখ্যাতি অব্যাহত থাকবে অনন্তকাল।

পরিশেষে এ নান্দনিক প্রকাশনাটির সাথে সংশ্লিষ্ট সকলকে জানাই আন্তরিক ধন্যবাদ এবং অভিনন্দন। উন্মীলিত হোক প্রতিটি শিক্ষার্থীর মন ও মনন।

মহান আল্লাহ আমাদের সহায় হোন।

ব্রিগেডিয়ার জেনারেল দেওয়ান মোহাম্মদ মনজুর হোসেন, এসইউপি, এসপিপি, এএফডব্লিউসি, পিএসসি
কমান্ডার, ৭৭ পদাতিক ব্রিগেড, মোমেনশাহী সেনানিবাস
এবং
সভাপতি, পরিচালনা পর্ষদ
ক্যান্টনমেন্ট পাবলিক স্কুল এন্ড কলেজ মোমেনশাহী

অধ্যক্ষের বাণী

'উন্মীলন'-২০২৩ প্রকাশের এই শুভক্ষণে প্রথমেই আমি শ্রদ্ধাভরে স্মরণ করছি স্বাধীন ও সার্বভৌম বাংলাদেশের মহান স্থপতি, হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ বাঙালি, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে। শ্রদ্ধাভরে স্মরণ করছি মহান মুক্তিযুদ্ধে আত্মোৎসর্গকারী সকল শহিদ ও বীর মুক্তিযোদ্ধাদের। একইসাথে কৃতজ্ঞচিত্তে স্মরণ করি এ প্রতিষ্ঠানের সকল সদস্যসহ প্রাক্তন ও বর্তমান শিক্ষার্থীদের, যাদের অক্লান্ত পরিশ্রমে ক্যান্টনমেন্ট পাবলিক স্কুল এন্ড কলেজ মোমেনশাহী আজকের এই অবস্থানে এসেছে।

পাঠ্যপুস্তকনির্ভর শিক্ষার পাশাপাশি সহপাঠক্রমিক শিক্ষা ও সুকুমারবৃত্তির বিকাশ ঘটিয়ে সৃষ্টিশীল আলোকিত মানুষ হিসেবে গড়ে তুলতে বার্ষিকীর ভূমিকা অপরিসীম। ক্যান্টনমেন্ট পাবলিক স্কুল এন্ড কলেজ মোমেনশাহী প্রতি বছরের ন্যায় এ বছরও প্রকাশ করল বার্ষিক সাময়িকী 'উন্মীলন -২০২৩', যা প্রতিষ্ঠানের বছরব্যাপী কর্মকাণ্ডের স্মারক। প্রযুক্তিবেষ্টিত প্রগতিশীল এই প্রজন্মকে শিল্প, সাহিত্য ও সংস্কৃতি চর্চার মাধ্যমে মানবিক বোধসম্পন্ন ও মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় বলিষ্ঠ দেশপ্রেমিক নাগরিক হিসেবে গড়ে তোলা আমাদের দায়িত্ব। সে লক্ষ্যেই লেখাপড়ার পাশাপাশি খেলাধুলা ও সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডকে আমরা করেছি বেগবান। তাই খেলাধুলা, শিল্প-সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক অঙ্গনে বিভাগীয় ও জাতীয় পর্যায়ে আমাদের এই প্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থীদের রয়েছে গৌরবোজ্জ্বল পদচারণা।

আমার বিশ্বাস, এই বার্ষিকীতে যে সকল কোমলপ্রাণ তাদের অনুভূতিগুলো বিচিত্রভাবে রূপে-রঙে ব্যক্ত করেছে, তারাই হয়তো আগামীতে শিল্প-সাহিত্যের বৃহত্তর অঙ্গনে নিজেদের শ্রেষ্ঠত্বের স্বাক্ষর রাখবে। একাডেমিক ভালো ফলাফল অর্জনের পাশাপাশি প্রতিটি শিক্ষার্থীকে ন্যায়, সত্য ও সুন্দরের চর্চার মধ্য দিয়ে নৈতিক ও মানবিক মূল্যবোধের চেতনায় শাণিত করে বিবেকবান সুনাগরিক হিসেবে গড়ে তুলতে আমরা বদ্ধপরিকর। শিল্প ও সাহিত্যে মুক্তবুদ্ধিরচর্চা ও সুকুমারবৃত্তির বিকাশের মাধ্যমে আজকের শিক্ষার্থীরাই নৈতিক সংকট থেকে পরিত্রাণের পথ দেখাবে; মানবতা ও বিশ্বশান্তি প্রতিষ্ঠায় অবদান রাখবে-এই আশাবাদ ব্যক্ত করছি।

প্রতিষ্ঠানের সম্মানিত প্রধান পৃষ্ঠপোষক ও পরিচালনা পর্ষদের সম্মানিত সভাপতি মহোদয়ের প্রতি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি বার্ষিকী প্রকাশে সার্বিক সহযোগিতার জন্য। বার্ষিকী প্রকাশের জন্য সম্পাদকসহ যারা নিরলসভাবে কাজ করেছেন সেই সকল শিক্ষক, শিক্ষার্থী, কর্মকর্তা ও কর্মচারীকে জানাই আন্তরিক ধন্যবাদ। সর্বোপরি যাদের লেখায় এ বার্ষিকী সমৃদ্ধ হয়েছে তাদের প্রতি রইল আমার শুভকামনা ও অভিনন্দন।

মহান রাব্বুল আলামিন আমাদের সহায় হোন।

লে. কর্নেল শামীম আহমেদ, পিএসসি, এএসসি
অধ্যক্ষ
ক্যান্টনমেন্ট পাবলিক স্কুল এন্ড কলেজ মোমেনশাহী

সম্পাদনা পর্ষদ

সম্পাদকীয়

শিশু সাহিত্যের ভুবন গঠিত হয় কল্পনা ও বাস্তবের মিশ্রণে। শিশুদের কল্পনাবিলাসী মন তাদেরকে গৃহপ্রাঙ্গনের নিছক বাস্তবতাকে ছাড়িয়ে আকাশচারী হওয়ার স্বপ্নে বিভোর করে তোলে। বয়স বৃদ্ধির সাথে সাথে শিশু-কিশোরদের এই কল্পনাবিলাসী মন কল্পনার জগৎ ছেড়ে অভিযান ও আবিষ্কারের লক্ষ্যে পুনরায় বাস্তব জগতে প্রবেশ করে এবং আত্ম-আবিষ্কারে, নিজের অস্তিত্ব ও নিজস্বতা বুঝতে প্রয়াসী হয়।

শিশু মনস্তত্ত্বের প্রতিফলনের জন্য বা শিশু মনোরাজ্যের ভাবগত বিষয়গুলো প্রকাশের জন্য একটি ক্ষেত্র অত্যাবশ্যক। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের বার্ষিকী শিশুদের মনে সাহিত্যের উদ্ভব ও বিকাশের জন্য একটি স্বল্পবিস্তৃত বাহন। প্রতি বৎসর আমাদের ক্যান্টনমেন্ট পাবলিক স্কুল এন্ড কলেজ মোমেনশাহী শিশু মনের কল্পনা বিলাসকে প্রাধান্য দিয়ে বার্ষিকী 'উন্মীলন' প্রকাশ করে থাকে। ফি বছরের ন্যায় এবারও প্রতিষ্ঠানের বার্ষিকীতে খুদে সাহিত্য রচয়িতাদের অপরিণত মন, শিল্পবোধ ও বুদ্ধিবৃত্তির প্রতিফলন লক্ষণীয়। এছাড়াও কিছু পরিণত মনের অনুভূতির প্রকাশ এই বার্ষিকীটিকে বিশেষত্ব দান করেছে। এই বার্ষিকীতে স্থান পেয়েছে নিজস্ব ইতিহাস, ঐতিহ্য, সংস্কৃতি, ধ্যান-ধারণাপ্রসূত লেখা। খুদে এই লেখকবৃন্দ তাদের সৃজনশক্তি ব্যবহার করে নিজস্ব পরিমণ্ডল ছাড়িয়ে বিশ্ব পরিমণ্ডলে ভ্রমণ করেছে। ছোট্ট ছোট্ট কোমলমতি শিশুরা হয়তো গল্পের অভিনব প্লট নির্মাণে বা সূক্ষ্ম জীবনবোধের বহিঃপ্রকাশে বা মননধারার বিশ্লেষণের দক্ষ রূপকার নয় কিন্তু ব্যক্তি-স্বাতন্ত্রের প্রকাশের জন্য তাদের যে চেষ্টা তা আসলেই বিস্ময়কর। আঙ্গিক ও শিল্পগত রূপের দিক দিয়ে তাদের লেখাগুলো খুবই অপরিপক্ব বা লেখাগুলো হয়তো ঋদ্ধরূপ পায়নি কিন্তু মানবজীবনের ব্যক্তিত্ব বিকাশের এই বাহনটিতে তারা তাদের মননের প্রতিফলন ঘটাতে চেষ্টা করেছে।

এই বার্ষিকীটি প্রকাশে প্রতিষ্ঠানের সাথে সংশ্লিষ্ট সকল পর্যায়ের ব্যক্তিবর্গের অবদান অনস্বীকার্য। প্রথমেই আমি সশ্রদ্ধ কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি প্রতিষ্ঠানের সম্মানিত প্রধান পৃষ্ঠপোষক মহোদয়ের প্রতি যিনি সুদূর ঘাটাইলে থেকে আমাদের উৎসাহ উদ্দীপনা দিয়েছেন এবং বাণী পাঠিয়ে আমাদের বার্ষিকীটিকে করেছেন সমৃদ্ধ। পরিচালনা পর্ষদের সম্মানিত প্রাক্তন ও বর্তমান সভাপতি মহোদয়ের প্রেষণা এবং অধ্যক্ষ মহোদয়ের সুচিন্তিত দিকনির্দেশনা বার্ষিকী প্রকাশে দিয়েছে গতিময়তা। আমি আরও কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি সম্পাদনার সাথে প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষভাবে জড়িত আমার সকল সহকর্মীকে। এছাড়াও সকল পর্যায়ের কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের পরিশ্রমের জন্য আমি কৃতজ্ঞ।

শিশু-কিশোরদের লেখা নিয়ে প্রকাশিত একটি বার্ষিকীর সম্পাদনা সত্যিই একটি দুরূহ কাজ। কাজটি দুরূহ এজন্যই যে প্রথমত স্থান সংকুলানের অভাবে সকল খুদে লেখকের লেখা ছাপানো যায়নি। দ্বিতীয়ত অপরিণত মনের উচ্ছ্বাসের যে প্রকাশ তাতে পরিণত মনের কলমের কোন আঁচড় ফেলব কিনা সে ব্যাপারে ছিলাম দ্বিধান্বিত। অবশেষে ছোট্ট সোনামণিদের লেখাগুলো তাদের মতো করে ছাপিয়ে দিলাম। সকল প্রকার দায়ভার কাঁধে নিয়ে বিজ্ঞ পাঠকবৃন্দের প্রতি আকুল আবেদন, এই বার্ষিকীর ভুলভ্রান্তি উপেক্ষা করে এই নবীন লেখকদের উৎসাহিত করবেন। আর সেখানেই হয়তো সম্পাদক হিসেবে আমার সকল পরিশ্রমের কিছুটা সার্থকতা খুঁজে পাব।

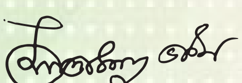

মোঃ তারিকুল গণি
সহকারী অধ্যাপক
সম্পাদক, উন্মীলন ২০২৩

পরিচালনা পর্ষদ

ব্রিগেডিয়ার জেনারেল দেওয়ান মোহাম্মদ মনজুর হোসেন, এসইউপি, এসপিপি, এএফডব্লিউসি, পিএসসি
কমান্ডার ৭৭ পদাতিক ব্রিগেড মোমেনশাহী সেনানিবাস
সভাপতি
পরিচালনা পর্ষদ, ক্যান্টনমেন্ট পাবলিক স্কুল এন্ড কলেজ মোমেনশাহী

মেজর আবু শাকিক
স্টেশন স্টাফ অফিসার, স্টেশন সদর দপ্তর
ময়মনসিংহ সেনানিবাস
সদস্য

মেজর মো. সাব্বির হাসান, পিএসসি
জিএসও-২ (শিক্ষা), ১৯ পদাতিক ডিভিশন
শহীদ সালাহউদ্দীন সেনানিবাস, ঘাটাইল
সদস্য

সুমনা আল মজীদ
ক্যান্টনমেন্ট এক্সিকিউটিভ অফিসার
ময়মনসিংহ সেনানিবাস
সদস্য

খন্দকার মাহবুব আলম
সিআইপি, ময়মনসিংহ
সদস্য
অভিভাবক প্রতিনিধি, কলেজ শাখা

ফারহানা ফেরদৌস
সহকারী অধ্যাপক, আনন্দমোহন সরকারি কলেজ
সদস্য
মহিলা অভিভাবক প্রতিনিধি, স্কুল শাখা

ডা. মামুনুর রশীদ
সহযোগী অধ্যাপক
অর্থোপেডিক্স সার্জারি বিভাগ সিবিএমসিবি
সদস্য
অভিভাবক প্রতিনিধি, স্কুল শাখা

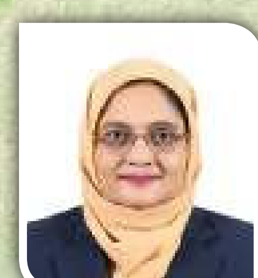

নাসরিন পারভীন
সহকারী অধ্যাপক
ক্যান্টনমেন্ট পাবলিক স্কুল এন্ড কলেজ মোমেনশাহী
সদস্য
শিক্ষক প্রতিনিধি, কলেজ শাখা

মোহাম্মদ ফারুক মিঞা
সিনিয়র শিক্ষক
ক্যান্টনমেন্ট পাবলিক স্কুল এন্ড কলেজ মোমেনশাহী
সদস্য
শিক্ষক প্রতিনিধি, স্কুল শাখা

লে. কর্নেল শামীম আহমেদ,
পিএসসি, এএসসি
অধ্যক্ষ
ক্যান্টনমেন্ট পাবলিক স্কুল এন্ড কলেজ মোমেনশাহী
সদস্য সচিব

কৃতজ্ঞচিত্তে যারা স্মরণীয়

প্রাক্তন প্রধান পৃষ্ঠপোষকবৃন্দ

BA-201
Maj Gen Muhammad Ainuddin
BP, psc
16 Oct 1992 to 21 May 1996

BA-207
Maj Gen Muhammad Matiur Rahman
BP
25 May 1996 To 29 Jan 1997

BA-679
Maj Gen Syeen Ahmed
BP, awc, psc
04 Feb 1997 To 09 Jan 1998

BA-713
Maj Gen Muhammed Masudur Rahman
BP, nwc, psc
17 Feb 1998 To 06 Jan 1999

BA-569
Maj Gen M Harun-Ar-Rashid
BP, reds, psc
07 Jan 1999 To 06 Mar 2000

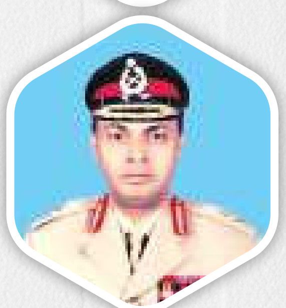

BA-1136
Maj Gen ATM Zahirul Alam
psc
07 Mar 2000 To 15 Feb 2001

BA-1083
Maj Gen NA Rafiqul Hossain
psc
16 Feb 2001 To 02 Dec 2001

BA-910
Maj Gen ASM Nazrul Islam
ndu, psc
9 Jan 2002 To 23 Mar 2002

BA-1137
Maj Gen Moeen U Ahmed
psc
24 Mar 2002 To 09 Jan 2003

BA-1466
Maj Gen Iqbal Karim Bhuiyan
psc
04 Feb 2003 To 03 Aug 2004

BA-1559
Maj Gen Mohammad Ishtiaq
ndc, psc
04 Aug 2004 To 07 May 2007

BA-1895
Maj Gen AKM Muzahid Uddin
ndu, afwc, psc
26 May 2007 To 19 Mar 2009

BA-1738
Mai Gen Abu Belal Muhammad Shafiul Hug
ndc, psc
15 Mar 2009 To 19 Nov 2009

BA-1629
Mai Gen Mohammad Mahboob Haider Khan
ndc, psc
20 Nov 2009 To 04 Apr 2012

BA-2496
Maj Gen SM Shafiuddin Ahmed
ndu, psc
07 May 2012 To 14 Aug 2013

BA-2659
Mai Gen Md Shafiqur Rahman
SPP, afwc, psc
14 Aug 2013 To 17 Feb 2015

BA-2593
Maj Gen Firoz Hasan
ndu, psc
22 Mar 2015 To 16 Apr 2016

BA-2582
Maj Gen Sajadul Haque
afwc, psc
05 May 2016 To 10 Aug 2018

BA-3319
Maj Gen Mizanur Rahman Shameem
BP, OSP, ndc, psc
11 Aug 2018 To 06 Aug 2020

BA-3422
Maj Gen Shakil Ahmed
Spp, nswc, afwc, psc
07 Aug 2020 To 06 Jan 2021

BA-3653
Maj Gen Syed Tareq Hussain
awc, psc
07 Jan 2021 To 22 Mar 2022

প্রাক্তন সভাপতিবৃন্দ

বিএ-২৭২
ব্রিগেডিয়ার জেনারেল
এজাজ আহমেদ চৌধুরী
পিএসসি
২৬ ফেব্রুয়ারি হতে ০৪ আগস্ট ১৯৯৩

বিএ-৮৩৩
ব্রিগেডিয়ার জেনারেল
মোঃ জিল্লুর রহমান
পিএসসি
২৪ সেপ্টেম্বর ১৯৯৩ হতে ২১ মে ১৯৯৬

বিএ-১১৩৮
ব্রিগেডিয়ার জেনারেল
খোন্দকার কামালুজ্জামান
এনডিসি, পিএসসি
২২ মে ১৯৯৬ হতে ০৫ জানুয়ারি ১৯৯৯

বিএ-১৫৭০
কর্নেল
মোঃ রফিকুল আলম
পিএসসি
২৫ জানুয়ারি ১৯৯৯ হতে ০৩ সেপ্টেম্বর ২০০০

বিএ-১৫৭০
ব্রিগেডিয়ার জেনারেল
মোঃ রফিকুল আলম
পিএসসি
০৪ সেপ্টেম্বর ২০০০ হতে ১৮ ফেব্রুয়ারি ২০০১

বিএ-১৭০৩
কর্নেল
মোজাফফর আহমেদ
বিবি, পিএসসি
০৮ এপ্রিল ২০০১ হতে ০৭ জুলাই ২০০১

বিএ-১৭০৩
ব্রিগেডিয়ার জেনারেল
মোজাফফর আহমেদ
বিবি, পিএসসি
০৮ জুলাই ২০০১ হতে ১১ জানুয়ারি ২০০৩

বিএ-১৯০৪
ব্রিগেডিয়ার জেনারেল
আবু জাহিদ মোঃ ফজলুর রহমান
পিএসসি
২৫ জানুয়ারি ২০০৩ হতে ০২ জানুয়ারি ২০০৫

বিএ-১৭৮৫
ব্রিগেডিয়ার জেনারেল
মহম্মদ জাহাংগীর হোসেন
এনডিসি, পিএসসি
০৩ জানুয়ারি ২০০৫ হতে ১৭ মার্চ ২০০৬

বিএ-১৭৪৪
ব্রিগেডিয়ার জেনারেল
মোহাম্মদ রশিদ-উজ-জামান খান
এএফডব্লিউসি, পিএসসি
১৮ মার্চ ২০০৬ হতে ০৫ আগস্ট ২০০৬

বিএ-১৮৫২
ব্রিগেডিয়ার জেনারেল
আনোয়ারুল আজিম
বিপি, পিএসসি
০৬ আগস্ট ২০০৬ হতে ১৮ আগস্ট ২০০৬

বিএ-২০৪২
ব্রিগেডিয়ার জেনারেল
মোঃ জাহিদুর রহমান
এএফডব্লিউসি, পিএসসি, জি+
০১ সেপ্টেম্বর ২০০৬ হতে ৩১ ডিসেম্বর ২০০৭

বিএ-২৪৪৯
কর্নেল
কাজী এমদাদুল হক
পিএসসি
০১ জানুয়ারি ২০০৮ হতে ১৪ আগস্ট ২০০৮

বিএ-১৯৬৯
ব্রিগেডিয়ার জেনারেল
মিয়া মোহাম্মদ জয়নুল আবেদীন
বিবি, পিএসসি
১৫ আগস্ট ২০০৮ হতে ১৮ জানুয়ারি ২০০৯

বিএ-১৯৬৪
ব্রিগেডিয়ার জেনারেল
জাহিদ উদ্দিন মোহাম্মদ আকবর
পিএসসি
২৩ মে ২০০৯ হতে ০৯ আগস্ট ২০০৯

বিএ-২২৭০
ব্রিগেডিয়ার জেনারেল
মোঃ মাসুদ হোসেন
পিএসসি
১০ আগস্ট ২০০৯ হতে ৩১ জানুয়ারি ২০১০

বিএ-২৬৬৬
ব্রিগেডিয়ার জেনারেল
আতাউল হাকিম সারওয়ার হাসান
এএফডব্লিউসি, পিএসসি
০১ ফেব্রুয়ারি ২০১০ হতে ১২ মে ২০১০

বিএ-২২৭০
ব্রিগেডিয়ার জেনারেল
মোঃ মাসুদ হোসেন
পিএসসি
১০ আগস্ট ২০১০ হতে ২০ জানুয়ারি ২০১১

বিএ-২৬১৮
ব্রিগেডিয়ার জেনারেল
মোঃ ফিরোজ রহিম
পিএসসি, জি
৩১ জানুয়ারি ২০১১ হতে ০২ এপ্রিল ২০১১

বিএ-২৮৮৭
ব্রিগেডিয়ার জেনারেল
শাহ সগিরুল ইসলাম
এএফডব্লিউসি, পিএসসি
০৩ এপ্রিল ২০১১ হতে ২৭ ফেব্রুয়ারি ২০১২

বিএ-২৮৯২
ব্রিগেডিয়ার জেনারেল
শামীম আহমেদ
পিএসসি
১৭ মার্চ ২০১২ হতে ১৭ জানুয়ারি ২০১৩

বিএ-৩০২৫
কর্নেল
মোঃ আবুল হাসেম
পিএসসি
১৮ জানুয়ারি ২০১৩ হতে ২০ এপ্রিল ২০১৩

বিএ-৩০২৫
ব্রিগেডিয়ার জেনারেল
মোঃ আবুল হাসেম
পিএসসি
২১ এপ্রিল ২০১৩ হতে ০৭ জানুয়ারি ২০১৪

বিএ-৩২৯৮
ব্রিগেডিয়ার জেনারেল
মুনসী মিজানুর রহমান
পিএসসি
০৮জানুয়ারি ২০১৪ হতে ২৪ মার্চ ২০১৪

বিএ-৩৫৩৪
ব্রিগেডিয়ার জেনারেল
কাজী মোহাম্মদ কায়সার হোসেন
পিএসসি
২৫ মার্চ ২০১৪ হতে ০৭ সেপ্টেম্বর ২০১৫

বিএ-৩৫৯৬
ব্রিগেডিয়ার জেনারেল
মোঃ সাজ্জাদ হোসাইন
এএফডব্লিউসি, পিএসসি
০৪ অক্টোবর ২০১৫ হতে ২৩ জানুয়ারি ২০১৭

বিএ-৩৮১৩
ব্রিগেডিয়ার জেনারেল
মোঃ মঈন খাঁন
এনডিসি, পিএসসি, এলএসসি
২৪ জানুয়ারি ২০১৭ হতে ২৪ সেপ্টেম্বর ২০১৮

বিএ-৪৪১০
ব্রিগেডিয়ার জেনারেল
ফেরদৌস হাসান সেলিম
এসইউপি, পিএসসি
২৫ সেপ্টেম্বর ২০১৮ হতে ১৪ জানুয়ারি ২০১৯

বিএ-৪৪৩১
ব্রিগেডিয়ার জেনারেল
মোঃ মোস্তাফিজুর রহমান
এইচডিএমসি, এএফডব্লিউসি, পিএসসি
২৮ জানুয়ারি ২০১৯ হতে ২৫ এপ্রিল ২০১৯

বিএ-৪৪২৩
ব্রিগেডিয়ার জেনারেল
হুসাইন মুহাম্মদ মাসীহুর রাহমান
এসপিপি, এএফডব্লিউসি, পিএসসি
০৯ জুন ২০১৯ হতে ২২ জানুয়ারি ২০২০

বিএ-৪৬৩৩
ব্রিগেডিয়ার জেনারেল
মোহাম্মদ নাজমুল হক
বিএসপি, এএফডব্লিউসি, পিএসসি
০২ ফেব্রুয়ারি ২০২০ হতে ১৪ জুন ২০২১

বিএ-৫১৪২
ব্রিগেডিয়ার জেনারেল
মোঃ মাহবুবুর রহমান
এএফডব্লিউসি, পিএসসি
১৫ জুন ২০২১ হতে ১০ জানুয়ারি ২০২৩

বিএ-৫০৩৪
ব্রিগেডিয়ার জেনারেল
হাফিজুর রহমান
এনডিসি, পিএসসি
১১ জানুয়ারি ২০২৩ হতে ২৭ আগস্ট ২০২৩

প্রাক্তন অধ্যক্ষবৃন্দ

প্রফেসর এম আলমগীর
২০ মার্চ ১৯৯৩ হতে ৩০ জুন ১৯৯৯

আবদুল হান্নান
০১ জুলাই ১৯৯৯ হতে ৩১ ডিসেম্বর ২০০৩

লে. কর্নেল রাশেদ আহমেদ (অব.)
০১ জানুয়ারি ২০০৪ হতে ০৭ মে ২০০৫

মোহাম্মদ আবদুল হালিম চৌধুরী
০১ জানুয়ারি ২০০৬ হতে ৩১ মে ২০১১

বিএ-৫৩৫৮
মেজর মোঃ লুৎফর রহমান
পিএসসি, এইসি
২০ সেপ্টেম্বর ২০১১ হতে ০৪ সেপ্টেম্বর ২০১৩

বিএ-৫৩৫৮
লে. কর্নেল মোঃ লুৎফর রহমান
পিএসসি, এইসি
০৫ সেপ্টেম্বর ২০১৩ হতে ২৩ ডিসেম্বর ২০১৪

বিএ-৩৯৫২
লে. কর্নেল মোঃ শহিদুল হাসান
এসইউপি
২৪ ডিসেম্বর ২০১৪ হতে ১৯ সেপ্টেম্বর ২০১৭

বিএ-৫৪৮৩
লে. কর্নেল মোঃ তাজুল ইসলাম
জি+, আর্টিলারি
১৭ জানুয়ারি ২০১৮ হতে ০৬ সেপ্টেম্বর ২০১৮

বিএ-৪০৯১
লে. কর্নেল মোহাম্মদ জালাল উদ্দীন
পিবিজিএম, পিএসসি, সিগন্যালস
২০ অক্টোবর ২০১৮ হতে ২৩ জুলাই ২০২০

বিএ-৬৬৪২
লে. কর্নেল মোঃ নাজিব মাহমুদ সজিব
পিএসসি, জি, আর্টিলারি
২৩ জুলাই ২০২০ হতে ২৭ অক্টোবর ২০২১

অনুষদ সদস্যবৃন্দ

কলেজ শাখা

লে. কর্নেল শামীম আহমেদ, পিএসসি, এএসসি
অধ্যক্ষ

সঞ্জয় কুমার কুণ্ডু
উপাধ্যক্ষ

মুহাম্মদ আহসান হাবীব
সহকারী অধ্যাপক, গণিত

মোঃ শাহীদুল ইসলাম
সহকারী অধ্যাপক, পরিসংখ্যান

নাহিদ আরা
সহকারী অধ্যাপক, জীববিজ্ঞান

মোঃ ইনামুল হক
সহকারী অধ্যাপক, পদার্থবিজ্ঞান

সৈয়দ কাদিরুজ্জামান
সহকারী অধ্যাপক, ইংরেজি

মোঃ মারফত আলী
সহকারী অধ্যাপক, সমাজকর্ম

এস.এম. জাহিদুজ্জামান
সহকারী অধ্যাপক, জীববিজ্ঞান

মোঃ তারিকুল গণি
সহকারী অধ্যাপক, ইংরেজি

গৌতম চন্দ্র দাম
সহকারী অধ্যাপক, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি

মোঃ মাজহারুল ইসলাম চৌধুরী
সহকারী অধ্যাপক, রসায়ন

নাসরিন পারভীন
সহকারী অধ্যাপক, ব্যবস্থাপনা

আব্দুল বাতেন
সহকারী অধ্যাপক, হিসাববিজ্ঞান

হোসনে আরা জেছমিন
সহকারী অধ্যাপক, বাংলা

এমদাদুল হক
সহকারী অধ্যাপক, অর্থনীতি

মোহাম্মদ আতিকুর রহমান
সহকারী অধ্যাপক, গণিত

মোহাম্মদ নাসির উদ্দিন মাহমুদ চৌধুরী
সহকারী অধ্যাপক, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি

মুহাম্মদ আনিসুর রহমান
সহকারী অধ্যাপক, উ.ব্যবস্থাপনা ও বিপণন

মোঃ আবু সাঈদ
সহকারী অধ্যাপক, পৌরনীতি ও সুশাসন

সাবিনা ফেরদৌসি
সহকারী অধ্যাপক, ইংরেজি

মোহাম্মদ নাছির উদ্দিন
প্রভাষক, বাংলা

আঞ্জুমান আরা
প্রভাষক, জীববিজ্ঞান

কামরুন নাহার হাসিনা
প্রভাষক, ইংরেজি

সোহেল মিয়া
প্রভাষক, গণিত

রুবীনা আজাদ
প্রভাষক, বাংলা

মোঃ আনিসুজ্জামান রানা
প্রভাষক, রসায়ন

সুলতান আহমেদ
প্রভাষক, ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি

মোঃ মশিউর রহমান
প্রভাষক, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি

মোঃ নাজমুল হক মিজান
প্রভাষক, রসায়ন

মোঃ মোমিনুল ইসলাম
প্রভাষক, কৃষিশিক্ষা

আব্দুস সবুর মোল্যা
প্রভাষক, হিসাব বিজ্ঞান

মোঃ জাহিদুল ইসলাম
প্রভাষক, পদার্থবিজ্ঞান

মোঃ মাহমুদুল হাসান
প্রভাষক, পদার্থবিজ্ঞান

রাবেয়া আক্তার
প্রভাষক, যুক্তিবিদ্যা

নোমানা নাহিদ
প্রদর্শক, জীববিজ্ঞান

মোহাম্মদ রহমত আলী
প্রদর্শক, পদার্থবিজ্ঞান

মোঃ টিপু সুলতান
শিক্ষক, শারীরিক শিক্ষা

ফয়সল আহমেদ
প্রদর্শক, রসায়ন

মোহাম্মদ ফয়জুর রহমান
সহঃ শিক্ষক, গ্রন্থাগার ও তথ্য বিজ্ঞান

ছানাউল্লাহ
প্রদর্শক, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি

অনুষদ সদস্যবৃন্দ

স্কুল শাখা

লে. কর্নেল শামীম আহমেদ, পিএসসি, এএসসি
অধ্যক্ষ

ইলিয়াছ খান
সহকারী প্রধান শিক্ষক

রেহানা সুলতানা
সিনিয়র শিক্ষক, পদার্থবিজ্ঞান

রুবাইদা বিন্তে রহমান
সিনিয়র শিক্ষক, বিজিএস

মোঃ আবদুল অহিদ
সিনিয়র শিক্ষক, ইংরেজি

শিরীন আক্তার
সিনিয়র শিক্ষক, গার্হস্থ্যবিজ্ঞান

এ কে এম শহীদ সারওয়ার
সিনিয়র শিক্ষক, ইসলাম শিক্ষা

মোঃ ইমতিয়াজ
সিনিয়র শিক্ষক, শারীরিক শিক্ষা

মোঃ নুরুল ইসলাম
সিনিয়র শিক্ষক, ইংরেজি

নয়ন তারা
সিনিয়র শিক্ষক, বিজিএস

রোকসানা বেগম
সিনিয়র শিক্ষক, ব্যবস্থাপনা

ইলোরা ইমাম সম্পা
সিনিয়র শিক্ষক, ব্যবস্থাপনা

ফৌজিয়া বেগম
সিনিয়র শিক্ষক, বিজ্ঞান

রোমানা হামিদ
সিনিয়র শিক্ষক, বিজিএস

এম এ বারী রব্বানী
সিনিয়র শিক্ষক, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি

মোঃ ওমর ফারুক
সিনিয়র শিক্ষক, ইসলাম শিক্ষা

মুহাম্মদ কামাল হোসাইন
সিনিয়র শিক্ষক, গণিত

মাহ্‌বুবা নূরুন্নেছা
সিনিয়র শিক্ষক, বাংলা

জুলেখা আখতার
সিনিয়র শিক্ষক, বাংলা

মোহাম্মদ ফারুক মিঞা
সিনিয়র শিক্ষক, হিসাববিজ্ঞান

খালেদা বেগম
সিনিয়র শিক্ষক, বাংলা

মোঃ সিরাজুল ইসলাম
সিনিয়র শিক্ষক, ইংরেজি

ফাতেমা খাতুন
সিনিয়র শিক্ষক, বাংলা

একেএম খায়রুল হাসান আকন্দ
সিনিয়র শিক্ষক, গণিত

মোঃ মনোয়ার হোসেন
সিনিয়র শিক্ষক, ইংরেজি

মাসুদ রানা
সিনিয়র শিক্ষক, ইংরেজি

আব্দুর রহমান
সিনিয়র শিক্ষক, ইসলাম শিক্ষা

মাঈনউদ্দীন আহমেদ মাহী
সিনিয়র শিক্ষক, চারু ও কারুকলা

সিদ্দিকা আক্তার জাহান
সিনিয়র শিক্ষক, ইংরেজি

ফারিজা জামান
সহকারী শিক্ষক, জীববিজ্ঞান

আ ন ম মাহমুদুল হাসান
সহকারী শিক্ষক, রসায়ন

মোহাম্মদ লিয়াকত আলী খান
সহকারী শিক্ষক, চারু ও কারুকলা

ফজলে মাসুদ
সহকারী শিক্ষক, গণিত

কে. এ. এম রাশেদুল হাসান
সহকারী শিক্ষক, গণিত

মৌমিতা তালুকদার
সহকারী শিক্ষক, বিজিএস

মোঃ আমিরুল ইসলাম
সহকারী শিক্ষক, বাংলা

মোঃ আল আমিন
সহকারী শিক্ষক, ইংরেজি

কাজী সুম্মন প্রিয়া
সহকারী শিক্ষক, কৃষিশিক্ষা

সুমাইয়া আফরিন আফসানা
সহকারী শিক্ষক, চারু ও কারুকলা

মোঃ মাহবুব রহমান ফকির
সহকারী শিক্ষক, কৃষিশিক্ষা

খন্দকার মৌসুমী নাসরীন
সহকারী শিক্ষক, জীববিজ্ঞান

স্বপ্না রানী দাস
সহকারী শিক্ষক, বিজিএস

মোঃ সেলিম উদ্দিন
সহকারী শিক্ষক, গণিত

সাহিদা আক্তার
সহকারী শিক্ষক, ইংরেজি

নাহিদা আফরোজ
সহকারী শিক্ষক, বাংলা

সাবিহা রহমান
সহকারী শিক্ষক, বাংলা

মোঃ সুজন মিয়া
সহকারী শিক্ষক, পদার্থবিজ্ঞান

রেহানা পারভীন
সহকারী শিক্ষক, বিজিএস

মুহাম্মদ জানে আলম
প্রদর্শক, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি

রোকসানা পারভীন
সহকারী শিক্ষক, বিজ্ঞান

মোঃ নজরুল ইসলাম-১
সহকারী শিক্ষক, গণিত

মোঃ আরাফাত হোসেন
সহকারী শিক্ষক, পদার্থবিজ্ঞান

মাহাবুবা আফরোজ
সহকারী শিক্ষক, ইংরেজি

মোঃ জসিম উদ্দিন
সহকারী শিক্ষক, পদার্থবিজ্ঞান

মোঃ জাকির হোসেন
সহকারী শিক্ষক, বিজিএস

মোঃ শরীফ হোসেন
সহকারী শিক্ষক, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি

আয়েশা আক্তার রুমা
সহকারী শিক্ষক, অর্থনীতি

স্বদেশ কুমার দত্ত
সহকারী শিক্ষক, ইংরেজি

মোঃ এনামুল হক সুমন
সহকারী শিক্ষক, রসায়ন

শায়লা তায়েফ
সহকারী শিক্ষক, শারীরিক শিক্ষা

রওশন আরা
সহকারী শিক্ষক, ভূগোল

অরুপা ঠাকুর শিল্পী
জুনিয়র শিক্ষক, হিন্দু ধর্ম শিক্ষা

মোঃ মঞ্জুরুল হক
জুনিয়র শিক্ষক, গণিত

ফাহিমা নাছরিন
জুনিয়র শিক্ষক, ভূগোল

মোঃ সাইফুল ইসলাম সুজন
জুনিয়র শিক্ষক, ফিন্যান্স ও ব্যাংকিং

মোঃ মারুফ হাসান ভুইয়া
জুনিয়র শিক্ষক, গণিত

এস এম সোলায়মান
জুনিয়র শিক্ষক, ইসলাম শিক্ষা

মোঃ তারিকুজ্জামান
জুনিয়র শিক্ষক, সমাজকর্ম

ইমরান মাহমুদ
জুনিয়র শিক্ষক, ব্যবস্থাপনা

সাদিয়া সুলতানা
জুনিয়র শিক্ষক, ব্যবস্থাপনা

প্রশাসনিক কাজে নিয়োজিত কর্মকর্তা-কর্মচারী

সিনিঃ ওয়াঃ অফিঃ (অবঃ) মোঃ মতিউর রহমান
প্রশাসনিক কর্মকর্তা

সার্জেন্ট (অবঃ) মোঃ আজিজুল হক
হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তা

মোঃ হাবিবুর রহমান
অফিস সুপারিনটেনডেন্ট

সার্জেন্ট (অবঃ) মোঃ মীর হোসেন
সহ: প্রশাসনিক কর্মকর্তা (এডমিন-২)

আল মুনসুরুল হক
পিএ

উত্তম কুমার পাল
ডাটা এন্ট্রি অপারেটর

মোঃ আকরাম আলী
হিসাব সহকারি

মোঃ জহিরুল হক
হিসাব সহকারি

মোঃ মোজাম্মেল হক
ড্রাইভার

মোঃ আব্দুল আউয়াল
নিম্নমান সহ: কাম কম্পি: অপারেটর

মোঃ রেজাউল করিম
নিম্নমান সহ: কাম কম্পি: অপারেটর

মোঃ হারুন অর রশিদ
স্টোর কিপার

মোঃ গোলাম সারোয়ার
নিম্নমান সহ: কাম কম্পি: অপারেটর

মোঃ মিজানুর রহমান
নিম্নমান সহ: কাম কম্পি: অপারেটর

মোঃ আবু বকর সিদ্দিক
নিম্নমান সহ: কাম কম্পি: অপারেটর

মোঃ নাসির উদ্দিন শিকদার
ইলেকট্রিশিয়ান

মোঃ মশিউর রহমান
নিম্নমান সহ: কাম কম্পি: অপারেটর

সার্জেন্ট (অবঃ) মুহাম্মদ জাকির হোসেন
ড্রাইভার

মাসুদুল আলম
প্রশাসনিক সহকারি

কর্পোঃ (অবঃ) মোঃ আবদুল আউয়াল
ড্রাইভার

ফারিয়া ইয়াসমিন সারা
নিম্নমান সহ: কাম কম্পি: অপারেটর

মোঃ হাবিবুর রহমান
ড্রাইভার

মোঃ মনির হোসেন
আইটি টেকনিশিয়ান

অপরাজিতা গন্ড
শিক্ষক সহকারি

নাজমা খাতুন
শিক্ষক সহকারি

আসমা খাতুন
শিক্ষক সহকারি

চিনু রাণী সিংহ
শিক্ষক সহকারি

আফরোজা নার্গিস
শিক্ষক সহকারি

ফৌজিয়া ফেরদৌস
শিক্ষক সহকারি

মুর্শিদা আক্তার
শিক্ষক সহকারি

সাগরিকা সরকার অরুনা
মেডিক্যাল এসিস্ট্যান্ট

আইরিন আক্তার
শি. সহ. কাম লাইব্রেরি সহকারি

শারমিন আক্তার
শি. সহ. কাম হেল্প ডেস্ক সহকারি

আমিনুল ইসলাম
নিম্ন. সহ. কাম কম্পি: অপারেটর (খণ্ডকালীন)

অফিস সহায়ক কাজে নিয়োজিত যারা

মোঃ মোশাররফ হোসেন
ল্যাব এটেনডেন্ট

সাইদুল ইসলাম
ল্যাব এটেনডেন্ট

সৈয়দা তাসলিমা বেগম
ল্যাব এটেনডেন্ট

মোঃ শহিদুল ইসলাম
অফিস এটেনডেন্ট

নুরুল ইসলাম নাহিদ
ল্যাব এটেনডেন্ট

নাঈমাতু জান্নাত
অফিস এটেনডেন্ট

মফিজল হক
অফিস সহায়ক

মোঃ নেহারুল ইসলাম
অফিস সহায়ক

মোঃ ইব্রাহিম
অফিস সহায়ক

মোঃ আব্দুল আওয়াল
অফিস সহায়ক

মোছাঃ মনোয়ারা খাতুন
অফিস সহায়ক

নিলু রবি দাস
পরিচ্ছন্ন কর্মী

শংকর শাংমা
পরিচ্ছন্ন কর্মী

মোঃ তরিকুল ইসলাম
নিরাপত্তা প্রহরী

মোঃ আজিজুল হক
নিরাপত্তা প্রহরী

ফাতেমা খাতুন
অফিস সহায়ক

মোঃ আবদার হোসেন
নিরাপত্তা প্রহরী

মোঃ জসিম উদ্দিন
নিরাপত্তা প্রহরী

মোঃ আনোয়ার হোসেন
নিরাপত্তা প্রহরী

মোঃ আক্তার হোসেন
নিরাপত্তা প্রহরী

মোঃ মোর্শেদ আলম
নিরাপত্তা প্রহরী

সুজল হক
অফিস সহায়ক

চানিক রবি দাস
পরিচ্ছন্ন কর্মী

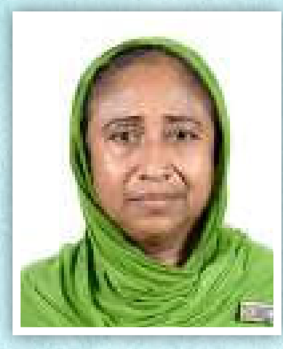

রুমা বেগম
অফিস সহায়ক

মিন্টু মিয়া
নিরাপত্তা প্রহরী

মোঃ আজাহারুল ইসলাম
অফিস সহায়ক

সাইদুল ইসলাম
পরিচ্ছন্ন কর্মী

আরিফ রব্বানী
অফিস সহায়ক

মোঃ আলাউদ্দিন
মোটর পাম্প এ্যাটেনডেন্ট

মোঃ সুরুজ্জামান
অফিস সহায়ক

প্রদীপ নেকলা
পরিচ্ছন্ন কর্মী

মোঃ মুরাদ হোসেন
পরিচ্ছন্ন কর্মী

মোঃ আজাদুল ইসলাম
গ্রাউন্ডস্ম্যান

পুষ্প রানী
অফিস সহায়ক

সাবিনা ইয়াসমিন
অফিস সহায়ক

সাইফুল ইসলাম
অফিস সহায়ক

ফরহাদ হোসেন
অফিস সহায়ক

মোঃ রকিবুল ইসলাম
অফিস সহায়ক

তোতা মিয়া
রাজ মিস্ত্রি

ফয়েজ
পরিচ্ছন্ন কর্মী

মোছাঃ মাহফুজা আক্তার
অফিস সহায়ক

আসাদুল হোসেন
নিরাপত্তা প্রহরী

শিউলী আক্তার
পরিচ্ছন্ন কর্মী

মোঃ জহিরুল ইসলাম
অফিস সহায়ক কাম বাস হেলপার

মোঃ খোকন আলী
অফিস সহায়ক

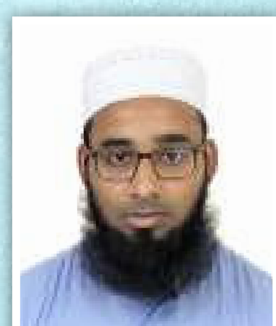

তালহা মুতাসিম বিল্লাহ রুম্মান খান
ইমাম

মোঃ মোশারফ হোসেন
গ্রাউন্ডস্ম্যান

মোঃ শিমুল
গ্রাউন্ডস্ম্যান

শাওন বিশ্বাস
পরিচ্ছন্ন কর্মী

মোঃ আবুল কালাম আজাদ
নিরাপত্তা প্রহরী

মোঃ মানিক আলী
নিরাপত্তা প্রহরী

মোঃ মাহমুদুল ইসলাম
নিরাপত্তা প্রহরী

ইসমতারা স্বপ্না
পরিচ্ছন্ন কর্মী

মোঃ শাওন হাসনাত
ইলেকট্রিশিয়ান কাম পাম্প অপারেটর

রাকিবুল ইসলাম
অফিস সহায়ক

শিহাব শেখ
অফিস সহায়ক কাম বাস হেলপার

হাসিবুল হক ফয়সাল
গ্রাউন্ডস্‌ম্যান

নয়নাভিরাম অবকাঠামো

শহিদ মিনার

কনফারেন্স কক্ষ

প্রধান ফটক

ক্যান্টিন ও অভিভাবক বিশ্রামাগার

টেরাকোটা

অডিটোরিয়াম

একাডেমিক ভবন (প্রাথমিক শাখা)

খেলার মাঠ

একাডেমিক ভবন (কলেজ)

অফিস ভবন

প্রাতঃকালীন সমাবেশ

শিক্ষার্থীদের শপথ

"জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বে পাকিস্তানি শাসকদের শোষণ ও বঞ্চনার বিরুদ্ধে এক রক্তক্ষয়ী মুক্তিসংগ্রামের মধ্য দিয়ে বাংলাদেশ স্বাধীনতা অর্জন করেছে। বিশ্বের বুকে বাঙালি জাতি প্রতিষ্ঠা করেছে তার স্বতন্ত্র জাতিসত্তা। আমি দৃপ্তকণ্ঠে শপথ করছি যে, শহীদদের রক্ত বৃথা যেতে দেব না। দেশকে ভালোবাসবো, দেশের মানুষের সার্বিক কল্যাণে সর্বশক্তি নিয়োগ করব। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের আদর্শে উন্নত, সমৃদ্ধ ও অসাম্প্রদায়িক চেতনার সোনার বাংলা গড়ে তুলব। মহান সৃষ্টিকর্তা আমাকে শক্তি দিন।"

ব্যবহারিক শিক্ষার প্রাতিষ্ঠানিক আয়োজন

আইসিটি গবেষণাগার

পদার্থবিদ্যা গবেষণাগার

জীববিদ্যা গবেষণাগার

রসায়ন গবেষণাগার

মাল্টিমিডিয়া ক্লাসরুম

লাইব্রেরি

মেধার স্ফুরণে সহপাঠক্রমিক আয়োজন

সূচিপত্র

৪৫-৬১ | প্রতিবেদন

৪৬ | হাউস প্রতিবেদন

৫০ | সোসাইটি প্রতিবেদন

৫৭ | প্রতিষ্ঠান প্রতিবেদন

৬২-১৩২ | বাংলা সাহিত্য

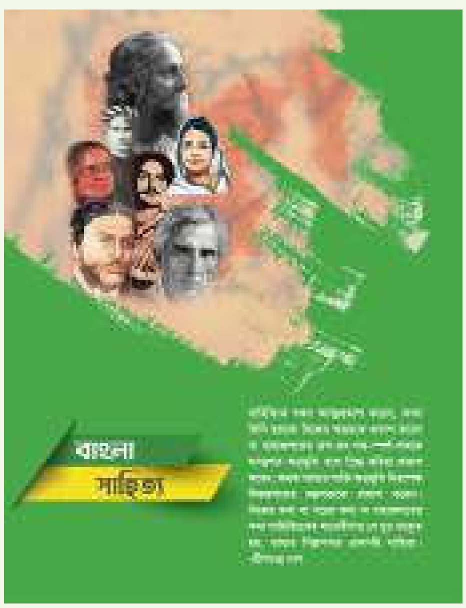

গল্প প্রবন্ধ ও অন্যান্য

৬৪ | আধুনিক বাংলা কবিতার উদ্ভব ও বিকাশ

৬৬ | চিন্তার উপনিবেশায়ন

৬৮ | উঠান

৭১ | টেরাকোটার ইতিকথা

৭৩ | রবীন্দ্রকথা: প্রথম প্রহর

৭৫ | কোহিনুর

৭৭ | আমাদের এবেলা ওবেলা

৭৮ | হাল ছেড়ো না বন্ধু

৭৯ | মোবাইল নয় বই হোক নিত্য সঙ্গী

৮০ | স্বপ্ন কারিগর

৮১ | বদলে যাও বদলে দাও

৮২ | চৌদ্দ ইঞ্চি সাদা-কালো টেলিভিশন

৮৪ | আমাদের বাড়ী

৮৬ | ডিপ্রেশন বা বিষণ্নতা

৮৭ | পদার্থ বিজ্ঞানে নোবেল

৮৮ | নারীশিক্ষায় বেগম রোকেয়া

৮৯ | শহীদ সৈয়দ নজরুল ইসলাম

৯২ | ময়মনসিংহ গীতিকার কথা

৯৩ | ময়মনসিংহে নজরুল

৯৫ | ময়মনসিংহে একাত্তর

৯৬ | ময়মনসিংহে রবীন্দ্রনাথ

৯৮ | সংস্কৃতিবান্ধব শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান ও আমার অর্জন

১০০ | পরিশ্রমই সাফল্য আনে

১০২ | শিক্ষা উন্নয়নে বাংলাদেশ সেনাবাহিনী

১০৩ | বাংলাদেশ সেনাবাহিনী আমাদের গর্ব

১০৪ | উন্নয়নশীল বাংলাদেশ: বাংলাদেশ সেনাবাহিনী

১০৬ | চীনের ঐতিহাসিক ইউ ইউয়ান

১০৭ | ঘুরে এলাম চর তারুয়া এবং চর কুকরি-মুকরি

১০৯ | মেঘের রাজ্যে ভ্রমণ

১১০ | ঐতিহ্যবাহী হুমগুটি খেলা

১১১ | কথাবন্ধু

১১২ | ইচ্ছে থেকে প্রাপ্তির গল্প

১১৪ | মেসি ও তার স্বপ্নজয়

১১৫ | প্রশান্তি

১১৬ | স্কুলজীবনের অন্তিম বেলায়

কবিতা

১১৯ | বঙ্গকন্যা

১২০ | পাখির রূপকথা

১২০ | ছোট্ট বেলার গল্প

১২১ | মানব ধর্ম

১২১ | পরহিতে ব্রত

১২২ | ছোট বোন

১২২ | আমাদের স্কুল

১২৩ | জাতীয় কবি

১২৩ | ময়মনসিংহ

১২৪ | শরৎ

১২৪ | ইচ্ছেডানা

১২৫ | এ যুগের শিশু

১২৫ | পথ শিশু

১২৬ | ভোরের আকাশ

১২৬ | সময়ের মূল্য

১২৭ | মুজিব

১২৭ | একুশ মানে স্বাধীনতা

১২৭ | বিচার হবে

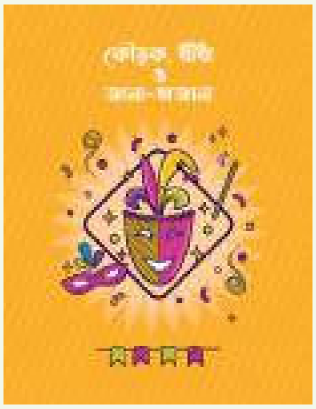

১২৮-১৩২ | কৌতুক, ধাঁধা ও জানা-অজানা

১৩৩-১৫৪ | ENGLISH SECTION

১৩৪ | Folk teachings and mystical songs
১৩৬ | Students-Teachers Positive Relationship
১৩৮ | Norwegian Wood: A Book to Remember
১৩৯ | Don’t Judge a Book by its Cover
১৪০ | Who Am I
১৪১ | Psychopath
১৪২ | AI: Boon or Bane
১৪৪ | African American Stereotype
১৪৫ | Patriotism
১৪৬ | Life Goes On
১৪৭ | Friends in Life
১৪৮ | Our Zainul, Our Laurel
১৪৯ | A Tale of Overcoming Fear
১৫০ | Father of the Nation
১৫০ | Fear of Examination
১৫১ | Oxygen
১৫১ | Ego
১৫১ | Under the Sky
১৫২ | I am What You See
১৫২ | Bond of Family
১৫২ | In Your Arms
১৫৩ | Lockdown
১৫৩ | The Dhaka Metro Train
১৫৪ | Riddles & Jokes

১৫৫-১৬২ | তুলি আর ব্রাসে মনের কথা

১৬৩-২০৯ | স্থির চিত্রে বিভিন্ন শ্রেণির শিক্ষার্থীবৃন্দ

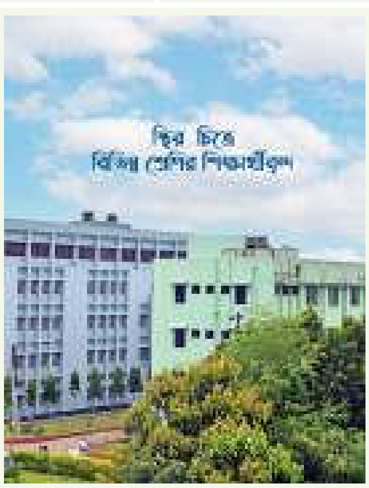

২১০-২৫২ | আলোকচিত্রে সিপিএসসিএম

সেন্ট্রাল প্রিফেক্ট

সাদমান মোর্শেদ মুগ্ধ
কলেজ প্রিফেক্ট

পুষ্পিতা আনজুম
সহ. কলেজ প্রিফেক্ট

তৌসিফ আন রাতুল
স্পোর্টস প্রিফেক্ট

ইসরাত জাহান মীম
সহ. স্পোর্টস প্রিফেক্ট

মো. আবিদ হাসান
কালচারাল প্রিফেক্ট

মালিহা মেহেনাজ
সহ. কালচারাল প্রিফেক্ট

আব্দুল্লাহ আল শামীম জীবন
অর্কেস্ট্রা প্রিফেক্ট (কলেজ)

তপব্রত সান্যাল
সহ. প্রিফেক্ট (স্কুল)

শুভ দেবনাৎ জিত
অর্কেস্ট্রা প্রিফেক্ট (স্কুল)

২০২২-২০২৩ সালে পাঠক্রমিক ও
সহপাঠক্রমিক বিভিন্ন কার্যক্রমের প্রতিবেদন।

ঈশা খাঁ হাউস এর কার্যক্রম

ক্যান্টনমেন্ট পাবলিক স্কুল এন্ড কলেজ মোমেনশাহীর চারটি হাউসের মধ্যে ঈশাখাঁ হাউস অন্যতম। 'আমরা হারতে জানি না' -এ মূলমন্ত্র বুকে ধারণ করে ঈশাখাঁ হাউসের পথচলা। এ হাউসের পতাকার রং গাঢ় নীল। আমরা বিশ্বাস করি সফলতা ও ব্যর্থতা মানুষের জীবনের দুটি অধ্যায়। সাময়িক ব্যর্থতাকে শক্তিতে রূপান্তরিত করে জয়ের স্বাদ নিতে ঈশাখাঁ হাউস বদ্ধপরিকর। তাই ঈশা খাঁ হাউসের প্রতীক 'দুরন্ত চিতা' এবং এর মতো গতিশক্তি নিয়ে সামনে অগ্রসর হচ্ছে এই হাউস। ঈশা খাঁ হাউসে মোট শিক্ষার্থী ৯৬৩ জন। এই হাউসে একজন হাউস মাস্টার ও ২৭ জন হাউস টিউটর রয়েছেন। এই হাউসের শিক্ষার্থীরা একাডেমিক শিক্ষার পাশাপাশি সাহিত্যচর্চা, নাচ, গান, অভিনয়, বিতর্কসহ সব ধরনের সংস্কৃতি চর্চায় নিজেদের প্রতিভার স্বাক্ষর রেখেছে। ২০২৩ সালে ফুটবল খেলা প্রতিযোগিতায় কলেজ শাখা ফুটবল দল চ্যাম্পিয়ন হয়। এছাড়াও ২০২৩ সালে আন্ত:হাউস বিভিন্ন প্রতিযোগিতায় এই হাউস সার্বিক **রানার আপ** হওয়ার গৌরব অর্জন করেছে।

হাউস মাস্টার
এস. এম. জাহিদুজ্জামান
সহকারী অধ্যাপক

হাউস প্রিফেক্ট

নজরুল হাউস এর কার্যক্রম

সিপিএসসিএম এর চারটি হাউসের মধ্যে নজরুল হাউস বিশেষ অবস্থান দখল করে আছে। যার কবিতায় দ্রোহ, সাম্য, ও মানব প্রেমের সহাবস্থান, তিনি বাংলাদেশের জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলাম। উদ্দীপ্ত সূর্য কিরণ যেমন অন্ধকার ভেদ করে নিজেকে প্রকাশ করে, তেমনি নজরুল হাউস সদা জাগ্রত ও প্রদীপ্ত। এ হাউস সকল বাধা পেরিয়ে জ্ঞানজগতসহ শিল্প-সংস্কৃতি, সাহিত্য ও খেলাধুলা প্রতিটি ক্ষেত্রেই উদ্ভাসিত হচ্ছে আপন মহিমায়। লাল রঙে রঞ্জিত হয়ে নজরুল হাউস 'চির উন্নত মম শির' এই মূলমন্ত্র বুকে ধারণ করে সামনে এগিয়ে যেতে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ। নজরুল হাউসের প্রতীক 'রয়েল বেঙ্গল টাইগার'। এ হাউসের গন্তব্য কেবল বিজয় ছিনিয়ে নেয়া নয়, শিক্ষার্থীদের দেশের আদর্শ সুনাগরিক হিসেবে গড়েতোলা। এই হাউসে একজন হাউস মাস্টার ও ২৮ জন হাউস টিউটর রয়েছেন। এই হাউসে মোট শিক্ষার্থীর সংখ্যা ১০১১ জন। এই হাউস ২০২৩ সালে বার্ষিক বাংলা বিতর্ক প্রতিযোগিতায় কলেজ শাখার শিক্ষার্থীরা চ্যাম্পিয়ন হয়। এছাড়াও ২০২৩ এ আউটডোর গেইম্সে চ্যাম্পিয়ন হওয়ার গৌরব অর্জন করেছে।

হাউস মাস্টার
গৌতম চন্দ্র দাম
সহকারী অধ্যাপক

হাউস প্রিফেক্ট

জয়নুল হাউস এর কার্যক্রম

সবুজ মানেই অফুরাণ প্রাণশক্তি, জীবন আর উদ্যম। চিরসবুজ জয়নুল হাউস সত্য ও সুন্দরের খোঁজে সম্মুখে পথ চলে। 'সত্যই সুন্দর' এ আদর্শ নিয়েই জয়নুল হাউস সফলতার পথে সকল বাধা দৃঢ়তার সাথে পেরিয়ে যায়। জয়নুল হাউসের প্রতীক 'ঈগল'। শিল্পাচার্য জয়নুল আবেদিন এর প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে এ হাউসের নামকরণ করা হয়েছে 'জয়নুল হাউস'। পূর্ববঙ্গ তথা বাংলাদেশে চিত্রশিল্প বিষয়ক শিক্ষা প্রসারে আমৃত্যু প্রচেষ্টার জন্য তাঁকে 'শিল্পাচার্য' উপাধি দেওয়া হয়। এই হাউসে একজন হাউস মাস্টার ও ২৯ জন হাউস টিউটর রয়েছেন। এই হাউসের মোট শিক্ষার্থী ১১০০ জন। এই হাউসের শিক্ষার্থীরা একাডেমিক শিক্ষার পাশাপাশি সাহিত্যচর্চা, নাচ, গান, অভিনয়, বিতর্কসহ সব ধরনের সংস্কৃতি চর্চায় নিজেদের প্রতিভার স্বাক্ষর রেখে চলেছে। আন্ত:হাউস ইংরেজি বির্তক প্রতিযোগিতা কলেজ পর্যায়ে এই হাউস চ্যাম্পিয়ন হওয়ার গৌরব অর্জন করে। এই হাউস ২০২৩ সালের আন্ত:হাউস বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতায় রানারআপ ও সার্বিকভাবে চ্যাম্পিয়ন হওয়ার গৌরব অর্জন করেছে।

হাউস মাস্টার
মোঃ তারিকুল গণি
সহকারী অধ্যাপক

হাউস প্রিফেক্ট

জাহাঙ্গীর হাউস এর কার্যক্রম

‘আমরা করবো জয়’ এই মূল মন্ত্রকে বুকে ধারণ করে ২০২৩ সালে যাত্রা শুরু করেছে জাহাঙ্গীর হাউস। এই হাউসের প্রতীক সিংহ। এই হাউসের পতাকার রং আকাশি। আমাদের মুক্তিযুদ্ধের অকুতোভয় বীর বীরশ্রেষ্ঠ মহিউদ্দীন জাহাঙ্গীরের নামানুসারে হাউসটির নামকরণ করা হয়। বঙ্গবন্ধুর ডাকে ত্রিশ লক্ষ আত্মবলিদানকারী সাহসী বীরের একজন হলেন ক্যাপ্টেন মহিউদ্দীন জাহাঙ্গীর। এই হাউসে একজন হাউস মাস্টার ও ২৮ জন হাউস টিউটর রয়েছেন। এই হাউসে মোট শিক্ষার্থী ৯৭৫ জন। এই হাউসের শিক্ষার্থীরা একাডেমিক শিক্ষার পাশাপাশি সাহিত্যচর্চা, নাচ, গান, অভিনয়, বিতর্কসহ সব ধরনের সংস্কৃতি চর্চায় নিজেদের প্রতিভার স্বাক্ষর রেখেছেন। আন্তঃহাউস বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা ২০২৩ এ এই হাউসের শিক্ষার্থীরা চ্যাম্পিয়ন হওয়ার গৌরব অর্জন করে। আন্তঃহাউস বার্ষিক বাংলা বিতর্ক প্রতিযোগিতায় স্কুলের শিক্ষার্থীরা চ্যাম্পিয়ন এবং ইংরেজি বির্তক প্রতিযোগিতায় রানারআপ হওয়ার গৌরব অর্জন করে। নবগঠিত এই হাউস বার্ষিক দেয়ালিকা প্রতিযোগিতায় প্রথম স্থান অর্জন করে।

হাউস মাস্টার
হোসনে আরা জেছমিন
সহকারী অধ্যাপক

হাউস প্রিফেক্ট

সোসাইটি কার্যক্রম

সংস্কৃতির শুদ্ধ চর্চা মানুষকে যান্ত্রিক পৃথিবী থেকে মননশীল জগতের দিকে ধাবিত করে। হৃদয়ে আনে শীতল ও স্নিগ্ধ বায়ুর কোমল পরশ বুলানো অনুভূতি। বিরুদ্ধ পরিবেশের অশান্ত হৃদয় তখন জমিনের ন্যায় স্থিরতা পায়, পায় আকাশের প্রশস্ততা। অফুরন্ত সম্ভাবনাময় সুপ্ত প্রতিভাকে বিকশিত করতে ক্যান্টনমেন্ট পাবলিক স্কুল এন্ড কলেজ মোমেনশাহী সকল শিক্ষার্থীকে নিজস্ব আগ্রহ, পারদর্শিতা কিংবা শিক্ষকের বিবেচনায় উপযুক্ত সোসাইটির অন্তর্ভূক্ত করে সপ্তাহের নির্ধারিত দিনে যথাযথ প্রশিক্ষণ প্রদান করেন। যার ফলে ক্যান্টনমেন্ট পাবলিক স্কুল এন্ড কলেজ মোমেনশাহী এর প্রতিটি শিক্ষার্থীর সুপ্ত প্রতিভাকে জাগ্রত করে সৃজনশীল ও সংস্কৃতিমনা করে তোলার লক্ষ্যে পরিচালিত সোসাইটিসমূহের কার্যক্রম নিচে তুলে ধরা হল।

ইংলিশ এক্সটেম্পোরি সোসাইটি

ইংরেজি ভাষা উচ্চশিক্ষা, ভালো চাকরি এবং সমৃদ্ধ জীবনের চাবিকাঠি। ইংরেজি ভাষা একটি বৈশ্বিক ভাষা, জীবনে সফলতা লাভ করার জন্য ইংরেজি ভাষায় দক্ষতা অর্জন একটি অপরিহার্য শর্ত। এই সোসাইটিতে শিক্ষার্থীরা স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণ করছে। সোসাইটিতে ইতোমধ্যেই ৩৭ জন শিক্ষার্থী রয়েছে। এই সোসাইটির ক্লাস নিয়মিত অনুষ্ঠিত হয়।

ইংরেজি উচ্চারণ এবং আবৃত্তি সোসাইটি

সুন্দর, সাবলীল ও সুস্পষ্ট উচ্চারণ আমাদের সবাইকে আকৃষ্ট করে। এই সোসাইটি শিক্ষার্থীদের উচ্চারণ ও আবৃত্তি উন্নতির জন্য বিতর্ক, ছবি বর্ণনা, উপস্থিত বক্তৃতা এবং বেশকিছু শব্দ ভাণ্ডার নিয়ে বিভিন্ন খেলার ব্যবস্থা করে থাকে।

ইংলিশ ডিবেট সোসাইটি

ক্যান্টনমেন্ট পাবলিক স্কুল এন্ড কলেজ মোমেনশাহীর শিক্ষার্থীদের সুপ্ত প্রতিভাকে প্রকাশিত ও বিকশিত করার সকল সুযোগ প্রদান করে। ইংলিশ ডিবেট সোসাইটির শিক্ষার্থীরা দলগতভাবে শিক্ষকদের তত্ত্বাবধানে নিয়মিত অনুশীলন করে থাকে। বর্তমানে এই সোসাইটিতে মোট ২৭ জন শিক্ষার্থী রয়েছে। এই সোসাইটির সদস্যরা আন্তঃহাউস বিতর্ক প্রতিযোগিতায় চমৎকার ফলাফল অর্জন করেছে।

ব্যান্ড সোসাইটি

ব্যান্ড প্যারেডের একটি অবিচ্ছেদ্য অংশ। ব্যান্ডের ছন্দ না থাকলে মার্চপাস্ট হয় না। আমাদের ব্যান্ড সোসাইটি বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতার মার্চপাস্টে একটি অতিরিক্ত জোয়ার এবং রঙ আনতে নিবেদিত। সুসজ্জিত ব্যান্ড দল প্রতিষ্ঠানের অন্যান্য উদযাপন যেমন পাবলিক পরীক্ষার রেজাল্ট-ডে, গেমস-ডে ইত্যাদিতেও তাদের পারফরম্যান্স দেখায়।

বাংলা উচ্চারণ ও আবৃত্তি সোসাইটি

বাংলা আমাদের মাতৃভাষা। বাংলা উচ্চারণ ও আবৃত্তি সোসাইটি শিক্ষার্থীদের বাগ্মীতার উন্নতি এবং ভালো বিতার্কিক হিসেবে গড়ে তুলতে কাজ করছে। এই সোসাইটিতে ৪০ জন শিক্ষার্থী রয়েছে। এই সোসাইটির সদস্যরা বিভিন্ন বিতর্ক প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করে ও নিজেদেরকে দক্ষ হিসেবে গড়ে তোলে।

বাংলা উপস্থিত বক্তৃতা সোসাইটি

শিক্ষার্থীদের যে কোন বিষয়ে কথা বলায় দক্ষ করে গড়ে তুলতে এই সোসাইটি নিয়মিত কাজ করে যাচ্ছে। সংশ্লিষ্ট শিক্ষকরা আন্তরিকতার সাথে শিক্ষার্থীদের মেধা ও মনন বিকাশে কাজ করছে। এই সোসাইটির ক্লাস নিয়মিত অনুষ্ঠিত হচ্ছে। এই সোসাইটির একজন সদস্য ২০২২ সালে জাতীয় শিশু পুরষ্কার প্রতিযোগিতায় বিভাগীয় পর্যায়ে ২য় স্থান অর্জন করেছে।

বাংলা বিতর্ক সোসাইটি

বিতর্ক হচ্ছে চমৎকার উচ্চারণ এবং ভাষার নৈপুণ্য প্রদর্শনের একটি শিল্প। বাগ্মী হয়ে গড়ে ওঠার জন্য বাংলা বিতর্কের কোনো বিকল্প নেই। এটি শিক্ষার্থীদের সৃজনশীলতা বিকাশ ও মনোবল বৃদ্ধি করে। এই সোসাইটিতে ৫৯ জন শিক্ষার্থী রয়েছে। এই সোসাইটির শিক্ষার্থীরা জেলা পর্যায়ে বিভিন্ন প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করে থাকে।

ইসলামিক টিচিং সোসাইটি

পবিত্র কুরআন মাজীদ আল্লাহর বাণী। ধর্মীয় চেতনাকে উন্নত করতে পবিত্র কুরআন অনুশীলনের কোনো বিকল্প নেই। এই সোসাইটির শিক্ষার্থীরা নিয়মিত কুরআনের তেলাওয়াত অনুশীলন করে থাকে। শিক্ষার্থীরা ইসলামের বিখ্যাত ব্যক্তিদের জীবনী পড়ে থাকে। সমাবেশের দিনে তারা সুমধুর তেলাওয়াতের মাধ্যমে সবাইকে মুগ্ধ করে। এই সোসাইটিতে ৫০ জন শিক্ষার্থীকে নিয়মিত প্রশিক্ষণ দেওয়া হচ্ছে।

অভিনয় সোসাইটি

নাট্যকলায় উজ্জিবিত করার উদ্দেশ্যে এই সোসাইটি পরিচালিত হয়। এই সোসাইটিতে মোট ৩০ জন সদস্য রয়েছে। সোসাইটির সংশ্লিষ্ট শিক্ষকগণ অভিনয়ের বিভিন্ন কৌশল সম্পর্কে ধারণা ও অনুশীলনে সাহায্য করে থাকেন। এই সোসাইটির উদ্দেশ্য হলো শিক্ষার্থীদের আগ্রহ বৃদ্ধি করা, চিন্তা-চেতনার বিকাশ ঘটানো এবং এ বিষয়ে মুক্তমানসিকতা তৈরি করা।

মিউজিক সোসাইটি

সংগীত একটি জাতির সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যের ধারক। সংগীতের মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের অনুভূতির শৈল্পিক প্রকাশ ঘটে এবং মন, শরীর ও আত্মায় শান্তির যোগান দেয়। এই সোসাইটির শিক্ষকবৃন্দ শিক্ষার্থীদের সুর, তাল ও লয় অনুশীলনে আগ্রহী করে তোলেন। শিক্ষার্থীরা জাতীয় ও প্রাতিষ্ঠানিক গুরুত্বপূর্ণ অনুষ্ঠানসহ বিভিন্ন জেলা ও জাতীয় প্রতিযোগিতায় গৌরবময় সাফল্য এনেছে যা প্রতিষ্ঠানের ভাবমূর্তি উজ্জ্বল করেছে।

নৃত্য সোসাইটি

শিল্প এবং শৈল্পিক মনের সর্বোত্তম প্রকাশ হলো নৃত্য যা মানুষের মনকে জাগিয়ে তোলে। এই সোসাইটিতে ৩৯ জন সদস্য রয়েছে। নৃত্য সোসাইটির সাথে সংশ্লিষ্ট শিক্ষকগণ সদস্যদের নিয়মিত অনুশীলন করান। বিভিন্ন অনুষ্ঠান ও প্রতিযোগিতায় এই সোসাইটির সদস্যরা চমৎকার পারফরমেন্স দেখিয়ে প্রতিষ্ঠানের জন্য গৌরব অর্জন করেছে।

গণিত সোসাইটি

সভ্যতার সূচনাকাল থেকে এখন পর্যন্ত গণিতের জ্ঞান মানুষের চিন্তাভাবনা, উদ্ভাবন এবং অগ্রগতির উপর আধিপত্য বিস্তার করে আসছে। গণিতের জ্ঞান ছাড়া আধুনিক জীবন অসম্ভব। তাই শিক্ষার্থীরা যেন খুব সহজেই অল্প সময়ের মধ্যে গণিতে পারদর্শী হতে পারে সেই লক্ষ্যে এই সোসাইটি কাজ করছে।

বিজ্ঞান সোসাইটি

আধুনিক সভ্যতা বিজ্ঞানের উপর নির্ভরশীল। শিক্ষার্থীদের দৈনন্দিন জীবনে বিজ্ঞান ব্যবহারে অভিজ্ঞ করে তোলার জন্য এই সোসাইটি নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে। এটি শিক্ষার্থীদের বিভিন্ন প্রতিযোগিতামুলক পরীক্ষায় অংশগ্রহণে উৎসাহিত করে। এই সোসাইটির শিক্ষার্থীরা নিজেদের আরও দক্ষ করে তুলবে এবং বিজ্ঞানের অগ্রগতিতে ভূমিকা রাখবে।

সাধারণ জ্ঞান সোসাইটি

জ্ঞানের ভাণ্ডারকে সমৃদ্ধ করার জন্য সাধারণ জ্ঞান এবং কারেন্ট অ্যাফেয়ার্স অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। শিক্ষার্থীরা এই সোসাইটির মাধ্যমে বিশ্বের সাম্প্রতিক ঘটনা ও বিষয়গুলির সঙ্গে পরিচিত হচ্ছে। এই সোসাইটি শিক্ষার্থীদের মাঝে বিভিন্ন প্রতিযোগিতার আয়োজন করে। এই সোসাইটির একজন সদস্য জাতীয় শিশু পুরস্কার প্রতিযোগিতা-২০২২ এ বিভাগীয় পর্যায়ে প্রথম হয়ে জাতীয় পর্যায়ে অংশগ্রহণ করেছে।

ফটোগ্রাফি সোসাইটি

ফটোগ্রাফি একটি শখের কাজ। এই সোসাইটিতে ফটোগ্রাফির বিভিন্ন কৌশলের প্রশিক্ষণ দেয়া হয়ে থাকে। এই সোসাইটিতে একটি ডিএসএলআর ক্যামেরা আছে। মাঝে মাঝে পেশাদার ফটোগ্রাফারদেরকেও এই সোসাইটিতে আমন্ত্রণ জানানো হয় এবং তারা ফটোগ্রাফির বিভিন্ন দিক সুন্দরভাবে উপস্থাপন করে শিক্ষার্থীদের দক্ষ করে তোলে।

কম্পিউটার সোসাইটি

কম্পিউটার ও বিজ্ঞান এক সূত্রে গাথা। বিজ্ঞানের উৎকর্ষের সাথে তাল মিলিয়ে কম্পিউটারের বিস্তৃতি বাড়ছে। আধুনিক জীবনে এমন কোন শাখা নেই যেখানে কম্পিউটারের ব্যবহার অনুপস্থিত। তাই বড় একটি কম্পিউটার ল্যাবে কম্পিউটার সোসাইটির শিক্ষার্থীরা কম্পিউটারের উপর দক্ষতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে প্রশিক্ষণ গ্রহণ করে থাকে।

ড্রয়িং সোসাইটি

মানুষের কল্পনার জগত আশ্চর্যজনক এবং অত্যন্ত চমৎকার। শুধুমাত্র একটি তুলি ও রঙ দিয়ে চিত্রাঙ্কনের মাধ্যমে এই কল্পনার জগতকে বাস্তবে রূপ দেয়া সম্ভব। এই সোসাইটির সদস্যরা তাদের মনের রঙে পৃথিবী এবং প্রকৃতিকে রঙিন করার সুযোগ পায়। বিভিন্ন প্রকার ল্যান্ডস্কেপ, প্রাণীদের ছবি অঙ্কনকরে তারা অনুশীলন করে। এই সোসাইটির সদস্যরা জেলা ও বিভাগীয় প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করে স্বীকৃতি পেয়েছে।

ফুটবল সোসাইটি

ফুটবল অত্যন্ত চমৎকার একটি উত্তেজনাপূর্ণ খেলা। এ খেলার সূচনা হয় চীনে। বর্তমানে সারা বিশ্বে এ খেলাটি তুমুল জনপ্রিয়। বাংলাদেশেও একটি অন্যতম জনপ্রিয় খেলা এই ফুটবল। এ সোসাইটিতে একজন ক্রীড়া শিক্ষক শিক্ষার্থীদের ভাল ফুটবল খেলার প্রশিক্ষণ দিয়ে থাকেন। আন্তর্জাতিক ম্যাচ দেখে আইকন ফুটবলারদের কৌশল দেখানোর মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের উৎসাহিত করা হয়।

ক্রিকেট সোসাইটি

ইংল্যান্ডের সীমা পেরিয়ে ক্রিকেট বহু আগেই বিশ্বের একটি জনপ্রিয় খেলায় পরিণত হয়েছে। বাংলাদেশেও ক্রিকেট নিয়ে উন্মাদনার শেষ নেই। দেশের সর্বত্রই ক্রিকেট এখন জনপ্রিয় খেলা। এই সোসাইটির সদস্যরা বোলিং, আম্পায়ারিং, ব্যাটিং ও ফিল্ডিংয়ের প্রশিক্ষণ নেয়। নিয়মিত শারীরিক ব্যায়াম তাদের দৃঢ়তা বাড়ায়। নিয়মিত অনুশীলন, উন্নত প্রশিক্ষণ তাদের মূল কর্মকাণ্ড।

ভলিবল সোসাইটি

ভলিবল আমাদের দেশে একটি জনপ্রিয় খেলা। শহুরে এবং গ্রামীণ উভয় ক্ষেত্রেই তরুণরা নিয়মিত এই খেলা খেলে। ভালো খেলোয়াড় তৈরির লক্ষ্যে এই সোসাইটি শিক্ষার্থীদের জন্য সুযোগ তৈরি করে যাতে তারা নিয়মিত অনুশীলন ও উন্নত প্রশিক্ষণের মাধ্যমে দক্ষতা অর্জন করতে পারে।

বাস্কেটবল সোসাইটি

বাস্কেটবল একটি আন্তর্জাতিক খেলা। অত্র প্রতিষ্ঠানে দুটি বাস্কেটবল মাঠ আছে যা শিক্ষার্থীদের ব্যাপক অনুশীলন করতে সাহায্য করে। একজন প্রশিক্ষক খেলার বিভিন্ন কৌশল সম্পর্কে প্রশিক্ষণ দেন। যেহেতু খেলাটির জন্য প্রচুর স্ট্যামিনার প্রয়োজন, তাই প্রথমে প্রচুর শারীরিক ব্যায়াম করতে হয়। এই সোসাইটির কলেজ টিম ইতোমধ্যে জেলা পর্যায়ে চ্যাম্পিয়নশিপ অর্জন করেছে।

হ্যান্ডবল সোসাইটি

হ্যান্ডবল আমাদের দেশে একটি জনপ্রিয় খেলা। শহর ও গ্রামীণ এলাকার ছেলে-মেয়ে উভয়েই নিয়মিত এই খেলাটি খেলে কিন্তু অত্র প্রতিষ্ঠানে এটি শুধুমাত্র মেয়েদের জন্য। ভাল খেলোয়াড় তৈরির লক্ষ্যে একজন ক্রীড়া শিক্ষক নিয়মিত হ্যান্ডবলের প্রশিক্ষণ দিয়ে যাচ্ছে।

ব্যাডমিন্টন সোসাইটি (মেয়েদের জন্য)

ব্যাডমিন্টন একটি আন্তর্জাতিক খেলা। এই প্রতিষ্ঠানে শুধুমাত্র মেয়ে শিক্ষার্থীরা ব্যাডমিন্টন খেলার সুযোগ পেয়ে থাকে। এখানে দুটি ব্যাডমিন্টন মাঠ আছে যা খেলোয়াড়দের ব্যাপক অনুশীলন করতে সাহায্য করে। একজন প্রশিক্ষক আমাদের এই খেলার বিভিন্ন কৌশল সম্পর্কে প্রশিক্ষণ দেন। এই সোসাইটির কিছু সদস্য ইতোমধ্যে জেলা পর্যায়ে ট্রফি জিতে সাফল্য অর্জন করেছে।

দাবা সোসাইটি

দাবা একটি রাজকীয় খেলা। রাজা এবং পাশার নড়াচড়ার জন্য খেলোয়াড়দের মনের দৃঢ়তা প্রয়োজন। এই সোসাইটি বিভিন্ন দিবসে খেলার আয়োজন করে। শিক্ষগণ খেলোয়াড়দের দাবা খেলার বই পড়তে দেন। এ সোসাইটিতে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে অভিজ্ঞতাসম্পন্ন লেখকদের বই পড়িয়ে শিক্ষার্থীদের অনুপ্রাণিত করা হয়। নিয়মিত অনুশীলনে তাদের জ্ঞানকে তীক্ষ্ণ করে তোলা হয়।

গার্লস গাইড কার্যক্রম

এই সোসাইটি গার্লস গাইডিংয়ের মূল স্রোতে যোগ দেওয়ার জন্য মেয়ে শিক্ষার্থীদের সুযোগ দিচ্ছে। নিয়মিত প্রশিক্ষণের মাধ্যমে এই সোসাইটির সদস্যরা তাদের আদর্শ অর্জনে যথেষ্ট দক্ষ হয়ে উঠছে এবং পরিবেশ উন্নয়নমূলক কাজে অংশগ্রহণের জন্য তাদের প্রস্তুত করছে। ধৈর্য এবং সংকল্পের সাথে তারা তাদের লক্ষ্যে এক ধাপ অগ্রসর হচ্ছে।

বয়েজ স্কাউট কার্যক্রম

জীবনে শৃঙ্খলা প্রয়োজন এবং স্কাউটিং শিক্ষার্থীদের মাঝে এই শৃঙ্খলা আনয়নে সাহায্য করে থাকে। স্কাউটিং একটি আদর্শ কাজ কারণ এটি শিক্ষার্থীদের সুশৃঙ্খল জীবনযাপনে প্রশিক্ষণ দিয়ে থাকে। যাতে দেশের যেকোনো খারাপ পরিস্থিতিতে নিজেদের রক্ষা করতে পারে এবং দুর্দশাগ্রস্ত লোকদের সাহায্য করতে পারে। এই সোসাইটির ৫০ জন সদস্য তিনটি সাবটিমে বিভক্ত হয়ে স্কাউটিংএর বিভিন্ন কাজে অংশগ্রহণ করছে।

রোভার স্কাউট কার্যক্রম

লর্ড ব্যাটেন পাওয়েল স্কাউটিং এর পথপ্রদর্শক। স্কাউটিংএর আদর্শ ও শিক্ষায় অনুপ্রাণিত হয়ে এই সোসাইটির সদস্যরা দুঃস্থ মানুষের সেবা এবং নিজেদেরকে দেশের আদর্শ নাগরিক হিসেবে গড়ে তোলার শপথ নিয়ে থাকে। আদর্শ, আত্মনির্ভরশীল নাগরিক হয়ে ওঠার মূলমন্ত্র তাদের হৃদয়ে লালন করে প্রশিক্ষিত শিক্ষকদের তত্ত্বাবধানে তারা শক্তিশালী ও বিশেষজ্ঞ দলে পরিণত হয়েছে।

বিএনসিসি কার্যক্রম

জীবনে নিয়মানুবর্তিতা প্রয়োজন এবং বিএনসিসি ক্যাডেটশিপ শিক্ষার্থীদের জন্য একটি আদর্শ কাজ। এই সোসাইটিতে শিক্ষার্থীদের একটি সুশৃঙ্খল জীবনধারণ করতে প্রশিক্ষণ দেয়া হয়। বিএনসিসি ক্যাডেটরা দুর্দশাগ্রস্ত লোকদের সাহায্য করতে শিখে। ইংরেজি সংবাদপত্র পড়া, বিতর্ক, এক্সটেম্পো, সেট স্পিচ, ওএলসি-এর মতো সামাজিক সচেতনতামূলক প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ ক্যাডেটদের বুদ্ধিবৃত্তিক প্রতিভা বাড়ে। সাম্প্রতিক রেজিমেন্টাল ক্যাম্পিং-এ প্লাটুনের ক্যাডেটরা বিতর্ক, এক্সটেম্পো, সংবাদপত্র পাঠ ইত্যাদিতে জয়লাভ করে তাদের উজ্জ্বল প্রতিভা দেখিয়েছে। এই সোসাইটির কিছু সদস্য ইতোমধ্যেই বেসিক ট্রেনিং প্রোগ্রামে অংশ নিয়েছে এবং তাদের অনেকেই প্রশিক্ষণ ও ব্যাজ প্রাপ্তির জন্য অনুশীলন করছে। এই সোসাইটির ২৮ (আটাশ) জন বিএনসিসি ক্যাডেট তিনটি সাবটিমে বিভক্ত এবং তারা প্রশিক্ষিত সেনা সদস্য ও একজন প্লাটুন কমাণ্ডারের অধীনে বিএনসিসির বিভিন্ন কাজে অংশগ্রহণ করছে।

প্রশিক্ষণরত ক্যাডেটবৃন্দ

প্রাক্তন সভাপতি ও অধ্যক্ষ মহোদয়ের সাথে বিএনসিসির ক্যাডেটবৃন্দ

অধ্যক্ষ মহোদয় ও প্লাটুন কমান্ডার এর সাথে বিএনসিসির ক্যাডেটবৃন্দ

প্রতিষ্ঠান প্রতিবেদন

'ময়মনসিংহ গীতিকা'র শতবর্ষ ২০২৩-এ দাঁড়িয়ে একথা বলাই বাহুল্য যে, ব্রহ্মপুত্রের তীর ঘেঁষে গড়ে ওঠা প্রাচীন এক জনপদ ময়মনসিংহ। শিক্ষা নগরী হিসেবে খ্যাত এই শহরের প্রাণ কেন্দ্রে ময়মনসিংহ সেনানিবাসের অভ্যন্তরে প্রতিষ্ঠিত স্বনামধন্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ক্যান্টনমেন্ট পাবলিক স্কুল এন্ড কলেজ মোমেনশাহী। বিশ্বের বুকে বাংলাদেশের পরিচয়কে নব উদ্যমে ফুটিয়ে তোলার লক্ষ্যে বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর সুষ্ঠু পরিকল্পনায় ১৯৯৩ সালের ৪ মার্চ প্রতিষ্ঠিত হয় অত্র প্রতিষ্ঠান। এগারো দশমিক উনিশ একর আয়তনের প্রাকৃতিক সৌন্দর্যে পাখির কুজন মুখরিত এই ক্যাম্পাসে রয়েছে নার্সারি-কেজি শ্রেণির দৃষ্টিনন্দিত ডিজিটাল ক্লাস রুম, প্রাথমিকশাখা ভবন, মাধ্যমিকশাখা ভবন, কলেজ ভবন, অত্যাধুনিক কনফারেন্স স্পেস সংবলিত প্রশাসনিক ভবন, আধুনিক মানের অডিটোরিয়াম, যুগোপযোগী লাইব্রেরি, সমৃদ্ধ বিজ্ঞানাগার, পাঞ্জেগানা মসজিদ, শহিদ মিনার। বর্তমান অধ্যক্ষ মহোদয় তত্ত্বাবধায়নে এ বছর প্রশাসনিক ভবনের দেয়ালে স্থাপিত হয়েছে ২০৮ ফুট দীর্ঘ আয়তন বিশিষ্ট টেরাকোটা, যার সাথে সংযুক্ত স্থিরচিত্র মঞ্চ। ফুল বাগানের সংস্পর্শে এই শিল্পের সৌন্দর্য শতগুণে বৃদ্ধি পেয়েছে। এই সুশৃঙ্খল ক্যাম্পাসে আরো রয়েছে বৃহদাকার ২টি খেলার মাঠ, একটি শিশু বিনোদন পার্ক, শিক্ষক ও কর্মকর্তা-কর্মচারীদের আবাসন ব্যবস্থা ও শিক্ষার্থীদের জন্য ক্যান্টিন সুবিধা। একথা সর্বজন স্বীকৃত যে, একটি আদর্শ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান কেবল ভালো ফলাফলই নিশ্চিত করে না বরং পাঠ্যক্রমের পরিপূরক সহপাঠক্রমিক শিক্ষাকে সমান গুরুত্ব দিয়ে শিক্ষার্থীকে পরিপূর্ণ বিকশিত করে। এ লক্ষ্যে সকল শিক্ষার্থীকে হাউসভিত্তিক বিভিন্ন প্রতিযোগিতা তথা-বিজ্ঞান, গণিত, সাধারণ জ্ঞান, খেলাধুলা, ভাষা, সাহিত্য ও সংস্কৃতি, বিতর্ক চর্চা ইত্যাদির আয়োজনের মাধ্যমে একজন চৌকস ও নেতৃত্বদানে যোগ্য মানুষ হিসেবে গড়ে তোলে। এই সকল প্রতিযোগিতাকে আরো বেশি প্রাণবন্ত করতে ইতোপূর্বে ৩টি হাউস থাকলেও বর্তমান অধ্যক্ষ লে. কর্নেল শামীম আহমেদ, পিএসসি, এএসসি মহোদয়ের সৃজনশীল মেধার বহিঃপ্রকাশ ও দূরদর্শী দৃষ্টিভঙ্গিতে এ বছর বীরশ্রেষ্ঠ ক্যাপ্টেন মহিউদ্দীন জাহাঙ্গীরের নামানুসারে সূচনা করা হয়েছে চতুর্থ হাউসের। পরিচালনা পর্ষদের যুগোপযোগী পরিকল্পনা ও সুচিন্তিত নির্দেশনায়, শিক্ষকমণ্ডলীর অক্লান্ত পরিশ্রমে এবং বিশ্বজয়ের স্বপ্নে বিভোর একঝাঁক মেধাবির মিলনমেলা ক্যান্টনমেন্ট পাবলিক স্কুল এন্ড কলেজ বর্তমানে পরিণত হয়েছে ময়মনসিংহের অন্যতম শ্রেষ্ঠ বিদ্যাপিঠে। বিশ্ব বিখ্যাত প্রায় সকল বিদ্যানিকেতনের সূচনাই হয়েছে ক্ষুদ্র পরিসর থেকে। ছোট ছোট বালু কণা যেমন মহাদেশে রূপান্তরিত হয়, তেমনি ১৯৯৩ সালের ৪ মার্চ ময়মনসিংহ ক্যান্টনমেন্ট এর স্টেশন সেন্ট্রাল স্কুলের পাশে যে ট্রেনিং শেড রয়েছে সেই ভবনের কয়েকটি কক্ষে নার্সারি থেকে ৬ষ্ঠ শ্রেণি পর্যন্ত, ৬৪ জন ফুলকলিরূপী শিক্ষার্থী নিয়ে পাঠদান শুরু হওয়া ক্যান্টনমেন্ট পাবলিক স্কুল এন্ড কলেজ মোমেনশাহী। যাদের সকলের সম্মিলিত প্রচেষ্টায় বরাবরই পাবলিক পরীক্ষায় ক্যান্টনমেন্ট পাবলিক স্কুল এন্ড কলেজ তুলে ধরে নিজের গৌরবোজ্জ্বল ফলাফল। প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকে এ বিদ্যানিকেতন পাঠ্যক্রম ও সহপাঠ-কার্যক্রমের নানান শাখায় মান ও গুনের বিচারে সুনাম ও সুখ্যাতি বজায় রেখেছে। ২০১৭ সাল পর্যন্ত ঢাকা বোর্ডের অধিনে থাকাকালীন একাধিকবার শ্রেষ্ঠত্বের বিচারে মেধাস্থান অর্জন করেছে। ২০১৮ সাল থেকে ময়মনসিংহ শিক্ষা বোর্ড প্রতিষ্ঠার পর থেকে বেশ কয়েকবার ময়মনসিংহের শ্রেষ্ঠ বিদ্যাপিঠ হিসেবে স্বীকৃতি লাভ করে। এ প্রতিষ্ঠান ২০২৩ সালের এসএসসি পরীক্ষায় ময়মনসিংহ শিক্ষা বোর্ডে প্রথম হওয়ার গৌরব অর্জন করে। বিগত বছরগুলোতে বিভিন্ন পাবলিক পরীক্ষায় প্রতিষ্ঠানের ফলাফল নিম্নরূপ:

এসএসসি পরীক্ষা ২০২২ এর ফলাফল

পরীক্ষার্থীর সংখ্যা	কৃতকার্যের সংখ্যা	জিপিএ প্রাপ্তদের সংখ্যা এবং (এর শতকরা হার)							মোট পাশের হার (%)	মন্তব্য
		৫.০০	৪> <৫	৩.৫> <৪	৩> <৩.৫	২> <৩	১> <২	এফ		
২৬৫	২৬৪	২১৩	৫০	০১	-	-	-	০১	৯৯.৬২%	

এসএসসি পরীক্ষা ২০২৩ এর ফলাফল

পরীক্ষার্থীর সংখ্যা	কৃতকার্যের সংখ্যা	জিপিএ প্রাপ্তদের সংখ্যা এবং (এর শতকরা হার)							মোট পাশের হার (%)	মন্তব্য
		৫.০০	৪> <৫	৩.৫> <৪	৩> <৩.৫	২> <৩	১> <২	এফ		
২৭৫	২৭৫	২৬৪	১১	-	-	-	-	-	১০০%	

এইচএসসি পরীক্ষা ২০২২ এর ফলাফল

পরীক্ষার্থীর সংখ্যা	কৃতকার্যের সংখ্যা	জিপিএ প্রাপ্তদের সংখ্যা এবং (এর শতকরা হার)							মোট পাশের হার (%)	মন্তব্য
		৫.০০	৪> <৫	৩.> <৪	৩> <৩.৫	২> <৩	১> <২	এফ		
৫৩৪	৫৩২	৩৪৫	১৮৪	০২	-	০১	-	০২	৯৯.৬৩%	

জাতীয় শিক্ষা সপ্তাহ-২০২২

গ্রুপ	বিষয়	উপজেলা	জেলা	বিভাগ
ক।	দেশাত্মবোধক গান	১ম- মিথিলা দেবনাথ শ্রেণি-৬ষ্ঠ	১ম- মিথিলা দেবনাথ শ্রেণি -৬ষ্ঠ	১ম- মিথিলা দেবনাথ শ্রেণি -৬ষ্ঠ
খ।	দেশাত্মবোধক গান	১ম- আবিদ হাসান আপন শ্রেণি-১০ম	১ম- আবিদ হাসান আপন শ্রেণি-১০ম	-
ক।	হামদ-নাত	১ম- মিথিলা রহমান নোভা শ্রেণি-৬ষ্ঠ	১ম- মিথিলা রহমান নোভা শ্রেণি-৬ষ্ঠ	১ম- মিথিলা রহমান নোভা শ্রেণি-৬ষ্ঠ
ক।	নজরুল সংগীত	১ম- ঈশান দে, শ্রেণি-৬ষ্ঠ	১ম- ঈশান দে শ্রেণি-৬ষ্ঠ	-
ক।	উচ্চাঙ্গ সংগীত	১ম- ঈশান দে, শ্রেণি-৬ষ্ঠ	১ম- ঈশান দে শ্রেণি-৬ষ্ঠ	১ম- ঈশান দে শ্রেণি-৬ষ্ঠ
ক।	লোক সংগীত	১ম- মিথিলা দেবনাথ শ্রেণি-৬ষ্ঠ	-	-
ক।	ক্বেরাত	১ম- মাহফুজুর রহমান শ্রেণি-১১শ	-	-
গ।	বাংলা রচনা	১ম- নবনিতা সাহা পূজা শ্রেণি-১১শ	-	-
খ।	বিতর্ক প্রতিযোগিতা	১ম- সাজিদ মাহমুদ শীর্ষ শ্রেণি-৯ম	-	-
খ।	নির্ধারিত বক্তৃতা	১ম- রাফিয়া তাবাসসুম শ্রেণি-৯ম	-	-
গ।	লোকনৃত্য	১ম- রাইয়ানা রহমান হৃদি শ্রেণি-১১শ	১ম- রাইয়ানা রহমান হৃদি শ্রেণি-১১শ	-

জাতীয় শিক্ষা সপ্তাহ-২০২৩

গ্রুপ	বিষয়	উপজেলা	জেলা	বিভাগ
ক।	হামদ/নাত	১ম- মিথিলা রহমান শ্রেণি-৭ম	১ম- মিথিলা রহমান শ্রেণি-৭ম	-
ক।	বাংলা রচনা প্রতিযোগিতা	১ম- আরিশা বিনতে ফয়সল শ্রেণি-৮ম	-	-
ক।	ইংরেজি রচনা প্রতিযোগিতা	১ম- রুবাইয়া হাসান লামহা শ্রেণি-৮ম	-	-
গ।	নির্ধারিত বক্তৃতা (ইংরেজি)	১ম- আহনাফ ইবনে তারিক অর্ক শ্রেণি-১১শ	১ম- আহনাফ ইবনে তারিক অর্ক শ্রেণি-১১শ	
খ।	বিতর্ক প্রতিযোগিতা	১ম- সাজিদ মাহমুদ শীর্ষ শ্রেণি-১০ম	-	-
খ।	রবীন্দ্র সংগীত	১ম- বর্নি বিনতা দত্ত শ্রেণি-১০ম	-	-
খ।	লোক সংগীত	১ম- অমিয়া হক শ্রেণি-১০ম	১ম- অমিয়া হক শ্রেণি-১০ম	-
গ।	লোক সংগীত	১ম- মোঃ জাকারিয়া নাবিল শ্রেণি-১১শ	১ম- মোঃ জাকারিয়া নাবিল শ্রেণি-১১শ	১ম- মোঃ জাকারিয়া নাবিল শ্রেণি-১১শ
ক।	তাৎক্ষণিক অভিনয়	১ম- জাফরানা ইয়াসমিন শ্রেণি-৮ম	১ম- জাফরানা ইয়াসমিন শ্রেণি-৮ম	

জাতীয় শিশু পুরস্কার প্রতিযোগিতা ২০২০ (অনুষ্ঠিতব্য-২০২৩)

গ্রুপ	বিষয়	নাম	পর্যায়	ফলাফল
ক।	উচ্চাঙ্গ সংগীত	ঈশান দে শ্রেণি-৬ষ্ঠ	জাতীয় পর্যায়	১ম স্থান
খ।	নজরুল সংগীত	ঈশান দে শ্রেণি-৭ম	জাতীয় পর্যায়	১ম স্থান

জাতীয় শিশু পুরস্কার প্রতিযোগিতা ২০২১ (অনুষ্ঠিতব্য-২০২৩)

গ্রুপ	বিষয়	নাম	পর্যায়	ফলাফল
ক।	দেশাত্মবোধক গান	মিথিলা দেবনাথ হিয়া শ্রেণি-৬ষ্ঠ	জাতীয় পর্যায়	১ম স্থান
খ।	দেশাত্মবোধক গান	আবিদ হাসান আপন শ্রেণি-১০ম	জাতীয় পর্যায়	৩য় স্থান

৫১তম শীতকালীন জাতীয় স্কুল, মাদরাসা ও কারিগরি শিক্ষা ক্রীড়া প্রতিযোগিতা-২০২৩

গ্রুপ	বিষয়	নাম	পর্যায়	ফলাফল
ক।	গোলক নিক্ষেপ	নাহিদ ফাহিম খান রিফাত শ্রেণি-১০ম	জেলা পর্যায়	১ম স্থান
খ।	উচ্চলাফ (বড়)	নাহিদ ফাহিম খান রিফাত শ্রেণি-১০ম	জেলা পর্যায়	২য় স্থান
গ।	ট্রিপল জাম্প (বড়)	মোঃ সাইয়্যিদ আল ইমরান শ্রেণি-১০ম	জেলা পর্যায়	২য় স্থান
ঘ।	চাকতি নিক্ষেপ (বড়)	মোঃ মেহেদী হাসান শ্রেণি-১০ম	জেলা পর্যায়	১ম স্থান
ঙ।	উচ্চলাফ (বড়)	আব্দুল্লাহ আল রাফি শ্রেণি-১০ম	জেলা পর্যায়	৩য় স্থান

আন্তঃ কলেজ এ্যাথলেটিকস প্রতিযোগিতা ২০২৩

গ্রুপ	বিষয়	নাম	পর্যায়	ফলাফল
ক।	গোলক নিক্ষেপ	মোঃ উজ্জল শ্রেণি-১২শ	জেলা পর্যায়	১ম স্থান
খ।	চাকতি নিক্ষেপ	মোঃ উজ্জল শ্রেণি-১২শ	জেলা পর্যায়	২য় স্থান
গ।	উচ্চলাফ	আবু ফাতিমা মোহম্মদ রাফিদ শ্রেণি-১২শ	জেলা পর্যায়	৩য় স্থান

বিজ্ঞান মেলা ২০২৩ এর জেলা পর্যায় ফলাফল

ক্র.নং	শিক্ষার্থীর নাম	শ্রেণি	প্রজেক্টের নাম-০৫
ক।	সারা মাহাবুব সুপ্রভা	৭ম	Power Saving and Digital Village
খ।	সাদিয়া তাসনিম	৭ম	Power Saving and Digital Village
গ।	সারামাত বিনতে শামীম আদ্রিতা	৭ম	Power Saving and Digital Village
ঘ।	মাফশিন জেনান	৭ম	Power Saving and Digital Village
ঙ।	ফুয়াদ ইসলাম ফাহিম	৯ম	Tesla coil
চ।	শাহরিয়ার নাফিজ	৯ম	Tesla coil
ছ।	তাসফিয়া তারান্নুম	১০ম	বিজ্ঞান অলিম্পিয়াড

বাংলা সাহিত্য

সাহিত্যিক যখন আত্মপ্রকাশ করেন, তখন তিনি হয়তো নিজের অন্তরকে প্রকাশ করেন বা বাহ্যজগতের রূপ-রস-গন্ধ-স্পর্শ-শব্দকে আত্মগত অনুভূতি বশে স্নিগ্ধ করিয়া প্রকাশ করেন, অথবা তাহার ব্যক্তি অনুভূতি নিরপেক্ষ বিশ্বজগতের বস্তুসত্তাকে প্রকাশ করেন। নিজের কথা বা পরের কথা বা বাহ্যজগতের কথা সাহিত্যিকের মনোবীণায় যে সুর ঝংকৃত হয়, তাহার শিল্পসম্মত প্রকাশই সাহিত্য। -শ্রীশচন্দ্র দাশ

গল্প প্রবন্ধ ও অন্যান্য

আধুনিক বাংলা কবিতার উদ্ভব ও বিকাশ

সঞ্জয় কুমার কুণ্ডু
উপাধ্যক্ষ (কলেজ)

কাব্য-কবিতা আমাদের ঐতিহ্য। বাংলা সাহিত্যের প্রাচীন ও মধ্যযুগ পুরোটাই ছিল কবিতানির্ভর। আজকের প্রেক্ষাপটে আধুনিক কবিতার পদার্পণ চর্যাপদের ঐতিহ্যের সিঁড়ি বেয়েই ।

প্রথমেই আসা যাক এই 'আধুনিক' বা 'আধুনিকতা' বলতে আমরা কী বুঝি। আধুনিকতা সময় নিয়ে নয়, মর্জি নিয়ে। কারণ শেলি, কিট্স তাঁদের যুগে আধুনিক ছিলেন, রবীন্দ্রনাথও একদা আধুনিক ছিলেন বাংলা সাহিত্যে। তাহলে দেখা যাচ্ছে, সময়ের দিক থেকে আধুনিক হলে, আধুনিক কবিতা হয় না। আধুনিক কবিতা সম্পর্কে কাব্যসমালোচক নানাজন নানাকথা বলেছেন। তবে এ প্রসঙ্গে স্পষ্টতর কাল নির্দেশক সংজ্ঞা দিয়েছিলেন জনাব আবু সয়ীদ আইয়ুব (১৯০৬ -১৯৮২) তাঁর আধুনিক কবিতা সংকলনে। "কালের দিক থেকে মহাযুদ্ধ পরবর্তী এবং ভাবের দিক থেকে রবীন্দ্র প্রভাবমুক্ত, অন্তত মুক্তিপ্রয়াসী কাব্যকেই আমরা আধুনিক কাব্য বলে গণ্য করছি"

আধুনিক কবিতার ভিত্তিস্তম্ভের দিকে আলোকপাত করলে যুগ ও চেতনার দিক থেকে আসে মাইকেল মধুসূদন দত্তের কবিতা। এ কথা বলা যায়, মধুসূদনের পরিবর্তনই রবীন্দ্রনাথের বিকাশ। এই আধুনিকতার বিচিত্র বিচরণে গগনচুম্বী প্রতিভার এক অট্টালিকা নির্মাণ করে গেছেন রবীন্দ্রনাথ। এরপর রবীন্দ্রোত্তর কালের পরিপ্রেক্ষিতে কঠোর বাস্তবতায় জন্ম নিল আরেক ধরনের আধুনিক কবিতা। নতুন প্রজন্মের এ কবিতাকে 'তিরিশের কবিতা' নামেও আখ্যায়িত করা যায়।

শিল্প-সাহিত্যে আধুনিকতার আরম্ভটা ঘটেছিল বিজ্ঞান-ইতিহাস-নৃতত্ত্ব-মনস্তত্ত্বসংবলিত মানসক্রিয়ার পরিচর্যাবদ্ধ একটি প্রতীকী রীতির মধ্য দিয়ে। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের অভিঘাতে জটিল এক ভাবমণ্ডল তৈরি হয়েছিল ডারউইনের বিবর্তনবাদ, আইনস্টাইনের আপেক্ষিক তত্ত্ব, ফ্রয়েডের মনঃসমীক্ষা, ফ্রেজারের নৃতত্ত্ব, মার্কসের দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদ দিয়ে। এর সাথে

বাস্তব উপাদান হিসেবে যুক্ত হতে থাকে বিভিন্ন রাষ্ট্রের অস্থির পরিস্থিতি, নাগরিক জীবনের ভারসাম্যহীন বিস্তার, সামাজিক কাঠামোতে ব্যাপক ভাঙন।

বাংলা সাহিত্যে পাশ্চাত্য জগৎ থেকে আধুনিকতা এসেছে। প্যারিসবাসী শার্ল বোদলেয়ারের কাব্য থেকে মূল সুর দেখতে পাওয়া যায়। তিনি শুধু প্রতীকতার উৎসস্থল নন, সমগ্রভাবে আধুনিক কবিতার জনয়িতা। ফরাসি কবিতায় তাঁর অনুরণন, পরবর্তী পশ্চিমা কাব্যে কখনো প্রত্যক্ষ কখনো হয়তো অনেক ঘুরে আসা, কিন্তু নির্ভুলভাবে তারই চিত্তনির্যাস।

আধুনিক কবিতা প্রসঙ্গে বুদ্ধদেব বসু বলেছেন "আধুনিক কবিতা এমন কোনো পদার্থ নয়, যাকে কোনো একটা চিহ্ন দ্বারা অবিকল ভাবে সনাক্ত করা যায়। একে বলা যেতে পারে বিদ্রোহের, প্রতিবাদের কবিতা, সংশয়ের ক্লান্তির সন্ধানের, আবার এরই মধ্যে প্রকাশ পেয়েছে বিস্ময়ের জাগরণ, জীবনের আনন্দ, বিশ্ববিধানে আস্থাবান চিত্তবৃত্তি, আশা আর নৈরাশ্য।"

বাংলা কবিতায় আধুনিকতার পরিপ্রেক্ষিত তৈরি হয়েছিল প্রথম বিশ্বযুদ্ধ পরবর্তী সময়-চারিত্র্যে, এলিয়ট-পাউন্ডের নন্দনতত্ত্বের প্রভাব এবং রবীন্দ্রনাথের লিরিকচেতনার সঙ্গে বৈপরীত্য সৃষ্টির তাগিদে। আধুনিক কাব্য আন্দোলনের প্রবক্তারা দ্ব্যর্থহীন ভাষায় ঘোষণা করেছেন, রবীন্দ্র পরিমণ্ডলে আধুনিক কবিতার মুক্তি অসম্ভব। কারণ যুদ্ধোত্তর জীবনের মূল্যবোধে আর রবীন্দ্র যুগের মূল্যবোধে দুস্তর ব্যবধান সূচিত হয়েছে।

আধুনিক কবি মানেই স্বভাব উদ্বাস্তু, স্বদেশেও প্রবাসী। তাই বোধহয় বলা যায়, রবীন্দ্রনাথই সর্বাংশে শেষ ভারতীয় কবি। আধুনিকরা বাঙালি কবি কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে বিশ্বের নাগরিক। এ কথা সুধীন্দ্রনাথ দত্ত, জীবনানন্দ দাশ, বিষ্ণু দে, বুদ্ধদেব বসু, অমিয় চক্রবর্তী থেকে যে কোনো আধুনিক কবির সম্বন্ধে খাটে। সেজন্যই সুধীন্দ্রনাথ দত্ত আধুনিক কবিকে মাধুকরী ব্রত পরিব্রাজকের সঙ্গে তুলনা করেছেন। আধুনিক কবি সম্বন্ধে বলা যায়, যে পরিমাণে সে বিশ্ব নাগরিক, সে পরিমাণে উদ্বাস্তু।

আধুনিক কবিদের অন্যতম লক্ষণ কবিদের প্রগাঢ় ইতিহাসচেতনা। আসলে ইতিহাস সচেতন বলেই তাঁদের কবিতার আঙ্গিক ও বিষয়বস্তুর এমন মৌলিক পরিবর্তন; তাঁদের নন্দনতাত্ত্বিক ধারণায় এমন বিপ্লব। তাঁরা বিশ্বাস করেছিলেন, কালজ্ঞান ভিন্ন কবির গতি নাই।

নগরের স্বতন্ত্র নির্মম সৌন্দর্য আবিষ্কার করলেন তিরিশের দশকের কবিরা। আধুনিক কবিতা নগরক্লান্ত, অনিকেত গড্ডলপ্রবাহের নগর। নাগরিক জীবনের বীভৎসতার দিকে চোখ বুঁজে থাকা মানে মিথ্যার বেসাতি; অবশ্য বাঙালি কবিরা শুধু নগরের কবি নন, তাঁরা সর্বতোভাবে সচেতন কবি। মনীষা তাঁদের কবিতায় একটা মৌলিক লক্ষণ। আধুনিক কবিদের চেষ্টায় যা কিছু কবিতা নয় তার থেকে শোধিত হয়ে কবিতা হয়েছে অনেক পবিত্র, অনেক স্বাবলম্বী। এই কবিরা নিজেদের প্রয়োগের দ্বারা কাব্যাদর্শের পালাবদল ঘটিয়েছেন, এই কবিদের আবির্ভাব একটা উত্তেজনা, উন্মাদনার মধ্যে ঘটেছিল।

পরিশেষে বলা যায়, রবীন্দ্রোত্তর যুগে নতুন স্বাদ, নতুন কৌশল অনেকেই হয়তো এনেছেন কিন্তু জীবনব্যাপী সযত্ন গবেষণায় ও সচেতন পরিশ্রমে বাংলা সাহিত্যকে নতুন পথের সন্ধান এই পাঁচজন কবিই দিয়েছেন। বিংশ শতাব্দীর তৃতীয় দশক বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে মূল্যবান হয়ে রইল। রবীন্দ্রনাথ থেকে তাঁরা সজ্ঞানে যে পৃথক হয়েছিলেন তার মধ্যে ছিল -'ভারসাম্যের আকাঙ্ক্ষা আর আত্মপ্রকাশের পথের সন্ধান'। এঁরা রবীন্দ্রনাথের মোহনরূপে ভুলে থাকলেন না, তাকে কাজে লাগাতে শিখলেন, সার্থক করলেন তাঁর প্রভাব বাংলা কবিতার পরবর্তী ধারায়।

তথ্যসূত্র:

১। আধুনিক বাংলা কাব্য পরিচয় -দীপ্তি ত্রিপাঠী।

২। আধুনিক বাংলা কবিতার ইতিহাস- আলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত ও দেবীপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়।

বাংলা সাহিত্যের পঞ্চপাণ্ডব

সুধীন্দ্রনাথ দত্ত

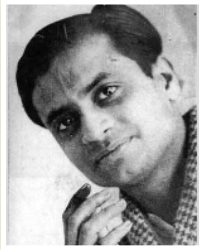
বুদ্ধদেব বসু

জীবনানন্দ দাশ

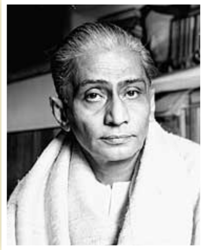
বিষ্ণু দে

অমিয় চক্রবর্তী

চিন্তার উপনিবেশায়ন

মো. তারিকুল গণি
সহকারী অধ্যাপক, ইংরেজি

রবীন্দ্রনাথের ‘তোতা কাহিনী’র তোতা পাখিটিকে জ্ঞানী, বিজ্ঞ বা সভ্য করে গড়ে তোলার অভিপ্রায়ে রাজ্যের নানান ধরনের জ্ঞানে সমৃদ্ধ বই দিনের পর দিন ধীরে ধীরে টিপে টিপে গেলানো হলো। এত পরিমাণ বই-ই খাওয়ানো হলো যে এর ভার নিষ্পাপ পাখিটি আর হজম করতে পারল না। ন্যুজ হয়ে তার সাবলীল কিচিরমিচির বা প্রাণবন্ত উদ্যমতা হারিয়ে মৃত্যুকোলে ঢলে নির্জীব অসাড় হয়ে পড়ে থাকল। সবাই উদ্বিগ্ন কিন্তু রাজা এসে মৃত পাখিটিকে টিপেন, পরখ করেন, দেখেন এবং উদ্বেগহীন কণ্ঠে জানতে চান পাখিটি আগের মত কিচিরমিচির করে কিনা বা আগের মত দাপাদাপি করে কিনা। রাজার প্রশ্নের উত্তরে, পাখিকে বিদ্বান বানানোর দায়িত্বে নিয়োজিত সকলে বলেন যে পাখিটি আর আগের মত কিচিরমিচির করে না। পাখিটি আর কোনো ঔদ্ধত্যপূর্ণ অমার্জিত আচরণ করে না। রাজা এবার সহজ সাধারণ ভাবে বললেন শুধু স্বাভাবিক শিক্ষা কার্যক্রম নয়, পাখিটির উচিত শিক্ষাদান সম্পন্ন হয়েছে।

প্রকৃতির নিয়মে জন্ম নেয়া পাখিটি, রাজার ঔরসে লালিত-পালিত কিছু অপ্রকৃতস্থ, উদ্ভট চিন্তাধারাসম্পন্ন বুদ্ধিজীবী মানুষের কর্মকাণ্ডে মরে গিয়ে দেখিয়ে দিল প্রচলিত শিক্ষা ব্যবস্থায় শিক্ষাদান কিভাবে আমাদের জীবন্মৃত করে রাখে। কিভাবে আমরা সঠিক শিক্ষাদানের পরিবর্তে উচিত শিক্ষা দিচ্ছি। পিঞ্জিরা সদৃশ ক্লাসরুমের মধ্যে আটকে রেখে একপক্ষীয় শিক্ষাদানের প্রক্রিয়ায় শিক্ষিত করতে যাওয়া কতটা ভ্রান্ত তা বিদ্রুপাত্মক ঢংএ কবিগুরু ছোট্ট একটি গল্পের মাধ্যমে আমাদের তথাকথিত বিদ্বজ্জন ও বুদ্ধিজীবীদের দেখিয়েছেন। প্রচলিত পদ্ধতিতে শিক্ষাদানে মানুষের আক্ষরিক অর্থে যে মৃত্যু তা হয়তো ঘটে না কিন্তু মানুষ মনোবৈকল্য নিয়ে জীবন্মৃত অবস্থায় থাকে এবং বেঁচে থাকার জন্য বা টিকে

থাকার জন্য নিজেকে অভিযোজিত করে। শিক্ষার প্রকৃত উদ্দেশ্য কখনো সাধিত হয় না।

শিক্ষার কাজ শুধু নিষ্ক্রিয় অভিযোজন নয় বরং মানুষের চিন্তার মুক্তি দেয়া। শিক্ষার উদ্দেশ্য হলো জ্ঞান দান করা যা দিয়ে কোনো কিছুকে যৌক্তিকভাবে নির্ধারণ করা যায়, সঠিক পছন্দ করা যায়, স্বতন্ত্রভাবে চিন্তা করা যায় এবং নিজস্ব মতামত তৈরি করা যায়। কিন্তু প্রচলিত শিক্ষাদান পদ্ধতিতে শিক্ষিত ব্যক্তির পক্ষে নিছক অভিযোজনকে অতিক্রম করে মুক্ত চিন্তার অধিকারী হওয়া অসম্ভব। কেন অসম্ভব এ প্রসঙ্গে ব্রাজিলের সাও পাওলোর বস্তিতে বেড়ে ওঠা একজন শিক্ষা গবেষক পাওলো ফ্রেইরি তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ 'পেডাগজি অব দ্যা ওপ্রেস্‌ড' এ কিছুটা দেখিয়েছেন যে নিপীড়িত ও বঞ্চিত মানুষদের কোন ধরনের শিক্ষাপদ্ধতিতে শিক্ষিত করে তোলা হচ্ছে। ফ্রেইরি প্রচলিত এই শিক্ষাপদ্ধতি নিয়ে যে তত্ত্বটি আমাদের সামনে উপস্থাপন করেছেন তা হলো 'শিক্ষায় ব্যাংকিং কনসেপ্ট'। প্রভূত সম্পদের অধিকারী বিশাল বিত্তবান তার বিত্ত বা অর্থ আমানত হিসেবে ব্যাংকের আমানত গ্রহণকারীর নিকট জমা করে এবং আমানত গ্রহণকারী ব্যাংকার সযত্নে তা গচ্ছিত রাখে। ঠিক একই পদ্ধতিতে প্রচলিত একবাচনিক (Monological) শিক্ষাব্যবস্থায় অগাধ জ্ঞানের ধারক শিক্ষক তাঁর প্রভূত জ্ঞানের ভাণ্ডার শিক্ষার্থীদের কাছে জমা রাখেন যার বাইরে শিক্ষার্থীর চিন্তা করার কোনো অবকাশ থাকে না। জ্ঞান দানের উৎকর্ষের কেন্দ্রবিন্দু ক্লাসরুমে একজন শিক্ষক তাঁর জ্ঞানভাণ্ডার থেকে মহামূল্যবান সম্পদ ঢালতে থাকেন আর একজন শিক্ষার্থী ব্যাংকের আমানত রক্ষাকারীর মতো তা গচ্ছিত রাখে। শিক্ষার্থীর নিজস্ব প্রজ্ঞা বা চিন্তার প্রয়োগে মুক্তচিন্তার অধিকারী হওয়া এখানে নিরুৎসাহিত। শিক্ষক পড়াচ্ছেন, শিক্ষকই প্রশ্ন করছেন আবার শিক্ষক সেই প্রশ্নের উত্তর নিজস্ব চিন্তাধারা মোতাবেক শিক্ষার্থীর কাছে প্রত্যাশা করছেন। এখানে শিক্ষার্থীর নিজস্বতা প্রকাশ করার কোনো সুযোগ থাকে না। ফলে একজন শিক্ষার্থী তার শিক্ষাজীবনে মুক্তচিন্তা নিয়ে কখনো বেড়ে ওঠার সুযোগ পায় না। এ ধরনের শিক্ষাপদ্ধতিতেই শিক্ষাদান প্রজন্মান্তরে চলে আসছে এবং আমরা মুক্ত-চিন্তা প্রতিবন্ধী হিসেবে আহার, নিদ্রা ও অন্যান্য জৈবিক কার্য চালিয়ে যাওয়ার জন্য নিজেদের অভিযোজিত করছি। অথচ খ্রিস্টের জন্মের বহু পূর্ব থেকে অদ্যাবধি বিভিন্ন দার্শনিক, বুদ্ধিজীবী, শিক্ষাবিদ, চিন্তাবিদ, লেখকগণ একবাচনিক শিক্ষা পদ্ধতির (Monologism) অন্তঃসারশূন্যতার বিপক্ষে শিক্ষায় দ্বিবাচনিকতার (Dialogism) কথা বলে আসছেন। অ্যারিস্টটলের শিক্ষা-চিন্তার মূলে রয়েছে মানুষের মানসিক স্বাস্থ্যের পূর্ণবিকাশ। সক্রেটিসের শিক্ষাদান পদ্ধতি ছিল দ্বিবাচনিক। বাংলার সক্রেটিস বলে খ্যাত প্রফেসর আব্দুর রাজ্জাক ছিলেন প্রচলিত একবাচনিক শিক্ষা পদ্ধতির বিরুদ্ধে। মুক্তচিন্তার মানুষ গড়ার জন্য এত বিদ্বজ্জনের এত তত্ত্ব সত্ত্বেও আমরা সাম্রাজ্যবাদীদের দ্বারা প্রবর্তিত প্রচলিত শিক্ষা পদ্ধতিতে শিক্ষিত প্রতিবন্ধী সৃষ্টি করছি। কিন্তু কেন?

'কেন' এই প্রশ্নের উত্তরে কি বলতে পারি যে আমরা অদৃশ্য কোন গুরুর গুরুদক্ষিণা দিচ্ছি? আমরা কি বিউপনিবেশায়নের যুগে উপনিবেশবাদীদের নব্য উপনিবেশায়নের শৃঙ্খলে আবদ্ধ হয়ে তাদের ঋণ পরিশোধ করছি যেমনভাবে প্রাচীন মহাভারতের একলব্য তার বৃদ্ধাঙ্গুলি দান করে দ্রোণাচার্যের গুরুদক্ষিণা দিয়েছিল। এই বৃদ্ধাঙ্গুলিই ছিল ধনুক চালানোর একমাত্র অবলম্বন। আমরাও কি সঠিক শিক্ষায় শিক্ষিত হয়ে মুক্তচিন্তার অধিকারী হওয়ার একমাত্র অবলম্বনটিকে দান করে দিচ্ছি?

প্রচলিত শিক্ষাব্যবস্থা মানুষের চিন্তাকে শৃঙ্খলিত করার একটি অপপ্রয়াস, যাতে করে মানুষের মস্তিষ্কের কর্মকাণ্ড সীমাবদ্ধ থাকে। মানুষের চিন্তাশক্তি বা সৃজনশীলতাকে সীমাবদ্ধ রাখতে পারলে শোষণের পথ কণ্টকমুক্ত ও দীর্ঘায়িত করা যায়। বিষয়টি একজন ইতালিয়ান চিন্তক ও দার্শনিক এ্যন্থনিও গ্রামসি তার 'প্রিজন নোটবুকে' স্পষ্ট করেছেন। ১৯২০ এর দশকে ইতালির মুসোলিনি সরকার ক্ষমতায় এসে ২০ বছরের জন্য তার মস্তিষ্কের কর্মকাণ্ড বন্ধ রাখার জন্য জেলখানায় তাকে বন্দি করে। গ্রামসির তাঁর প্রিজন নোটবুকে 'হেজেমনি তত্ত্বে' দেখিয়েছেন সাম্রাজ্যবাদীদের আধিপত্যকে সুসংহত করতে দেশ দখল করে শুধু দেহ আটকে রেখে সম্ভব নয়, শাসন শোষণের পথ দীর্ঘায়িত ও টেকসই করতে হলে চিন্তা দখল করতে হবে। এক সময় ছিল ধর্মীয় অনুভূতিতে আঘাত করে মানুষের চিন্তা দখল করা। সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ তাঁর 'লালসালু' উপন্যাসে দেখিয়েছেন ধর্মকে অবলম্বন করে মজিদ কিভাবে তার আধিপত্য বিস্তারের জন্য মানুষের চিন্তাকে দখলে এনেছে। কিন্তু বর্তমানে চিন্তা দখলের একমাত্র উপায় হল ভাষা, শিক্ষা, সাহিত্যকে দখলে আনা। বাংলা ভাষাকে গ্ল্যামারলেস ভাবা বা এক বাচনিক পদ্ধতিতে শিক্ষিত করা বা বৃটিশ ঔপনিবেশিক শাসন আশির্বাদ না অভিশাপ এ নিয়ে ভাবা বা বিতর্ক করা তারই কতগুলো উদাহরণ। আমরা কি আসলে ভাবছি, নাকি আমাদেরকে দিয়ে কেউ ভাবিয়ে নিচ্ছে তা নিয়ে আমাদের ভাবা উচিত। সাম্রাজ্যবাদীদের আধিপত্যকে আমরা আধিপত্য হিসেবে না নিলেও স্ব-ইচ্ছায় তাদের বশ্যতা স্বীকার করছি। এটা কি চিন্তা-প্রতিবন্ধী হওয়ার লক্ষণ নয়?

তবে আশার কথা এই যে, আমাদের এই প্রজন্ম হয়তো কিছুটা ভাবছে। যদিও অনেক দেরি হয়ে গেছে তবুও 'Better late than never' এই প্রবাদটি ধারণ করে স্বাধীনতার এত বছর পরে হলেও আমাদের বর্তমান সরকার শিক্ষাপদ্ধতিতে আমূল পরিবর্তন এনে সাম্রাজ্যবাদের নিকষ অন্ধকার থেকে বের হতে চেষ্টা করছেন। আমাদের নীতিনির্ধারকগণ যদি বুঝতে পারেন যে নিজস্ব সংস্কৃতির জঠর থেকে চেতনার মুক্তিসংগ্রাম শুরু হয় এবং ভাষা ব্যক্তির আত্মপরিচয় ও আত্মবিশ্বাস নির্মাণের জায়গা তবে আমার আধা আশা ও আধা বিশ্বাস যে, আমরা মুক্ত-চিন্তার অধিকারী পরবর্তী প্রজন্ম গড়ে তুলতে পারব।

উঠান

হোসনে আরা জেছমিন
সহকারী অধ্যাপক, বাংলা

১

এত সকালে তার ঘুম ভাঙে না সচরাচর। একটু বেলা করেই ওঠে। বাইরে অঝোর ধারায় বৃষ্টি। সেই সাথে বৃষ্টি ভেজা বাতাস আর বাতাসে মাটির সোঁদা গন্ধ। একটু শীত শীত লাগছে। আলমারি থেকে নেপথলিনের গন্ধমাখা কাঁথাটা বের করে আবারও শুতে গেল নোলক। তখনই পাশে শুয়ে থাকা তিন বছরের রাসা ঘুম জড়ানো চোখে উঠে বসল বিছানায়।

'আপ্পু শিশ.... ।'

নোলক দ্রুত কাঁথাটা একপাশে সরিয়ে পরম মমতায় জড়িয়ে ধরে তুলতুলে ভাইটিকে।

এ বাড়ির যাবতীয় প্রাকৃতিক কার্যের ব্যবস্থাটা সামনের এক চিলতে উঠানের উত্তর পাশে। দরজা খুলতেই বৃষ্টিসমেত দমকা বাতাস হুড়মুড় করে ঘরে ঢোকে। শিহরণে রাসা নোলকের গলা জড়িয়ে ধরে।

সেই কখন বসছে শিশ করতে এখনো বের হওয়ার নাম নেই। নোলক তাড়া দেয়, 'কিরে তোর হলো? কি করছিস বসে বসে?'

রাসা ঠাণ্ডায় কাঁপা কাঁপা স্বরে উত্তর দেয়, 'আপ্পু আক্কা।'

'তা আগে বলবিতো। নে ওঠ, ওখানটায় গিয়ে বস।' নোলক টয়লেটের দরজাটা ভেজিয়ে দিয়ে বাইরে এসে দাঁড়ায়। হাওয়ায় বৃষ্টির ফোঁটা চোখে-মুখে এসে লাগেছে। একটা অজানা উচ্ছ্বাস যেন মুহূর্তেই দেহ বেয়ে মনকে মাতিয়ে দেয়। নোলক মনে মনে ভাবে আজকের সকালটা এত ভাল লাগছে কেন? অথচ বর্ষা তার প্রিয় ঋতু নয়।

বৃষ্টি সহজে তার মনকে টানে না। তাই প্রকৃতির মাঝে বৃষ্টিকে সে মোটেই উপলব্ধি করতে পারে না। কবিগুরু কেন যে বলেছিলেন, 'এমনও দিনে তারে বলা যায়, এমনও ঘনঘোর বরিষায়।'

বৃষ্টি হলেই তার মনে হয় এ যেন প্রকৃতির কান্নার সুর। এ সুর যতক্ষণ ভুলে থাকা যায় ততই ভালো। কিন্তু নোলক আজ বৃষ্টি আর প্রকৃতির মাঝে তন্ময় হয়ে যায়। উঠানের পূর্বকোণে যেখানটায় নারিকেল গাছ দুটো পত্রপল্লবে এতদিন জড়াজড়ি করে স্থির দাঁড়িয়ে ছিল আজ সেকী তার ডানা মেলবার আকাঙ্ক্ষা! উচ্ছ্বাস, সেকী দাপাদাপি! নোলকের মনে হয় প্রতিটি ভোর মানুষকে সম্ভাবনাময় জীবনের নতুন বার্তা এনে দেয়। নব নব রূপে স্বপ্ন দেখায়। তন্ময়তার মাঝে হঠাৎ যেন একটা ক্ষীণ কণ্ঠস্বর দূর থেকে ভেসে আসে,

'আপ্পু পানি।'

নোলক বাস্তবতায় ফিরে আসে। শাড়ির নিচের অংশ ভিজে লেপ্টে গেছে দেহের সঙ্গে। বদনা ভরে পানি নিয়ে যায় সে।

রাসাকে নিয়ে যখন ঘরে আসে তখন দুজনই ভিজে একাকার। রাসার ভেজা চুল মুছে দিতে দিতে নোলক জিজ্ঞেস করে, 'কিরে বৃষ্টিতে ভিজবি?'

রাসা কাঁপা কাঁপা ঠোঁটে উত্তর দেয়, 'শিথ।'

২

সমস্ত আষাঢ় মাস গিয়েছে কাঠফাটা রোদে। বৃষ্টির ছিটে-ফোঁটাও ছিল না। আজ শ্রাবণের প্রথম ঢল। তাই ছুটির এ সকালটা পরিবারের অন্য সদস্যরা নিশ্চিন্ত মনে ঘুমিয়ে কাটাচ্ছে। এরই মধ্যে অবশ্য বাড়ির বড় ছেলে অলক হাতে ব্রাশ নিয়ে বারান্দার ভাঙা বেঞ্চিটাতে পা তুলে বসেছে। যে কেউ প্রথম দেখায় ভাববে সে যেন যোগাসনে বসেছে। টিনের চালে বৃষ্টির তোলপাড় ধ্বনিতেও সেই ধ্যান যেন ছিন্ন হওয়ার নয়। নোলকের ধারণা ভাইয়ার এই মৌনতা জীবন নামক বস্তুটার নেতিবাচক দিক- হতাশা আর বিষণ্নতা না হয়ে পারেই না। বেকার যুবকদের এটাই সম্বল। সবকিছুতেই ধ্যানমগ্ন হওয়া, না হয় ঘুমের রাজ্যে পৃথিবীকে গদ্যময় করে তোলা।

নোলক জানালার পাশে চেয়ারটা টেনে বসে। জানালার পাল্লাটা খুলতেই বাতাস জাপটে ধরে। রাসা চোখ বন্ধ করে টেনে টেনে নিশ্বাস নেয় আর বলে, 'আপ্পু বাতা-ত।'

রাসা রবীন্দ্রনাথের মিনির মতো নয়। কারণ তৃতীয় বর্ষে পা দিয়েও তার স্পষ্ট করে কথা বলবার কোনো লক্ষণই দেখা দেয়নি। অবশ্য তা নিয়ে এই পরিবারের সদস্যদের মাঝে তেমন কোনো মাথাব্যথা আছে বলে মনে হয় না। তাছাড়া শিশুর মুখের আধো আধো বোল শুনতে কার না ভালো লাগে? তাই নোলক যতই বলছে, "বাতাত নয়" 'বাতাস'। বল 'বাতাস'। রাসা ততই চেঁচাচ্ছে, 'বাতাত, বা-থা-ত'।

রাসা তার ভাষায় সুর লাগিয়ে মাথা দুলিয়ে কী সব গাইছে। ভবিষ্যতে এ ছেলে সংগীতজ্ঞ না হয়ে পারেই না। নোলক নিঃশব্দে বারান্দার বেঞ্চিটায় ভাইয়ের পাশে এসে বসে। অলক টুথপেস্টের একগাদা ফেনা মুখে নিয়ে কী একটা বলতে গেল।

নোলক হাত নেড়ে তাকে থামিয়ে দিয়ে বলল,

'দেখ্ ভাইয়া! মুখের এই জঞ্জাল আগে ফেলে আয়।'

'আচ্ছা বাবা ফেলছি ফেলছি।' বলেই অলক পিক করে মুখভর্তি ফেনা ছুঁড়ে ফেলে উঠানে।

'কী বলতে চাচ্ছিলি এবার বল।' নোলক তাড়া দেয়।

'বাবা-মা এখনো উঠছে না কেনরে? সকালে নাস্তা-টাস্তা কিছু হবে না নাকি? খিধেয় পেট চোঁ-চোঁ করছে।'

নোলক বৃষ্টির পানি হাতে নিয়ে মুখে মাখতে মাখতে উত্তর দেয়, 'জানি না। অনেক রাতে ঘরে ফিরেছিস। বাবার বকা খেয়ে রাতের খাবার না খেয়েই শুয়ে পড়েছিস। এখনতো পেট চোঁ-চোঁ করবেই। এ আর নতুন কী!'

'না, মানে বলছিলাম বৃষ্টির এই বিচ্ছিরি শব্দে ঘুম ভেঙে যাওয়ার কথা। কী বলিস?'

'ভাইয়া, পৃথিবীর সব কিছুতেই তুই বিচ্ছিরি জিনিসটা খুঁজে বেড়াস। তোর সমস্যাটা কী'? নোলক প্রশ্ন করে।

'থাক, হয়েছে। তোর সঙ্গে কথায় পারব না। কল চেপে এক বদনা পানি এনে দে।' অলক বিরক্তির স্বরে বলে।

'মুখ ধুতে কলের পানি লাগবে কেন? বৃষ্টির পানি দিয়ে মুখ ধুয়ে নে।' নোলক উত্তর দেয়।

'কী বিচ্ছিরি! বৃষ্টির এই তেতো স্বাদে বমিবমি লাগে। আপু না ভালো, দে না এক বদনা পানি এনে।' অলক এবার আবদারের স্বরে বলে।

নোলক পানি এনে দিয়ে আবারো বেঞ্চিটায় বসে। ঘর থেকে রাসার সংগীত ভেসে আসছে। কী সব আবোলতাবোল গাইছে। আজ এতো ভালো লাগছে কেন তার? নোলক মনে মনে ভাবে, এই যে সামান্য বৃষ্টিভেজা সকাল বেঁচে থাকার আকাঙ্ক্ষাকে সজীব-সতেজ করে দিয়ে গেল এটাই কি কম পাওয়া? কৃষকের মনে আজ যে আনন্দ, নোলকের হৃদয়ে তারই স্পন্দন। অথচ প্রাপ্তির ক্ষেত্র ভিন্ন, একটা ফেটে চৌচির হয়ে যাওয়া ফসলের মাঠ, অন্যটা বিস্তীর্ণ তৃষ্ণার্ত মানবহৃদয়।

নোলক ভাবে, ভেজা কাপড় দ্রুত পাল্টাতে হবে। তা না হলে ঠাণ্ডা লেগে যাবে। বৃষ্টিতে ভিজবে কি না ভাবছে নোলক। আজ সেই ছেলেবেলার মতো বৃষ্টিতে গোসল করতে খুব ইচ্ছে করছে তার। নোলক দ্রুতই সিদ্ধান্ত নিয়ে নেয়, সে ভিজবে। মা বকলে বকুক, কিচ্ছু আসে যায় না। ধীরে ধীরে সে নেমে আসে বাড়ির এক চিলতে উঠানে।

বৃষ্টির বেগ ক্রমশ বাড়ছে। মানুষের আনন্দ কি প্রকৃতির মাঝেও সঞ্চারিত হয়? হয়তো হয়, আর হয় বলেই প্রকৃতির ঘাত-প্রতিঘাত মানুষকে নাড়া দেয়। নোলক গুন গুন করে গেয়ে উঠে, আনন্দ ধারা বহিছে ভুবনে....।

গানের সুরে অলক বেঞ্চি থেকে উঠে দাঁড়ায় 'মনে হচ্ছে খুব আনন্দে আছিস'। অলক ব্যঙ্গাত্মক স্বরে বলল।

'ভাইয়া, জামাটা খুলে নেমে পড়। দেখ এটা বিচ্ছিরি তেতো স্বাদের না।' নোলক চিৎকার করে বলে।

প্রকৃতির মাঝে মিশে থাকা আনন্দ সংক্রামক, যা মানুষকে সহজেই কাছে টানে। তাই বৃষ্টির মাঝে নোলকের অপ্রত্যাশিত উচ্ছ্বাস কাছে টানে অলককেও।

'দাঁড়া এক মিনিট।' বলেই গেঞ্জিটা খুলে নেমে পড়ে উঠানে। মুহূর্তে দুই ভাইবোন প্রকৃতির মাঝে বিলিয়ে দেয় নিজেদের। অলক সারা উঠান গড়িয়ে কাদা করে ফেলে। সমস্ত শরীর কাদায় মাখামাখি। এদের উচ্ছ্বাসের শব্দে রাসা এসে দাঁড়ায় বারান্দায়। ভাঙা ভাঙা শব্দে সে নিজের ভাষায় আনন্দ প্রকাশ করছে, ভাই বিসতি,আপ্পু বিসতি!

অলক হাতছানি দিয়ে ডাকে, 'এই রাসা, ভিজবি আয়'।

রাসা বেঞ্চিটায় জড়োসড়ো হয় বসে মাথা নেড়ে জানিয়ে দেয়, 'শিথ'।

৩

এদের চেঁচামেচিতে ঘুম ভেঙে যায় বাড়ির কর্তা আসিফ ভূঁইয়ার। গায়ে একটা চাদর জড়িয়ে তিনি বারান্দায় এসে দাঁড়ান। বাবাকে দেখতে পেয়ে নোলক চিৎকার করে ডাকে,

'বাবা ও বাবা, দেখ আমরা ছোট হয়ে গেছি'।

আসিফ ভূঁইয়া ধমকে ওঠেন, 'এই সাত সকালে বৃষ্টিতে ভেজা? ঠাণ্ডা লাগবে, জলদি উঠে আয়।'

অলক অনেকটা আবদারের স্বরে বলে, 'বাবা আসো না, তুমিও আমাদের সাথে ভিজবে। বৃষ্টিতে ভিজলে ঠাণ্ডা লাগে না। হুমায়ুন স্যার বলেছেন'।

অলক জানে হুমায়ুন আহমেদ বাবার প্রিয় লেখক। কাজেই বৃষ্টিতে ভেজাটাকে সে বৈধ করে দিল।

আসিফ ভূঁইয়া গলার স্বর কিছুটা নিচু করে বললেন, 'তোর মাথা, উঠে আয় বলছি'।

নোলকও আবদারের সুরে বলে উঠে. 'আস না বাবা, আজ সবাই ভিজি। পরে সবাই মিলে চুলার পাশে বসে গরম গরম চা আর চিড়া ভাজা খাবো'।

আসিফ ভূঁইয়া এক গাল হেসে বললেন, 'দাঁড়া চাদরটা রেখে আসি'।

ষাটোর্ধ্ব এই প্রবীণের চোখে তখন কৈশোরের স্মৃতি। ঘর থেকে ছোট-খাটো একটা দৌড় দিয়ে নেমে পড়লেন হৃদয়ের উঠানে।

এত আনন্দ এ বাড়ির ফাঁক-ফোকরে! এত সুখ নৈসর্গে! এ উপলব্ধি অলকের এতদিন কোথায় ছিল! যখন সে এক হাতে বাবার হাতটা ধরল, অন্য হাতে নোলকের হাতটা স্পর্শ করল তখন অনুভব করল, এইতো পরম আনন্দ। এই ক্ষুদ্র জীবনটাতো এই শেকড়েই বাঁধা। তবে বুকের গহীনে এত কষ্ট কিসের? অজান্তেই দু'ফোঁটা চোখের জল মিশে যায় বৃষ্টির জলে। ভালোবাসাহীন যন্ত্রণাকে আজ যেন বেশি ভালোবাসতে ইচ্ছে করছে তার।

এরই মধ্যে গৃহকর্ত্রী আচঁলে মুখ চেপে দাঁড়ালেন রাসার পাশে। অলকের মনে হল, মাকে আজ অপ্সরার মতো লাগছে। পাশে স্বর্গের কোনো এক দেবশিশু। চারপাশটার কোথাও আজ আর পাপ নেই, বেকার বলে অনুশোচনা নেই, দেশটার প্রতি চাপা ক্ষোভ নেই। টানাপোড়েনের সংসারে ক্লেদাক্ত সম্পর্কের যন্ত্রণা নেই। কেবল আছে এক চিলতে উঠান আর উঠানের ঊর্ধ্বে সীমাহীন আকাশ। সমস্ত দেশটাকে মুহূর্তে মনে হয় বিস্তীর্ণ উঠান আর সেই উঠানে সহস্র মানবসন্তান ভিজছে আনন্দ ধারায়।

নোলক রণেভঙ্গ দিয়ে ধীরে ধীরে এগিয়ে আসে এদিকটায়, যেদিকটায় কাঁঠালচাপা গাছটা ছায়া করে দাঁড়িয়ে আছে। এই গাছটা তার শৈশবে প্রথম কথা বলার সঙ্গী। এর কচি পাতার স্পর্শে প্রকৃতির সাথে প্রথম পরিচয়। উঠানে তখনও অলক বাবার হাত ধরে লাফাচ্ছে আর বারান্দায় লাফাচ্ছে রাসা। নোলক এখান থেকে গাছটার মতোই চেয়ে দেখল স্বর্গের চারণ-ভূমি হৃদয়ের ছোট্ট উঠান।

মাঈনউদ্দীন আহমেদ মাহী
সিনিয়র শিক্ষক (চারু ও কারুকলা)

টেরাকোটার ইতিকথা

মহুয়া-মলুয়া, দেওয়ানা-মদীনা, বীরাঙ্গনা সখিনা তথা 'মৈমনসিংহ গীতিকা'র শহর ময়মনসিংহ। পুরাতন ব্রহ্মপুত্র নদের তীর ঘেঁষে গড়ে ওঠা এ শহরটি শিল্প-সংস্কৃতি ও শিক্ষানগরী হিসেবে খ্যাত।

শহরের প্রাণকেন্দ্রেই অবস্থিত ময়মনসিংহ সেনানিবাস। ময়মনসিংহ সেনানিবাসের অভ্যন্তরেই অবস্থিত ক্যান্টনমেন্ট পাবলিক স্কুল এন্ড কলেজ মোমেনশাহী। এ প্রতিষ্ঠানের প্রবেশ অভিমুখে প্রশাসনিক ভবনের দেয়ালে সম্প্রতি স্থাপিত হয়েছে একটি টেরাকোটা।

টেরাকোটার মূল অংশে রয়েছে একটি শিকড়সহ বৃক্ষ, বৃক্ষের গোড়ায় লিখা 'জ্ঞানই শক্তি'। এখানে ক্যান্টনমেন্ট পাবলিক স্কুল এন্ড কলেজ মোমেনশাহীর লোগোকে একটি জ্ঞানবৃক্ষের সাথে তুলনা করা হয়েছে। চারপাশে কচিপাতা কোমলমতি শিক্ষার্থীদের প্রতীক হিসেবে ব্যবহার করা হয়েছে। লোগোতে উল্লিখিত শান্তি, শৃঙ্খলা, দেশপ্রেম এই মূলমন্ত্রকে বুকে ধারণ করে শিক্ষার্থীদের সুনাগরিক হিসেবে গড়ে তোলা হয়, যা টেরাকোটায় সুনিপুণভাবে ফুটিয়ে তোলা হয়েছে। টেরাকোটার বামপার্শ্বে সবার উপরে বাংলার দুই মহারথী বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ও জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলামের প্রতিকৃতি। নিচে রয়েছে নজরুলের "বিদ্রোহী" কবিতার বিখ্যাত উক্তি "বল বীর, চির উন্নত মমশির"

টেরাকোটায় আরো ফুটিয়ে তোলা হয়েছে আবহমান কাল ধরে বিরাজমান বাংলার নানা ঐতিহ্য। গ্রামবাংলার পিঠা-পুলি বানানো উপলক্ষ্যে দুই রমনীর ধান-চাল গুঁড়া করা। হারিয়ে যাওয়া বাউল, যাদের জন্য বাংলার গানের ভাণ্ডার আজও সমৃদ্ধ। রয়েছে নদীমাতৃক দেশের অন্যতম সংস্কৃতি নৌকা বাইচ।

টেরাকোটার একপাশে সংযোজন করা হয়েছে দেশের জাতীয় বিষয়গুলো। জাতীয় খেলা কাবাডি, জাতীয় পতাকা, জাতীয় পাখি, জাতীয় ফুল, জাতীয় পশু রয়েল বেঙ্গল টাইগার, যে খেলার মাধ্যমে সারা বিশ্বের কাছে বাংলাদেশ আজ সমাদৃত, সেই জনপ্রিয় খেলা ক্রিকেট। রয়েছে রাষ্ট্র ভাষা বাংলার দাবিতে ৫২-র ভাষা আন্দোলন ও শহীদ মিনার।

টেরাকোটার ডানে পাকহানাদার বাহিনীর ভয়ে বাড়িঘর ছেড়ে দেশ পালানো ভীতসন্ত্রস্ত মানুষের ছবি ফুটিয়ে তোলা হয়েছে। যেখানে একটি পরিবারের মা-বাবা ও শিশুসন্তানকে প্রতীক হিসেবে ব্যবহার করা হয়েছে। দেশ গঠনে সশস্ত্র বাহিনীর ট্যাংক, মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণরত কামান হাতে সেনাসদস্য। দেশ গঠনে সেনাবাহিনীর ভূমিকা, বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর মনোগ্রাম, স্মৃতিসৌধ, মুক্তিযুদ্ধে অবদান রাখায় গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক বীরশ্রেষ্ঠ খেতাবপ্রাপ্ত ৭ জন বীর শ্রেষ্ঠর প্রতিকৃতি সর্বডানে ফুটিয়ে তোলা হয়েছে।

মূল টেরাকোটার ডানদিকে উপরে জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এর ৭ মার্চের ভাষণ ডানহাতের তর্জনীর মাধ্যমে তুলে ধরা হয়েছে- "এবারের সংগ্রম স্বাধীনতার সংগ্রাম" বঙ্গবন্ধুর যে ডাকে বাংলার আপামর জনগণ পাক হানাদারদের বিরুদ্ধে জীবন বাজি রেখে ঝাঁপিয়ে পড়ে। যার ফলে আমরা পেয়েছি লাল-সবুজ পতাকা এবং সার্বভৌম স্বাধীন দেশ গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ। পাশেই বঙ্গবন্ধুর সুযোগ্য কন্যা মানানীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার উন্নয়নমূলক কাজের কিছু রেপ্লিকা-বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইট, রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎকেন্দ্র, মেট্রোরেল ও বহুল প্রতীক্ষিত পদ্মাসেতু।

অপরদিকে টেরাকোটার মূল অবকাঠামোতে বামদিকে বাংলা বর্ণমালার বিভিন্ন অক্ষর ব্যবহার করা হয়েছে। অক্ষরগুলো একেঁবেঁকে ১২ফুট উপরে একটি খোলা বইকে স্পর্শ করেছে। যেখানে বইটিতে কোনো অক্ষর নাই। এই হারিয়ে যাওয়া বর্ণমালার জন্যই আমাদের ৫২-র ভাষা আন্দোলন হয়েছিল। আমাদের পূর্বসুরীদের দেখানো পথে সোনার বাংলার সোনার সন্তানদের সুনাগরিক হিসেবে। গড়ে তুলতে ক্যান্টনমেন্ট পাবলিক স্কুল এন্ড কলেজ মোমনশাহী খোলা বইটিতে প্রতীক হিসেবে ব্যবহার করেছে। টেরাকোটার ডানে সর্বনিচে নামফলক করা হয়েছে 'হৃদয়ে বাংলাদেশ'।

টেরাকোটা তৈরির ইতিকথা

একদিন ক্লাস শেষে 'প্রাথমিক-ভবনের' সামনে সহকারী প্রধান শিক্ষক ইলিয়াস স্যার আমাকে জিজ্ঞেস করলেন টেরাকোটা কোথায় কিনতে পাওয়া যায়? বললাম জয়নুল পার্ক, পালপাড়া কিংবা আড়ং শোরুমে পাওয়া যায়। বললেন প্রিন্সিপাল স্যারের বিল্ডিংয়ের পশ্চিম পাশের দেয়ালটায় টেরাকোটা স্থাপন করা

হবে। বললাম এ ধরনের টেরাকোটা অর্ডার দিয়ে করাতে হয়। স্যার বললেন ময়মনসিংহে কেউ টেরাকোটা করেন? বললাম ঢাকায় করে, আপনি যে ডিজাইন দিবেন তাই করে দিবে। কয়দিন পর অধ্যক্ষ স্যারের রুমে ডাকলেন। টেরাকোটা সম্পর্কে জানতে চাইলেন আমার কাজের কোনো ছবি আছে কি না? আমি কিছু ম্যুরালের ছবি দেখালাম স্যারকে, অধ্যক্ষ স্যার ডিজাইন লেআউট করতে বললেন, আমি স্যারের পরামর্শক্রমে একটা লেআউট দাঁড় করালাম। স্যারের অনুপ্রেরণায় ও দিক নির্দেশনায় একাধিকবার নকশা পরিমার্জনের পর পরিচালনা পর্ষদের সম্মানিত সভাপতি মহোদয়ের অনুমতিক্রমে টেরাকোটার কাজ শুরু হয়। টেরাকোটার কাজ শুরু করার আগে আমি লেআউট ও গ্রাফিক্সের সাহায্যে ডিজাইন সম্পন্ন করি।

নামকরণ: টেরাকোটা তত্ত্বাবধানের সময় অধ্যক্ষ লেঃ কর্নেল শামীম আহমেদ, পিএসসি, এএসসি মহোদয় টেরাকোটাটির নামকরণ করেন 'হৃদয়ে বাংলাদেশ'। টেরাকোটাটি সমগ্র বাংলাদেশকে উপস্থাপন করেছে। অধ্যক্ষ মহোদয়ের সার্বিক তত্ত্বাবধানে কাজটি পরিপূর্ণতা পায়।

শিক্ষক শিল্পী মাঈনউদ্দীন আহমেদ মাহী ও তার সহায়ক দলের তিনজন শিল্পী আবীর, বিশাল ও জয় আশীষ এই চার জন শিল্পীর অক্লান্ত পরিশ্রমে কাদামাটি শিল্পে রূপ নেয়। বাংলা বর্ণমালা আঁকাবাকা করে দীর্ঘ ১২ ফুট উপরে শূন্যে বইকে স্পর্শ করে, তা তৈরিতে সার্বিক সহায়তা করেছেন শিক্ষক লিয়াকত আলী খান।

এক নজরে হৃদয়ে বাংলাদেশ

নামকরণ:
হৃদয়ে বাংলাদেশ

প্রস্তাবনা:
লেঃ কর্নেল শামীম আহমেদ, পিএসসি, এএসসি অধ্যক্ষ,
ক্যান্টনমেন্ট পাবলিক স্কুল এন্ড কলেজ মোমেনশাহী

গ্রাফিক্স:
লিয়াকত আলী খান

প্রস্তাবনা ও ডিজাইন অনুমোদন:
ব্রিগেডিয়ার জেনারেল মোঃ হাফিজুর রহমান
কমান্ডার ৭৭ পদাতিক বিগ্রেড, ময়মনসিংহ সেনানিবাস
এবং সভাপতি, পরিচালনা পর্ষদ
ক্যান্টনমেন্টন পাবলিক স্কুল এন্ড কলেজ মোমেনশাহী

শিল্পী:
মাঈনউদ্দীন আহমেদ মাহী, সিনিয়র শিক্ষক (চারুকলা)
মাসুম মুসফিক আবীর, বিশাল, জয় আশীষ (শিল্পী সহায়ক)

রবীন্দ্রকথাঃ প্রথম প্রহর

মাহবুবা নূরুন্নেছা
সিনিয়র শিক্ষক, বাংলা

'বিশ্বকবি', 'কবিগুরু', 'গুরুদেব' -এই রকম আরো কত কী নামে তাঁকে সম্মান করে ডাকা হয়। কিন্তু কোনো বিশেষণই যেন তাঁর জন্য যথেষ্ট নয়। অনন্য প্রতিভাধর রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর জন্মেছিলেন উনবিংশ শতকের শেষ দিকে। সেদিন ছিল বাংলা ১২৬৮ সালের ২৫ শে বৈশাখ, আর ইংরেজি ১৮৬১ সালের ৭ই মে। জন্মের সময় সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ নিজেই বলেছিলেন, "আমি জন্ম নিয়েছিলুম সেকেলে কলকাতায়।" তখন ট্রাম ছিল না, মোটরগাড়িও ছিল না। ছ্যাকড়া গাড়ি ছিল, ঘোড়ায় টানত, আর ধুলো উড়ত রাস্তায়।

প্রিন্স দ্বারকানাথ ঠাকুরের আলোআঁধারে ঘেরা বিরাট প্রাসাদের মধ্যে রবীন্দ্রনাথ জন্মেছিলেন, বড় হচ্ছিলেন। আশ্চর্য ব্যাপার হলো প্রিন্স দ্বারকানাথের পৌত্র হওয়া সত্ত্বেও রাজার হালে মানুষ হননি তিনি। বরং শৈশবে ও বাল্যে যেভাবে তাঁর দিন কেটেছে, তার তুলনায় আমাদের এখনকার ছেলেমেয়েরা রাজপুত্র/ রাজকন্যার হালে দিন কাটাচ্ছে বলতে হয়।

রবীন্দ্রনাথ বড় হবার পর দুঃখ করে লিখেছিলেন, "আমি ছিলুম সংসার পদ্মার বালুচরের দিকে, অনাদরের কূলে..........।" আসলেই যেন তাই। ছেলেবেলায় বাবা-মা, ভাই-বোনদের স্নেহ, আদর-যত্নই আমাদের একমাত্র সম্বল, সবচেয়ে কাম্য; অথচ বালক রবীন্দ্রনাথ তা থেকে অনেকটা বঞ্চিতই ছিলেন বলতে হয়। রুগ্ণ মা, ছেলের খোঁজ-খবরই রাখতে পারতেন না। আর বাবা সর্বদাই বাইরে ঘুরে বেড়ান স্থান থেকে স্থানান্তরে। বাড়িতে আসেন দুদিনের মুসাফির। বয়োজ্যেষ্ঠ ভাই-বোনেরাও যে যার খেয়ালে। চৌদ্দজন ভাই-বোনের মধ্যে সর্বকনিষ্ঠ রবিঠাকুরের জন্য ছিল বাড়ির পুরাতন দাসদাসী আর তিনকড়ি দাই। তাদের পায়ে পায়ে ঘুরে স্নেহ-তিরস্কারে দিন চলে যায় রবি ঠাকুরের। রাতে মশারির ভেতরে শুয়ে ঘুম না আসলে তিনকড়ি দাই রূপকথার গল্প শোনাতেন-'তেপান্তরের মাঠ-জোছনায় ফুল ফুটে রয়েছে। প্রকাণ্ড মাঠ ধু-ধু এপার-ওপার দেখা যায় না। রাজপুত্রের ঘোড়া ছুটছে-খটাখট্, খটাখট্ খটাখট্।'

রূপকথা শোনার এই সুখও ভাগ্যে সইলো না শেষাবধি। পাঁচ-ছয় বছর বয়সেই বালক রবীন্দ্রনাথকে অন্তঃপুর ছেড়ে চলে আসতে হলো বারবাড়িতে। এখানে মানুষ হতে লাগলেন চাকরবাকরদের তত্ত্বাবধানে। চাকরদের বড়কর্তা ছিল ব্রজেশ্বর, আর ছোটকর্তা শ্যাম। ব্রজেশ্বরের বয়স হয়েছিল, গম্ভীর মেজাজ, কড়া গলা, আর কেবল চিবিয়ে চিবিয়ে কথা বলতো। রবীন্দ্রনাথ খেতে বসলেই নানারকম কায়দা করে লুচি-তরকারি, দুধের বাটি সে তার নিজের খাওয়ার জন্য সরিয়ে রাখত। আর ছোটকর্তা শ্যাম, যে তাঁকে বাড়ির বাইরে কখ্খনো বের হতে দিত না। তারা নিজেরা খেয়ে দেয়ে গল্পগুজব করতে বেরুত, আর রবীন্দ্রনাথকে ঠাঁয় বসিয়ে রেখে দিত ঘরে। রবির কোনো আবদারই যেন তাদের কাছে খাটত না। কী আর করা? অগত্যা ভালোমানুষ ছেলেটি জানালার ফাঁক দিয়ে তাকিয়ে থাকত বাইরের পৃথিবীর দিকে।

এরই মধ্যে লেখাপড়ার হাতেখড়ি হয়ে গেল তাঁর। রবীন্দ্রনাথের বয়স যখন ৩ বছর ১০ মাস, তখন দাদা সোমেন্দ্র আর ভাগ্নে সত্যকে রোজ স্কুলে যেতে দেখত। স্কুল থেকে ফিরে এসেই সত্যর সে কী গল্প! ছোট খোকা রবির ভীষণ মন খারাপ হয় আর কান্না পায়। "ইস্কুলে যাব, ইস্কুলে যাব" করে সকলকে অতিষ্ট করে তুললেন। ঘরে যে মাস্টারমশাই পড়াতেন, তিনি একদিন ভয়ানক রেগে গিয়ে ছোট্ট রবিকে ভালো রকমের চড় কষিয়ে বলেছিলেন, 'এখন ইস্কুলে যাবার জন্যে যে রকম কান্নাকাটি করছ, পরে না যাওয়ার জন্য আরো বেশি কাঁদতে হবে।' যাই হোক, কান্নার জোরে ক্যালকাটা ট্রেনিং একাডেমি স্কুলে ভর্তি করে দেওয়া হলো ছোট্ট রবীন্দ্রনাথকে। খুব আনন্দে স্কুলে যাওয়া আরম্ভ করলেন। কিন্তু দিন কয়েক যেতেই তাঁর আক্কেল হলো। যদিও এ স্কুলে তাঁকে বেশিদিন পড়তে হয়নি। এরপর তাঁকে ভর্তি করা হলো নর্মাল স্কুলে। যার পোশাকি নাম ছিল ক্যালকাটা গভর্নমেন্ট পাঠশালা। এখানকার সাহেবি কানুন দেখে অন্য ছেলেরা খুশি হলেও রবীন্দ্রনাথ মোটেও খুশি হতেন না। তবে এ স্কুলে পড়ার সময়ই মাত্র এগারো বছর বয়সে 'মেঘনাদবধ কাব্য' পড়া শেষ করেন।

নর্মাল স্কুলের পর রবীন্দ্রনাথকে ভর্তি করানো হলো বেঙ্গল একাডেমি নামে একটা ফিরিঙ্গি স্কুলে। এখানেও শিক্ষা লাভ

তেমন ফলপ্রসূ হয়নি। রোজই কোনো না কোনো অজুহাতে বাড়ি চলে আসতেন। যাকে বলে কায়দা করে স্কুল পালানো। এমন সময় হঠাৎই একদিন বাবার সাথে হিমালয় যাবার সুযোগ এলো। হিমালয়ে চারমাস কাটিয়ে বাড়ি এসে সে কী গল্প! মা, নতুন বৌদি কাদম্বরী দেবী সবাইকে তাক লাগিয়ে দিতে লাগল। কিন্তু কী মুশকিল! গুরুজনরা আবার স্কুলে যাওয়ার জন্য বকুনি শুরু করলেন। এইবার ভর্তি করা হলো বিদ্যাসাগর হাইস্কুলে। ভর্তি হলেও সেখানে তিনি খুব যে যেতেন তার প্রমাণ তেমন পাওয়া যায়নি। লেখাপড়ার চর্চা বাড়িতেই চলছিল এক গৃহশিক্ষকের তত্ত্বাবধানে। তিনি এসেই বুঝতে পেরেছিলেন এ ছেলে বাঁধাধরা পড়াশুনার মধ্যে যেতেই চায় না। তিনি তাঁকে সংস্কৃত কালিদাসের 'কুমারসম্ভব' ও শেক্সপিয়রের 'ম্যাকবেথ' নাটক পড়াতে লাগলেন এবং লক্ষ্য করলেন রবীন্দ্রনাথ এই দুটো গ্রন্থ আগ্রহসহ পড়লেন তো বটেই অনুবাদসহ মুখস্থ করে ফেললেন। এরই মধ্যে আবারও স্কুল বদল হলো। এবার ভর্তি করা হলো সেন্ট জেভিয়ার্স স্কুলে। গৃহশিক্ষকও বদল হলেন। নতুন আরেকজন এসে সুবিধা করতে পারলেন না। স্কুলে যাওয়ার নাম নেই, পড়াশোনায় মন নেই, কেবল স্কুল কামাই। যার ফল হলো বার্ষিক পরীক্ষায় ফেল।

এরই মধ্যে লেখালেখিতে মন দিয়েছেন বালক রবীন্দ্রনাথ। মাত্র তেরো বছর বয়সে প্রথম কাব্য 'বনফুল' প্রকাশিত হলো 'জ্ঞানাঙ্কুর' পত্রিকায়। এরপর 'ভারতী' পত্রিকায় ছোটগল্প 'ভিখারিণী' এরপর একের পর এক লেখা ছাপানো হতে থাকে 'ভারতী' পত্রিকায়।

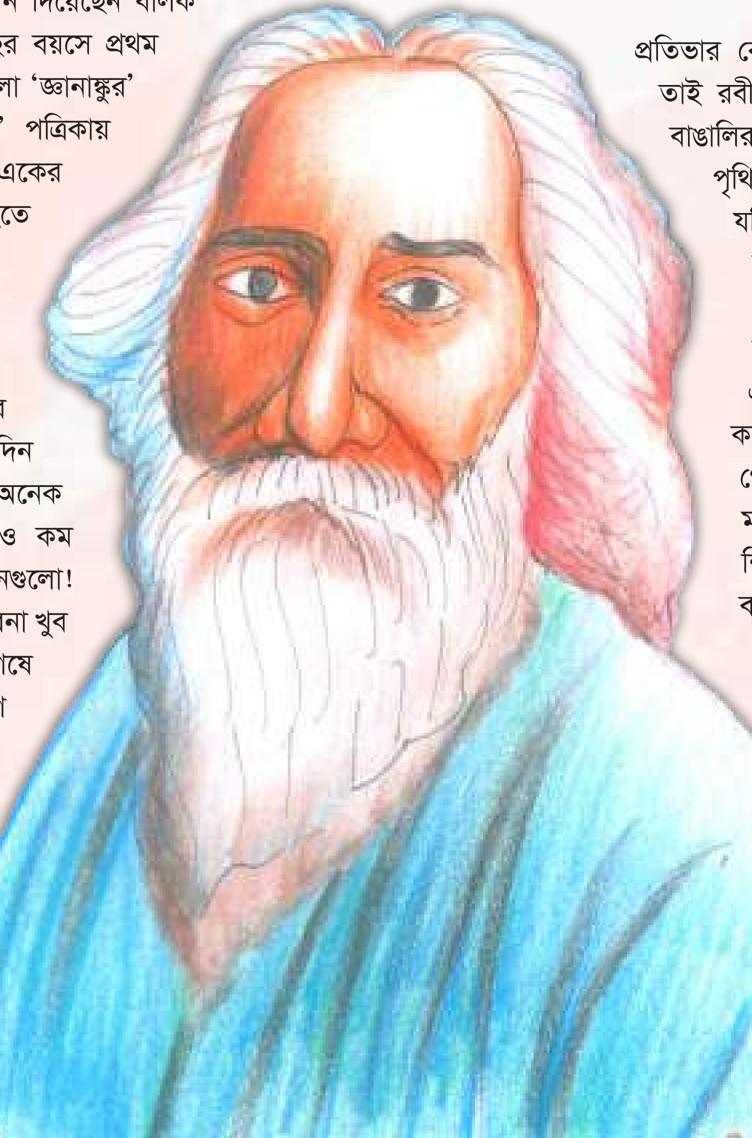

লেখাপড়ার উন্নতির চিন্তা করে মেজদাদার সাথে বিলেতে পাঠানো হলো এবার কবিকে। বিলেতে চমৎকার দিন কাটতে লাগলো কবির। অনেক নতুন বন্ধু জুটেছে, বান্ধবীও কম জোটেনি। কী বর্ণাঢ্য দিনগুলো! কিন্তু লেখাপড়া এগুবার সম্ভাবনা খুব বেশি দেখা গেল না। অবশেষে বাবা মশাইয়ের নির্দেশে দেশে ফিরে এলেন। দেড় বৎসর বিলেতে থেকে কোনো ডিগ্রি না নিয়ে ব্যারিস্টারি না পড়ে ঘরের ছেলে ঘরে ফিরে এলেন একেবারে খালি হাতে।

কিছুকাল পর রবীন্দ্রনাথ নিজেই ঠিক করলেন পুনরায় বিলেত যাবেন এবং ব্যারিস্টারি পড়া শেষ করবেন। নিজেই বাবা মশাইকে ইচ্ছের কথা জানালেন। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর পুত্রের শুভবুদ্ধির ওপর আস্থা রেখে পুনরায় বিলেত যাবার অনুমতি দিলেন। এবার সঙ্গে যাচ্ছে ভাগ্নে সত্যপ্রসাদও। কিন্তু অদৃষ্টের লিখন খণ্ডাবে কে? মাদ্রাজ যাওয়ার পর দুজনেই ফিরে এলেন। ভয়ে মাথা হেঁট করে বাবার সঙ্গে দেখা করতে গেলেন উভয়ে। মহর্ষি বললেন যে, 'ঈশ্বরের মঙ্গল ইচ্ছাই' এর মধ্যে তিনি দেখছেন।

প্রথাসম্মতভাবে বিদ্যাভ্যাস করার এটাই সর্বশেষ প্রচেষ্টা রবীন্দ্রনাথের। কিন্তু লেখালেখি সেই যে শুরু হয়েছিল, তা সারাজীবন আর কখনও থামেনি। আশি বছর বয়সে মৃত্যুশয্যাতে শুয়ে শুয়েও তিনি লিখেছেন, জীবনের শেষ কবিতা-

"তোমার সৃষ্টির পথ রেখেছ আকীর্ণ করি
বিচিত্র ছলনাজালে
হে ছলনাময়ী!" [শেষ লেখা]

প্রতিভার কোনো দেশ-কাল-পাত্র নেই। তাই রবীন্দ্রনাথ শুধু বাংলা ভাষার বা বাঙালির কবি নন, সমগ্র পৃথিবীর কবি। পৃথিবীর কোনো ক্ষুদ্রতম ভূ-খণ্ডে যদি একজন বাঙালিও থাকেন, রবীন্দ্রনাথ তার নিত্যস্মরণীয়। ভাষার যে মহান কারিগর তাঁর জীবনকালে শুধু তাঁর একক চেষ্টাতেই মাতৃভাষাকে কয়েকশ বছর এগিয়ে দিয়ে গেলেন, তাঁকে বিস্মৃত হওয়ার মতো মহাপাপ আর নেই। শিক্ষিত বাঙালির জীবনে এত বড় ভরসাস্থল আর কে আছে!

তথ্যসূত্র ঃ

রবীন্দ্রনাথঃ কিশোর জীবনী

ড. হায়াৎ মামুদ

কোহিনুর

শফিকুল ইসলাম রাফি
শ্রেণি: দ্বাদশ, শাখা: জি, রোল: ৫৭৭

কালের প্রবাহে ইতিহাসে ঘটে গেছে নানা ঘটনা। এসকল ঘটনা, কাহিনী, উপকথা আমাদের ইতিহাসকে করেছে সমৃদ্ধ। বিশ্বের বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন সময়ে নানা বিষয়কে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছে নানা আলোচনা-সমালোচনা, যেগুলো এখনও ইতিহাসের পাতায় মানুষের জীবনাচরণের মধ্য দিয়ে স্মরণীয় হয়ে আছে। কোহিনুর বা ফারসি শব্দ কোহ-ই-নুর এর অর্থ হচ্ছে জ্যোতির পাহাড়। বিশ্বের অন্যতম বৃহৎ ও আলোচিত হীরকখণ্ড কোহিনুর এখন ব্রিটিশ রানিদের মুকুটে শোভা পাচ্ছে। এটি বিভিন্ন রাজা-বাদশাহ শাসকের হাত ঘুরে এখন স্থান পেয়েছে টাওয়ার অফ লন্ডনে। কাঁচের তৈরি কোহিনুর হীরার একটি অনুকৃতি মিউনিখের 'রাইখ দ্য ক্রিস্টাল' যাদুঘরে রক্ষিত আছে। আলোচিত এই হীরকখণ্ডটির বর্তমান ওজন ১০৫.৬ ক্যারেট এবং এটি বর্ণহীন অর্থাৎ শ্বেতশুভ্র। ত্রয়োদশ শতাব্দীতে ভারতের অন্ধ্রপ্রদেশে, গুন্টুর জেলার কোল্লুর খনিতে এই কোহিনুর হীরা পাওয়া যায়। এই হীরার মূল মালিক কাকাতিয়া রাজবংশ (১৯৬৩-১৩২৩) এবং বর্তমান মালিক ব্রিটিশ রাজপরিবার। তখন কোহিনুরের প্রাথমিক ওজন ছিল ৭৯৩ ক্যারেট। কিন্তু ভেনিসের হীরা কর্তনকারী হরটেনসিয়ো জর্জিস অদক্ষতার কারণে কোহিনুর কেটে ছোট করে ফেলেন।

কোহিনুর বহুল আলোচিত হলেও এটি কখনো বিক্রি করা হয়নি। সাম্রাজ্য বদলের সাথে হীরাটিও হাতবদল হয়েছে। ঐতিহাসিকদের তথ্যমতে কোহিনুর প্রথমদিকে মালবের রাজপরিবারের অধিকারে ছিল। তখনো এটি এত আলোচিত হয়নি। মুঘল আমলে এটি মুঘল সাম্রাজ্যের ঐতিহ্যের প্রতীক হয়ে ওঠে। যার কারণে মুঘল শাসকবৃন্দ কোহিনুরের প্রতি বিশেষ যত্নবান হয়ে ওঠেন। এ শাসকদের অধিকারে কোহিনুর ২১৩ বছর ছিল। পরে আফগানদের কাছে ৬৬ বছর ও বৃটেনের অধিকারে ১৩৪ বছর পার করে হীরকখণ্ডটি। কোহিনুর নামটি মুঘলদের দেওয়া। পর্তুগিজ চিকিৎসক ও দার্শনিক গার্সিয়ানা ওরতো এর রচনায় কোহিনুর সম্পর্কে বলা হয়েছে বলে মনে করেন গবেষকরা। তিনি ১৫৬১ সালে প্রকাশিত তাঁর কোলোকুইজ অন দা সিম্পলস এন্ড ড্রাগস অফ ইন্ডিয়া' গ্রন্থে বলেছেন ভারতবর্ষের বৃহত্তম হীরা বিজয়নগরে সংরক্ষিত আছে। ধারণা করা হয় তিনি হয়তো কোহিনুরের কথাই বলেছেন। বাবরনামাতে কোহিনুর সম্পর্কে তথ্য পাওয়া যায়। এ গ্রন্থে বাবর লিখেছিলেন গোয়ালিয়রের রাজা বিক্রমজিতের পরিবারকে গ্রেফতার করার পর তারা হুমায়ুনকে কিছু রত্ন দিয়েছিল। বাবরকে প্রশংসাকারীরা বলেন এই রত্নের মধ্যে থাকা একটি হীরার মূল্য দিয়ে পুরো পৃথিবীর মানুষকে আড়াই দিন খাওয়ানো যাবে। বাবর বর্ণিত এই হীরাটি হলো কোহিনুর হীরা। মুঘল আমলে এটিকে 'বাবরী হীরা' বলা হত। পানিপথের যুদ্ধের পর বাবরকে তাঁর পুত্র হুমায়ুন কোহিনুর হীরা উপহার দেন। বাবর বা হুমায়ুন কেউই এই হীরাকে অলংকার হিসেবে ব্যবহার করেননি। সম্রাট শাহজাহান এসে প্রথমবারের মতো ময়ূর সিংহাসনের অলংকার হিসেবে এটিকে ব্যবহার করেন। পরে পারস্যের নাদির শাহ কোহিনুর লুট করেন। ১৭৪৭ সালে নাদির শাহের মৃত্যুর পর এটি আফগানিস্তানের আমির আহমদ শাহ দুররানির কাছে ছিল।

বহু ঘটনার পর ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি ভারতে অবস্থান করলে কোহিনুর চলে যায় বৃটেনের রানির দরবারে। গবেষকরা স্থান বিবেচনায় কোহিনুরের ভ্রমণপথ চিহ্নিত করেছেন। তাদের

মতে, কোহিনুর বহুদেশে ভ্রমণ করেছে। কোহিনুর খনিতে তৈরি হয় ৫০০০ বছর আগে, গুন্টারে। তারপর ১৩০৪ সালে মালওয়া, ১৩০৬ সালে আরুগালু, ১৩২৩ সালে দিল্লি, ১৩৩৯ সালে সামরখা, ১৫২৬ সালে দিল্লি, ১৭৩৯ সালে পারস্য, ১৮০০ সালে পাঞ্জাব, ১৮৪৯ সালে লাহোর, ১৮৫০ সালে যুক্তরাজ্য এবং বর্তমানে এটি টাওয়ার অফ লন্ডন এ রয়েছে। কোহিনুরের অভিশাপ নিয়ে প্রচুর গল্প বিশ্বব্যাপী প্রচলিত রয়েছে। কোহিনুর হীরাটি যে স্থানেই গিয়েছে সেখানেই সিংহাসনচ্যুতি, রক্তারক্তির ইতিহাস গড়েছে। সম্রাট বাবর থেকে শুরু করে ব্রিটিশ রাজা পর্যন্ত যিনি এই হীরার অধিকারী হয়েছেন, তার জীবনেই নেমে এসেছে করুণ দুর্গতি। কোহিনুরকে ভারত থেকে যুক্তরাজ্যে নেওয়ার সময় কম ভোগান্তি হয়নি ব্রিটিশদের। এই ইতিহাসটি না বললেই নয়। ১৮৫০ সালের ১২ই জানুয়ারি ডালহৌসি কহিনুরকে ব্রিটেনে পাঠানোর নির্দেশ দেন। এপ্রিলে কোহিনুরকে নিয়ে জলপথে রওনা দেওয়া হয়। কোহিনুর নেয়া হচ্ছিল বৃটেনের রানির জাহাজে। তার যাত্রার কদিন পরেই জাহাজে যেন অভিশাপ লাগে। কলেরার মহামারীতে এ সময় ১৩৫ জন ক্রু মারা যান। এ জাহাজটি ঝড়ের কবলেও পড়ে। অনেক বিপত্তি শেষে ৩০ জুন জাহাজটি মাউথ বন্দরে পৌঁছায়। সে সময় থেকেই লেখালেখি শুরু হয় কোহিনুরের অভিশাপ নিয়ে। তবে ৩৩ পার্শ্ব বিশিষ্ট এই হীরার অভিশাপ থেকে অনুকূলে নারীরা। তাইতো রানি এলিজাবেথের কোনো ক্ষতি হয়নি। সবচেয়ে নিখুঁতভাবে কাটা এই হীরার দাম ১০০ মিলিয়ন পাউন্ড বা বারোশো কোটি টাকা। তাই অনেক দেশ এর মালিকানা দাবি করেছে। কিন্তু ব্রিটিশরা কোনো দাবিই গ্রাহ্য করেনি। ব্রিটিশদের মতে অল্পবয়স্ক মহারাজা রনজিত সিং ১৮৪৯ সালে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানিকে হীরাটি উপহার দিয়েছিল। এমন দ্বিধাদ্বন্দ্বের পরিস্থিতিতে তৎকালীন পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী জুলফিকার আলী ভুট্টো যুক্তরাজ্যকে কোহিনুর হীরা ফেরত পাঠাতে বলেন। ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী চিঠির জবাবে লেখেন, কোহিনুর হীরার বিভ্রান্তিকর অতীতের বিপরীতে এর উপর ব্রিটিশ মালিকানা একেবারে পরিষ্কার। অন্যদিকে এর মালিকানা নিয়ে অনেকের দাবি আছে। এমন পরিস্থিতিতে কোহিনুরকে অন্য কোনো দেশের কাছে সমর্পণ এর পরামর্শ দিতে পারি না। এটি এখনো ব্রিটিশদের অংশীদারিত্বে রয়েছে। ওজনের দিক দিয়ে ৯০তম বৃহৎ হীরা কোহিনুরের এমন ইতিহাসই একে অতি মূল্যবান করে রেখেছে।

তথ্যসূত্র: ইন্টারনেট

আমাদের এবেলা ওবেলা

সারাফ ওয়ামিয়া
শ্রেণি: ১০ম, শাখা: ঘ, রোল: ১৬

বয়ঃসন্ধিকাল! সাধারণত ১১-১৫ বছর বয়সের মধ্যে মানুষ যে শারীরিক ও মানসিক পরিবর্তনের মধ্যে দিয়ে যায় তাই বয়ঃসন্ধিকাল। অর্থাৎ আমি এবং আমার সমবয়সীরা এখন যে সময়টা পার করছি। এই সময়টায় করা কাজকর্ম যেমন আমাদের জীবনকে সুন্দর করে তুলতে পারে তেমনি আমাদের জীবনটাকে ধ্বংসও করে দিতে পারে।

ছোটোবেলায় বাবা-মা যা বলতেন আমরা তাই করতাম এবং তাই বিশ্বাস করতাম। কিন্তু এই বয়সে এসে আমরা নিজেরা স্বাধীনভাবে ভাবতে এবং সিদ্ধান্ত নিতে চাই। ভালোমন্দের কনসেপ্ট ততটা পরিপক্ব না হওয়ায় আমরা আমাদের কল্পনা আর বাস্তবকে গুলিয়ে ফেলি এবং নিজেদের নানা অসামাজিক ও অনৈতিক কাজকর্মে জড়িয়ে ফেলি। আবার গুরুজনেরা সতর্ক করলেও তাঁদের কথাও ততটা কানে নিতে চাই না। সবকিছুকে অনেক ইমোশনালি দেখি। অল্পতেই অনেক বেশি কষ্ট পেয়ে ফেলি। আধুনিক মনোবিজ্ঞানে বাবা-মাকেও বলা হয় সন্তানের সিদ্ধান্ত গ্রহণ এবং আচার-আচরণের প্রতি সম্মান দেখাতে। কিন্তু আমাদের অনেক বাবা-মা ভুলে যান তাঁদের সন্তানকে সম্মান দেখাতে। এতে অনেকের সাথেই তাদের বাবা-মায়ের দূরত্বের সৃষ্টি হয়। যার কারণে তারা খুব সহজেই নানা রকমের ভুল করে বসে। আর যখন নিজেদের ভুলগুলো বুঝতে পারে তখন হতাশ হয়। অনেকেই হয়তো ভুলগুলো থেকে শিক্ষা নিয়ে এগিয়ে যায়, কিন্তু অনেকেই সেখানেই আটকে যায়। বাবা-মায়ের চেয়ে বন্ধুদের প্রতি বেশি নির্ভরশীল হয় আবার বন্ধু নির্বাচন সঠিক না হলে অনেকেই বিপথে চলে যায়। আবার অনেকেই হয়তো সেখানেই জীবনটাকে শেষ করে দেয়। কিন্তু ভাবে না জীবন একটাই। কারোর জীবন কখানোই সব সময় সুন্দর থাকে না। সবারই নানা ধরনের কষ্ট থাকে। কিন্তু একদিন কষ্ট আর হতাশার কালো রাত শেষ হয়ে ঝকঝকে নীল আকাশে সূর্য ঝলমলিয়ে উঠে জীবনকে নতুন প্রেরণা দিয়ে বোঝায় জীবন আসলে কতটা সুন্দর। তার জন্য প্রয়োজন ধৈর্য, পরিশ্রম ও আত্মনিয়ন্ত্রণ। এই বয়সে আমাদের অনেক কিছুই করতে ইচ্ছা করে যার সবগুলো আমাদের জন্য সুফল বয়ে আনে না, সেগুলো থেকে নিজেদের সরিয়ে আনতে হবে। সহজভাবে বলা যায়, আমরা আমাদের যে কাজগুলোর কথা বাবা-মাকে বলতে পারব না, বুঝতে হবে সেগুলোই খারাপ কাজ, তখন সেগুলো থেকে নিজেকে সরিয়ে আনতে হবে। নিজেকে নিজেই বিচার করতে হবে যে আমি যেটা করছি সেটা ঠিক কিনা। কারণ আমরা যা কিছু ভালো অর্জন করি, তা যেমন নিজের জন্য, তেমনি যা কিছু খারাপ অর্জন করি তাও নিজের জন্য। এ সময়টাতেই আমরা নিজেদের ক্যারিয়ারের জন্য প্রস্তুতি নিতে থাকি। যারা এই সময়টাকে ঠিকভাবে কাজে লাগাতে পারবে, তারাই জীবনে সফল হবে। তাই স্বপ্ন দেখতে হবে এবং স্বপ্ন পূরণের জন্য প্রচুর পরিশ্রম করতে হবে যেন পরবর্তীতে নিজেকে মানুষ বলে পরিচয় দিতে গর্ববোধ হয়। একটা কথা মাথায় রাখতে হবে,

‘Dream big and work Hard,
because hard work gives
your dreams wings to fly!’

তাহলে যেমন আমাদের এবেলাও সুন্দর হবে তেমনি আগামী বেলাও হবে সুন্দর ও সম্মানের।

হাল ছেড়ো না বন্ধু

আসফিয়া হৃদিতা
শ্রেণি: দ্বাদশ, শাখা: এফ, রোল: ৫৫২

হার না মানা উক্তিসমূহ আপনাকে হার না মানা দুর্জয় মনোভাব গঠনে সাহায্য করবে। একজন হার না মানা মনোভাবের মানুষ সব তুচ্ছ করে সাফল্যের দিকে এগিয়ে যায়। এই মনোভাব গড়ে তোলার জন্য প্রয়োজন দারুণ আত্মবিশ্বাস আর অনুপ্রেরণা। আত্মবিশ্বাস বা লেগে থাকাটাই হলো মূল কথা। তুমি কোনো কিছু অর্জন করতে চাও কিংবা পৌঁছাতে চাও সাফল্যের শিখরে, তবে কাজটির প্রতি আন্তরিক আর সৎ হও। পারবে না, হবে না, হচ্ছে না বলে হাল ছেড়ে দিও না। একবার হাল ছেড়ে দিলে আর হালের হদিস পাওয়া যাবে না। এই দেখো, ঈশ্বরচন্দ্র বাবু যদি হাল ছেড়ে দিতেন তবে কি সতীদাহ প্রথা বন্ধ হতো কিংবা বিধবাদের বিবাহের আইন চালু হতো ! হতো না। আমি অবশ্য ভাল কাজে উৎসাহ দিচ্ছি। খারাপ বা নোংরা কাজের জন্য লেগে থাকা নয়, চাই পরিত্যাগ। তাহলে যদি দেশ আর সমাজে একটু শান্তি আসে।

একজন মানুষের মাঝে যদি হার না-মানা ব্যক্তিত্ব একবার সৃষ্টি হয়, তবে তার কাছে কিছুই অসম্ভব মনে হয় না। বেস্ট সেলিং বইয়ের লেখক টনি রবিন্স এর উক্তি: "একজন মানুষের সাফল্যের পেছনে তার মানসিকতার কৃতিত্ব ৮০ %।" তাহলে বুঝতে পারছো, জীবনে বড় কিছু করার জন্য হার না মানা আত্মবিশ্বাস কতটা প্রয়োজন। তোমার মধ্যে যদি নিজেকে নিয়ে সন্দেহ থাকে, বা নিজের লক্ষ্যটিকে খুব বেশি বড় মনে হয়, তবে মনে রাখবে, যে বিশ্বাস করতে পারে, সে অর্জন করতে পারে। "যারা পৃথিবীকে বদলানোর চিন্তা করার মত পাগল, তারাই আসলে পৃথিবীকে বদলাতে পারে।"

তুমি যদি বিশ্বাস না করো, তবে চেষ্টাও করো না। যদি তোমার বিশ্বাস থাকে যে তুমি এভারেস্ট জয় করতে পারবে, তবেই তুমি প্রথম পদক্ষেপটি নেবে। আর্ল নাইটেঙ্গেলের উক্তি "আসলে পৃথিবীতে সবাই চায় বড় কিছু করতে বা বড় কিছু হতে, কিন্তু বড় কিছু করার মত বিশ্বাস সবার মাঝে থাকে না।" না থাকার কারণ তাদের অনুপ্রেরণার অভাব।

হাজার বার ব্যর্থতার পর এডিসন যদি হাল ছেড়ে দিতেন, আমরা হয়তো অন্ধকারেই থেকে যেতাম। ওই 'আর একবারের' চেষ্টাই তাঁকে সাফল্য এনে দিয়েছিল। 'জীবনে বেশিরভাগ ব্যর্থতায় হাল ছেড়ে দেয়া মানুষ বুঝতেই পারে না, তারা সাফল্যের কত কাছাকাছি ছিল'-এ কথা যিনি বলেছেন, তার নাম এডিসন।

কৃষ্ণাঙ্গ হয়েও ওবামা সফলতার সঙ্গে 'হোয়াইট হাউসে' ৮ বছর কাটিয়েছেন। তিনি কখনও হাল ছাড়েননি। তিনি সবসময় মনে করতেন, 'হ্যাঁ, আমরা পারব।' এটাই জীবনে টিকে থাকার মনোবল। তিনি যদি পারেন, আমিও পারব। প্রয়োজন শুধু আত্মবিশ্বাস, পরিশ্রম, কর্মস্পৃহা আর দৃঢ় মনোভাব। ব্যর্থতা কখনও দুর্বলতা নয়; বরং জয় করার বিষয়।

আর তাই জীবনের কোনো পর্যায়ে হাল ছাড়লে চলবে না। মনে সাহস নিয়ে ভয় কে জয় করতে হবে।

মোবাইল নয়, বই হোক নিত্য সঙ্গী

জাহিন রহমান রাকিন
শ্রেণি: ৭ম, শাখা: গ, রোল: ১৮৯

মনের আনন্দ ও পরিতৃপ্তি লাভে বইয়ের ভূমিকা অনন্য। কেননা, বইয়ের জগতে রয়েছে নানা বিষয় আর বৈচিত্র্য। পাঠক বই পড়ে থাকে তার রুচিমাফিক। বই পড়তে নেই কোনো বিধিনিষেধ। একই বিষয়, কিন্তু তার মধ্যেও রয়েছে বৈচিত্র্য। উপন্যাসের কথা বলি, উপন্যাস তো কেবল সাহিত্য নয়! উপন্যাস থেকে আমরা প্রত্যক্ষভাবে না হলেও পরোক্ষভাবে রাজনীতি, সমাজনীতি, অর্থনীতি, ইতিহাস, সংস্কৃতিসহ নানা বিষয়ে জ্ঞান লাভ করতে পারি। কাব্যের গভীরতা থেকে সংগ্রহ করা যায় জীবনদর্শন। শুধু মানসিক পরিতৃপ্তি নয়, প্রতিনিয়ত বই ডাকছে তার তথ্যসমৃদ্ধ বৈচিত্র্যময় জ্ঞান ভাণ্ডারের দিকে। বই পড়ার মধ্য দিয়ে প্রবেশ করতে পারি বিচিত্র ভাবের জগতে। জীবনকে দারুণভাবে উপভোগ করতে অবাধ সুযোগ বইয়ের মধ্যে। বাংলায় একটা প্রবাদ রয়েছে, 'যতই পড়িবে, ততই শিখিবে।' অর্থাৎ বইয়ের সঙ্গে যার সম্পর্ক যত বেশি, তার জ্ঞানের ভাণ্ডারও তত বেশি সমৃদ্ধ। জীবন ও জগতের সান্নিধ্যে থেকে মানুষ যে অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করেছে তার বিস্তারিত রয়েছে বইয়ের পাতায়। আমাদের মনের ক্ষুধা মেটানো এবং জীবন গঠনের জন্য আবশ্যক উপকরণ হলো বই। মানবজীবন অবলম্বনে যেহেতু বই রচিত হয়, সেহেতু বইয়ের মধ্যে মানুষের জীবনের সবদিকের প্রতিফলন ঘটে। আর জ্ঞানের বিশাল জগতে প্রবেশ করতে চাই বই পড়া। বিচিত্র বিষয় নিয়ে রচিত বিভিন্ন বই আনন্দের অন্যতম উৎস। কেননা মানবজীবনে চিত্তবিনোদনের উপাদান খুঁজে পাওয়া যায় বই থেকে। স্বল্পায়ু জীবনে প্রতিটি মানুষ চায় তার জীবনকে সুখী ও আনন্দময় করে তুলতে। এ চাওয়া এবং তা বাস্তবে রূপদান করার জন্য প্রচেষ্টা চালানো মানবজীবনের সহজাত প্রবৃত্তি। তাই তো মনের ক্ষুধা মেটাতে বই প্রেমিকরা হাতে তুলে নেন বই নামক অকৃপণ বন্ধুকে। বই বন্ধু হিসেবে কৃপণতা করে না বলে অকাতরে বিলিয়ে দেয় তার জ্ঞান। সেই জ্ঞান মানুষের জ্ঞানের জগৎকে করে তোলে সমৃদ্ধ। মানুষ হয়ে ওঠে যোগ্য ও বিনয়ী। এজন্যই মার্কিন সাংবাদিক ও সাহিত্যিক আর্নেস্ট মিলার হেমিংওয়ে বলেছেন, "বইয়ের মতো বিশ্বস্ত বন্ধু আর নেই।" বেশি দিন আগের কথা নয়। দশক দুয়েক আগেও মানুষ তার প্রিয়জনকে উপহার হিসেবে বই দিতেন। লাইব্রেরিতে দেখা যেত পাঠকের উপচে পড়া ভীড়।

কিন্তু দুঃখজনক হলো, লাইব্রেরিগুলোতে নেই সেই আগের মতো ভীড়, পাঠক খরায় ভুগছে। এর অন্যতম কারণ হলো মোবাইলের অপব্যবহার। মোবাইলের অপব্যবহারে দিন দিন কমছে বইয়ের পাঠক সংখ্যা। আগে যেখানে শিক্ষার্থীরা পাঠ্যবইয়ের পাশাপাশি অন্যান্য বইও পড়তেন, এখন সেখানে পাঠ্যবইয়ের সঙ্গে সঙ্গী হচ্ছে মোবাইল। ফলে নতুন বইয়ের গন্ধ আর হাতে নিয়ে বইয়ের পাতা উল্টিয়ে পড়ার মজাটাই যে আলাদা শিক্ষার্থীরা তা উপলব্ধিই করতে পারছে না। যার ফলে তরুণ প্রজন্ম বঞ্চিত হচ্ছে বই পড়ার আনন্দ থেকে। সে যাই হোক, বরেণ্য লেখকদের রচিত বিভিন্ন ধর্মীয় ও জ্ঞান- বিজ্ঞানের মূল্যবান বই দুঃখ, সংশয়, হতাশা, ক্লান্তি, বিবাদ এবং নৈরাজ্য থেকে মুক্তি দেবে। বই হউক সকলের নিত্যসঙ্গী। তাহলেই জীবন হবে অনেক বেশি উপভোগ্য।

আনিকা তাবাসুম অমি
শ্রেণি: দ্বাদশ, শাখা: বি, রোল: ৩১৫

স্বপ্ন কারিগর

জীবনের শুরুটা হয় মা-বাবার হাত ধরেই। এরপর সেই হাতটা ধরেন শিক্ষক। চার থেকে সাড়ে চার বছর থেকেই আমাদের প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা শুরু হয়। এরপর তো সামনের দিকে এগিয়ে চলা। আর এই অবিরত এগিয়ে চলায় প্রত্যেকটি ধাপেই পাশে থাকেন এক বা একাধিক শিক্ষক।

আমার স্কুলজীবনের সূচনালগ্নে আমি একদম স্কুলে যেতাম না। তারপর যখন আমি অষ্টম শ্রেণিতে উঠি তখন প্রথম দুই দিন ক্লাস করেছিলাম। তারপর দিন আর যাইনি, কারণ আমার তো স্কুলে না যাওয়া অসুখ ছিল, প্রথম সপ্তাহ এভাবেই কাটিয়ে দিয়েছিলাম। তারপর হঠাৎ করে আমি স্কুলে সামনের বেঞ্চে বসি এবং মনোযোগ দিয়ে ক্লাস করি। এভাবে আস্তে আস্তে আমি স্কুলের ক্লাস করা শুরু করি। পাশাপাশি পড়াশোনার প্রতি মনোযোগী হতে থাকি। আমার এসব ভালোলাগা দিকগুলোর পেছনে একজন মানুষের অবদান ছিল এবং আছে। সেই মানুষটি এক পলকে আমার চিন্তাভাবনা, ধ্যানধারণা মোট কথা আমার জীবনটাকে পরিবর্তন করে দিয়েছেন। তাঁর প্রভাবে আমার অনেকটা পরিবর্তন হয়। এই মানুষটার প্রভাব আমার জীবনে অভাবনীয়। কারণ আমি আগে ভাবতে পারতাম না যে, আমার দ্বারা কোনোদিন কিছু করা সম্ভব। আমি কোনোকিছু পারি না আর কোনো দিন কোনো কিছু পারবোও না এই ছিল আমার নিজের সম্পর্কে ধারণা। কিন্তু আমার দ্বারা ভালো কিছু করা সম্ভব, আমি চাইলেই পারব এটা আমাকে বুঝিয়েছেন ঐ মানুষটা এবং ঐ মানুষটা হচ্ছেন আমার প্রাণপ্রিয় শিক্ষক মাহফুজা আখন্দ মেম। তিনি শুধু আমার প্রিয় শিক্ষকই নন তিনি আমার মা। মেম এর প্রতি আমার প্রথম থেকেই এক অন্যরকম শ্রদ্ধা ছিল। তিনি যা বলতেন আমি সব কথা মনোযোগ দিয়ে শুনতাম এবং তা অক্ষরে অক্ষরে পালন করতাম। তিনি আমার জীবনে সবচেয়ে বড় প্রেরণা এবং শক্তি। তাঁর সততা, নিষ্ঠা এবং ন্যায়পরায়ণতা দেখে তাঁর প্রতি আমার শ্রদ্ধা আরও বেড়ে যায়। ধীরে ধীরে তাঁর সাথে আমার সম্পর্কটা আরও মধুর হতে থাকে। তিনি আমাদেরকে তাঁর সন্তানের মতো করে সব কিছু শেখাতেন এবং এখনও শেখান। আমাদের সবার জীবনে মায়ের ভূমিকা সবচেয়ে বেশি থাকে এবং আমার জীবনে তাঁর ভূমিকা ঠিক তেমনই। যদি কম নাম্বার পেতাম তাহলে তিনি বলতেন পরবর্তী পরীক্ষায় যেন আরও ভালো করি। সেই কথা পালন করার জন্যই পড়তাম। নিজের জন্য বা জ্ঞান বৃদ্ধির জন্য না। পরীক্ষায় বেশি নাম্বার পেলে মেম খুশি হবেন তাই পড়তাম। তবে যখন পরীক্ষায় ভালো নাম্বার পেতে শুরু করি তখন সবাই অনেক প্রশংসা করতেন, তখন ভালো লাগত। তো এভাবে মেমকে খুশি করার জন্য পড়তে পড়তেই পড়ার প্রতি ভালো লাগা তৈরি হয়। এক পর্যায়ে আমি বুঝতে পারলাম আমার নিজেকে নিয়ে যে ধারণা ছিল তা সম্পূর্ণ ভুল। আমার দ্বারাও ভালো কিছু সম্ভব আমিও পারব। এটা আমাকে মেম প্রতি পদে পদে বুঝিয়েছেন। তিনি সবার থেকে আলাদা। তিনি আমাকে নতুন ভাবে বাঁচতে শিখিয়েছেন এবং সুন্দর জীবন দান করেছেন। জীবনে আমার নিজের প্রতি এক অনন্য বিশ্বাস তৈরি হয়েছে যা আগে ছিল না। তিনি আমাকে জীবনে সকল বাধা-বিপত্তি কাটিয়ে ওঠার উপায় শিখিয়েছেন। তিনি আমার জীবনে সৃষ্ঠিকর্তার তরফ থেকে বিশেষ আশীর্বাদস্বরূপ। অমি এ কথা বিশ্বাস করি যে আল্লাহ অমার প্রতি খুশি হয়ে আমার জীবনে উপহার হিসেবে দিয়েছেন। আমার কাছে তিনি পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ শিক্ষক এবং মা। আমি যদি জীবনে কোনোদিন ভালো কিছু করতে পারি তাহলে যার ভূমিকা সবচেয়ে বেশি থাকবে মেমই হলো সেই মানুষ। আমি তাঁকে আমার জীবনে পেয়ে নিজেকে অনেক ভাগ্যবতী মনে করি। তিনি আমার অনুপ্রেরণার আলোকবর্তিকা, যদিও তাঁর ঋণ শোধ করা কখনোই সম্ভব না তবুও আমি তাঁকে আঁকড়ে ধরে বাঁচতে চাই। মেমকে খুশি করার জন্যেই লেখাপড়া আর এই লেখাপড়াই আমাদের মা-মেয়ের মধ্যে দুরত্ব বাড়িয়ে দিয়েছে। আমি তাঁর কাছ থেকে অনেকটা দূরে চলে এসেছি। তবে যাই হোক তিনি খুশি হলেই আমি সার্থক। আমি যেন একজন ভালো মানুষ হয়ে তার কাছে ফিরে যেতে পারি এটাই আমার প্রত্যাশা। মানুষ গড়ার সকল কারিগরকে জানাই সশ্রদ্ধ সালাম। গুরু-শিষ্যের সকল সম্পর্কগুলো আরও মধুর হয়ে উঠুক এবং অম্লান থাকুক।

বদলে যাও বদলে দাও

রিদোয়ান আহমেদ অনিম
শ্রেণি: দ্বাদশ, শাখা: গ, রোল: ৬৩

রেলস্টেশনে রুবেল বসে আছে আনেকক্ষণ ধরে। কিছুক্ষণ পরেই তার ট্রেন। তার পাশে একটি নয়-দশ বছরের ছেলে বসে চিপস খাচ্ছে। খাওয়া শেষ হলে সে চিপসের প্যাকেটটা নিচে ফেলে দেয়। রুবেল তখন ছেলেটির দিকে তাকিয়ে বলে, 'একটা গল্প শুনবে?'

ছেলেটি বলে বলুন আংকেল কী গল্প?

রুবেল: শোনো তাহলে। রহিম আর করিম দুই বন্ধু। একদিন রহিম কোক খেয়ে ভদ্রতা করে শেষের দিকে একটু রেখে দিয়ে সেটা রাস্তায় ফেলে দিলো। রহিম তার বন্ধু করিমের জন্য অপেক্ষা করছিলো। করিমের আবার ফুটবল খেলার খুব শখ। সে এসে এই কোকের বোতলে একটা লাথি মারলো। ফুটপাথে একজন বৃদ্ধ লোক রাস্তা পার হবার চেষ্টা করছিলো। যেই লোকটি রাস্তায় নামলো, তখনি করিমের শট মারা কোকের বোতলটা লোকটির মাথায় লাগে। বৃদ্ধ লোকটি মাথা ঘুরে পড়ে গেল। এমন সময় অপর পাশে একটা বাইক এসে সামলে নিতে নিতে পড়ে যায়। বৃদ্ধ লোকটি পায়ে খুব ব্যথা পায়। বাইক চালকের মাথায় হেলমেট না থাকায় সেও ব্যথা পেল। পড়ে রইলো দুইজন রাস্তার ফুটপাতের দুই পাশে।

একটা ছোট ঘটনায় কী থেকে কী হয়ে গেল! রহিম যদি কোকের বোতলটা ডাস্টবিনে ফেলতো অথবা করিম যদি লাথি না মেরে ডাস্টবিনে ফেলে দিতো তাহলে এই নির্দোষ দুই মানুষের এই অবস্থা হতো না। এমন ঘটনা প্রতিনিয়তই ঘটে যাচ্ছে আমাদের চারপাশে। আমরা একটু সচেতন থাকলেই আমাদের সমাজকে করা যাবে পরিচ্ছন্ন ও সুন্দর। বুঝলে কিছু?

ছেলেটি কিছু না বলে চিপসের প্যাকেটটা হাতে নিয়ে সামনের ডাস্টবিনে ফেলে আসলো। তারপর রুরেলকে ধন্যবাদ জানালো তাকে ভালো করে জিনিসটা বুঝিয়ে দেওয়ার জন্য। রুবেল বাচ্চাটির মাথায় হাত বুলিয়ে বললো 'গুড বয়।'

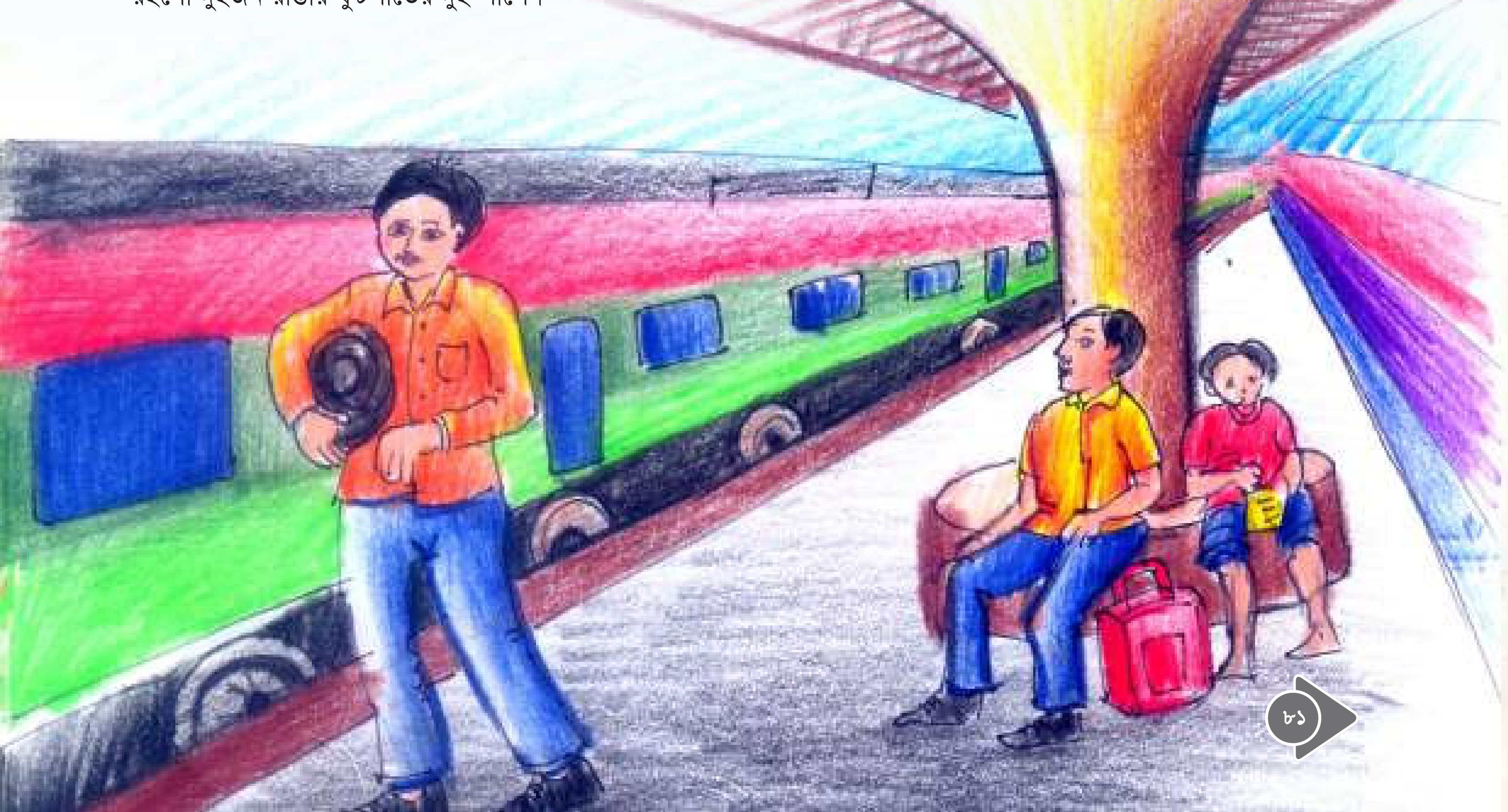

চৌদ্দ ইঞ্চি সাদা-কালো টেলিভিশন

মারুফ হাসান
শ্রেণি: দ্বাদশ, শাখা: জি, রোল: ৬৩৪

বাবা বত্রিশ ইঞ্চি টিভি কিনেছো? তাও এল সি ডি? এ রকম টেলিভিশন তো এখন কেউ দেখেই না। আমার বন্ধু সামিদের আছে ষাট ইঞ্চি স্মার্ট এলইডি টিভি। অর্ণিদের বিয়াল্লিশ ইঞ্চি স্মার্ট টিভি। আর আমাদের এতদিন পর একটা টিভি কিনলে, তাও এরকম পুরোনো মডেলের বত্রিশ ইঞ্চি। ধুর.... বলে মুখ গোমড়া করে সোফার উপর বসে পড়ে রাফি। কোনো রকম আনন্দ-উৎসাহ তো নেইই, বরং যেন সব সম্মান চলে গেল, এমন একটা ভাব।

আট বছরের ছেলের কথা শুনে আলতাফ হোসেন পুরো থ হয়ে গেলেন।

কী বলে ছেলে? ছেলের মা শেফার দিকে তাকিয়ে তার অবাক করা প্রশ্ন।

শেফা অবশ্য অবাক হন না। স্বামী তার একটু ভোলাভালা ভালো মানুষ। যুগের হালচাল তেমন গায়ে মাখেন না। নিজের মত চলেন। কিন্তু তাকে সবদিকে নজর রেখে চলতে হয়। না চলে যে উপায়ও নেই। স্বামীর দিকে তাকিয়ে বোঝানোর

ভাষায় বলেন, নানান ধরনের ডিভাইসের দুনিয়া এখন। বাবা-মা ও সাধ্যমতো সন্তানকে সেরাটা দেয়ার চেষ্টা করছেন। ফলাফল, বাচ্চাদের মাঝেও নিজেকে জাহির করার প্রতিযোগিতা। বেশি বেশি পেলে যা হয় আর কি। ওর আর দোষ কী বলো?

স্ত্রীকে অভয় দেয়া হাসি দিয়ে আলতাফ হোসেন বলেন, ওর দোষ ভাবছি না শেফা। ভাবছি আমার ছেলেবেলার কথা। সাদাকালো চৌদ্দ ইঞ্চি ছোট্ট টিভিটার কথা। জানো এই টিভি আমার পুরো শৈশব রঙিন করে দিয়েছিল।

বাবা গল্প খুব ভালো বলেন। একটা গল্পের সন্ধান পেয়ে রাফি এগিয়ে এসে বাবার পাশে বসে। ডিভাইস পাগল চটপটে ছেলে হয়ে যায় মনোযোগী শ্রোতা। বাবার গা ঘেঁষে আদুরে গলায় বলে, বলো বাবা তোমার ছোট্ট বেলার গল্প বলো।

আলতাফ হোসেন হেসে ছেলের মাথায় হাত বুলিয়ে দিয়ে গল্প শুরু করেন। তার রঙিন শৈশবের গল্প। আমার আব্বা ছিলেন খুব সৌখিন মানুষ। এক কামরার টিনের ঘর তখন আমাদের। গাঁথুনি দেয়া আছে তিনটা রুমের কিন্তু টিন দেয়া হয়নি বলে একটা রুম কেবল ব্যবহারযোগ্য। তখন গ্রামে নতুন কারেন্ট এসেছে। সেই আনন্দে আব্বা টিন কেনার তিন হাজার টাকা দিয়ে কিনে আনলেন একটা পুরোনো সাদাকালো চৌদ্দ ইঞ্চি টিভি।

গ্রামে তখন কারো বাড়িতে টিভি নেই। শুধু আমাদের আছে। সারা গ্রামের মানুষ দল বেঁধে টিভি দেখতে আসত। রাতে আব্বা টিভি দিয়ে দিতেন উঠোনে। তবুও মানুষের জায়গা হত না। তখন ছিল একটা মাত্র চ্যানেল বিটিভি। তাতে আবার শুধু সপ্তাহে দুদিন রাতে নাটক হত, আর মাসে একটা বাংলা সিনেমা বিকেলে। তাই মানুষ দিন গুণে গুণে দেখতে আসত। মাঝেমধ্যে বাড়ি থেকে লোকজন মুড়ি-মুড়কি নিয়ে আসতো। উঠোনে বসে খাওয়া আর টিভি দেখা। আহ! কী আনন্দ।

আমি তখনও স্কুলে ভর্তি হইনি। মানে বেশ ছোটো। কিন্তু ঐ টিভির কারণে আমাকে সবাই চিনত গ্রামে। সে এক মজার জীবন। এর মধ্যে আবার বিভিন্ন গ্রামের আত্মীয় বাড়ি থেকে দাওয়াত আসত টিভি দেখানোর। তখন আমার আব্বা-মা আর আমি গরুর গাড়িতে করে ব্যাটারিসহ টিভি নিয়ে যেতাম দেখাতে। কী হচ্ছে সেটা বড় কথা না। টিভি চলছে, সবাই দেখতে পারছে এটাই বড় কথা।

একটু থেমে উনি আবার বলতে শুরু করলেন, খুব বেশি দিন আগের কথা তো না। নব্বই দশকের প্রথম দিকের ঘটনা। তখন তো মানুষের মাঝে এত প্রতিযোগিতা দেখিনি। প্রযুক্তির উন্নতি হয়েছে ভালো কথা। তার সাথে উচিত ছিল মানুষের নিজেরও উন্নতি করা। তা কিন্তু হয় নি। পরিবার, সমাজ, এমনকি দেশের কাছেও পুরো আত্মকেন্দ্রিক হয়ে উঠছে মানুষ। প্রযুক্তি যখন গ্লোবালাইজেশনের কথা বলছে, আমরা তখন সমষ্টি থেকে এককে পরিণত হচ্ছি। আর এই একককে বড় করতে গিয়ে এটা কেন আমার না, ওটা যদি ওর হয় তো, আমার লাগবে ওর থেকেও বড়। এর মধ্যে কি আসলেই ভালো কিছু আছে বলো তো শেফা? আমি তো কিছু দেখিনা।

শেফা কোনো কথা খুঁজে পান না। আসলেই তো তাই। কেমন যেন হয়ে যাচ্ছে চারপাশের সবকিছু। বড় বেশি আত্মকেন্দ্রিক। একটা দীর্ঘশ্বাস বের হয় মনের অজান্তেই।

রাফি এত জটিল কথা বুঝতে পারার কথা না। সবাইকে চুপ দেখে নিজে নিজেই বলে উঠলো, বাবা, তবে তুমি আমাকে চৌদ্দ ইঞ্চি সাদাকালো টিভিই এনে দাও।

আলতাফ হোসেন বিষণ্ন হাসি হাসেন। সাদাকালো টিভি হারিয়ে গেছে, সেই সাথে হারিয়ে গেছে মানুষের সাদামাটা রঙিন জীবন। তাকে ফেরানো কঠিন, বড় কঠিন।

আমাদের বাড়ি

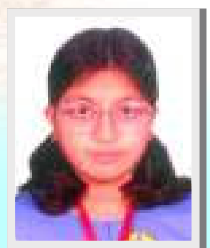

রিফাহ তাসনিয়া লাবিবা
শ্রেণি: ৮ম, শাখা: খ, রোল: ৭৭

ঘড়িতে তখন সন্ধ্যা ৭টা ৩৫ মিনিট। কবরস্থানে বসে আছি আমি। উঠে দাঁড়ানোর শক্তিটুকু শরীরে নেই। আশেপাশে অনেক চিৎকার কান্নাকাটি। তার মধ্যেও আমাকে নিয়ে টানাটানি করছে অনেকে, এখান থেকে ওঠার জন্য। বারবার বলছে বাড়ি যাওয়ার জন্য। কেন বলছে তা আমি বুঝতে পারছি না। আমি তো বাবার পাশেই বসে আছি। নতুন একটা বাসা পেয়েছে বাবা। ওই যে বাবার নাম লেখা। শুধু বাবার নামের আগে বসানো হয়েছে মরহুম শব্দটি। বাসাটা অনেক ছোট। তারপরও নিজের বাসা বলে কথা। বাবা কিছুক্ষণ পরেই দরজা খুলবে। সবাই এত ব্যস্ত হচ্ছে কেন?

এই তো কাল সকালবেলা বলেছিল --

- নাহিদ, বাবা ওঠ।

- বাবা আর একটু, প্লিজ।

- আরও ঘুমুতে চাচ্ছিস। তুই দুপুরের খাবার খাবি, না সকালের নাস্তা?

- আচ্ছা, উঠছি।

ঘুম থেকে উঠেই দরজা খোলা মাত্রই অনেক বেলুন, কেক আরও কত কী! ঠিক বুঝতে পারলাম না।

- হ্যাপি বার্থডে

- আমি ভুলে গেলেও বাবা কিন্তু দিনটি ভোলেননি।

অনুষ্ঠান শেষে বাবা বললেন, আজ আমরা পুরো ঢাকা ঘুরে বেড়াব।

দুপুর নাগাদ খাওয়া দাওয়া সেরে আমি, মা, বাবা আর ছোট ভাই শাহীন বেরিয়ে পড়লাম। চিড়িয়াখানা ঘুরলাম। একসাথে চারজন হাত ধরে হাঁটলাম। ভালোই কাটছিল সময়টা। কিন্তু হঠাৎ করেই বাবার বুকে ব্যথা ওঠে। বাবা হার্টের রোগী। সময়ের ঔষধ সময়ে নেয়া প্রয়োজন তাঁর। কিন্তু তাড়াহুড়ার জন্য ওষুধ আনার কথা মনেই ছিল না।

- বাবা তোমার ঔষধ তো আনা হলো না।

- থাক ওতে কিছু হবে না।

- না, চলো পাশের ফার্মেসি থেকে কিনে নেই।

- আহ, এখন থাক ওসব।

- কিন্তু তোমার ব্যথা?

- তোরা আছিস। কেউ আমার কিচ্ছু করতে পারবে না। হাহাহা..........

বাবার হাসিই বলে দিচ্ছিল যে বাবার কিছু হবে না। কিন্তু জাতীয় স্মৃতিসৌধের কাছাকাছি আসতেই বাবার বুকের ব্যথা হঠাৎ বেড়ে যায়। বাবাকে ধরাধরি করে আশেপাশের লোকজন হাসপাতালে নিয়ে যায়। তারপর আর কিছু জানিনা। আমি কী করছিলাম সেটাও মনে নেই। শুধু মনে আছে, আজ সকালে সাদা কাপড় পরে এসেছে বাবা। কিন্তু বাবা তো নীল রং পছন্দ করে। তাহলে বাবা কেনো এখন এমন করে আসবে? কাউকে জিজ্ঞেস করলে কেউ কিছুই বলছে না। মা জ্ঞান হারাচ্ছে। আমি দৌড়ে গিয়ে বাবার হাত ধরলাম। বরফের মতো ঠাণ্ডা বাবার হাত। বাবার হাত তো কখনো এত ঠাণ্ডা থাকে না। তবে এখন কেনো এত ঠাণ্ডা? আমি কিছুই বুঝতে পারছি না। বাবাকে যে গাড়িতে তোলা হলো আমিও সে গাড়িতে তাড়াহুড়া করে উঠে পড়লাম। সবাই আমাকে নামাতে চেয়েছিল। আমি নামিনি।

আমার বাবা এখানে আমি কেনো নামবো?

তারপর কিছু মনে নেই। হঠাৎ চোখ খুলে দেখি বাবাকে ছোট ঘরটায় শুইয়ে দেয়া হলো। তারপর মাটি দিয়ে দরজা দেওয়া হলো ঘরটায়। আমি ছুটে গেলাম। আশ্চর্য! বাবা বের হবে কিভাবে? এজন্যই তো আমি বসে আছি। বাবা ডাকলেই আমি মাটি খুঁড়বো। এত সহজ বিষয়টা ওরা কেনো বুঝতে পারছে না! শুধু শুধু আমাকে নিয়ে বাড়ি যেতে চাইছে। কিন্তু বাবা কেনো ডাকছে না? আমার আর ভালো লাগছে না। মাথাটা কেমন ঘুরছে। বাবা আমার অসুখ একেবারে সহ্য করতে পারে না। যেখানেই থাকুক দৌড়ে চলে আসে। তবে এখন কেনো আসছে না? বাবার এখন কী হলো। ঘুমে তো চোখ বন্ধ হয়ে এলো। না, জেগে থাকতে হবে। কিন্তু আমার অনেক বেশি ঘুম পাচ্ছে। অনেক অনেক বেশি।

- বাবা,বাবা?
- এই তো বাবা, এখানে।
- কোথায় ছিলে এতক্ষণ?
- এইতো আমাদের বাড়িতে
- এইটা আমাদের বাড়ি?
- হ্যা।
- মা কোথায়, শাহীন কোথায়?
- ওরা আসবে ওদের সময় হলে।
- আমি আর তুমি এখন থেকে একসাথে থাকবো?
- হ্যা
- কী মজা বাবা!
- হুম, অনেক মজা।
- বাবা আমি তোমাকে অনেক ভালবাসি।
- আমিও তোকে অনেক ভালোবাসি।

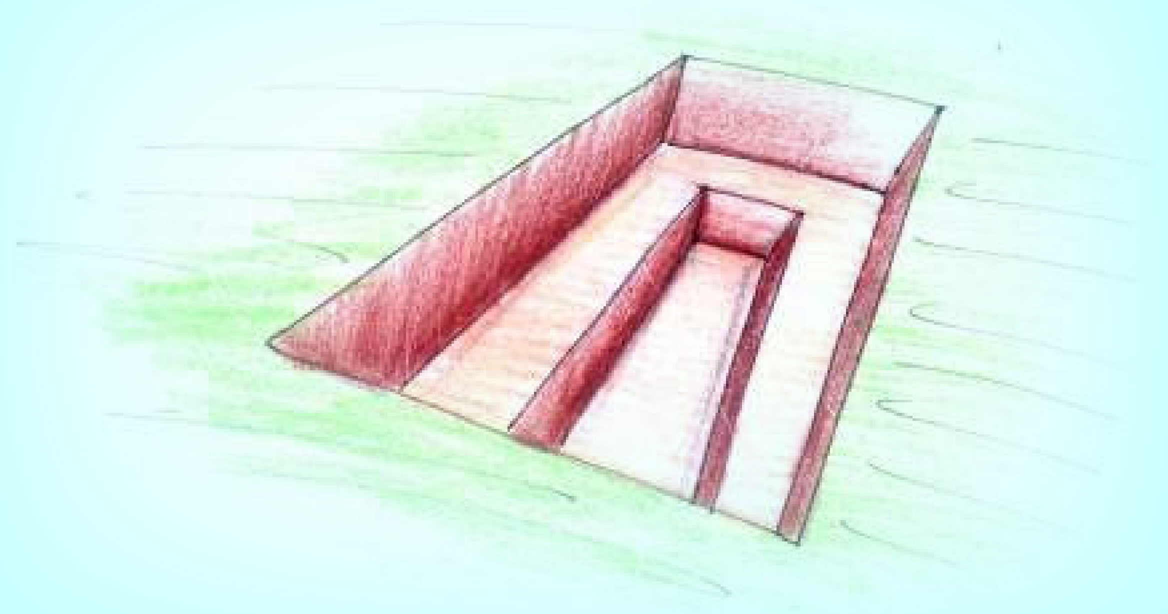

ডিপ্রেশন বা বিষণ্নতা

শাকিবুল ইসলাম রাফি
শ্রেণি: দ্বাদশ, শাখা: জি, রোল: ৫৭৭

'ডিপ্রেশন' এই শব্দটি একই সাথে পরিচিত আবার প্রচলিতও বটে। বর্তমান সময়ের মানসিক এই ব্যাধি ধীরে ধীরে মন থেকে বিস্তার লাভ করে, যার প্রভাব আমাদের কাজের ওপরও পড়ছে। যত দিন যাচ্ছে মানুষের মুখে ডিপ্রেশনে থাকার অভিজ্ঞতার কথা তত বেশি শুনতে পাচ্ছি।

ডিপ্রেশনকে বলা হয় আধুনিক সময়ের অসুখ। এক সমীক্ষায় দেখা গেছে বর্তমানে যাদের বয়স ৬৫ বছরের উপরে, তাদের মাঝে ডিপ্রেশনের হার মাত্র ১০%। অপরদিকে যাদের বয়স ৪৫ এর উপরে তাদের মাঝে এই হার বৃদ্ধি পেয়েছে দ্বিগুণ হারে, ২০%। এবং যাদের বয়স ১৫-৩৫ এর উপরে এদের ডিপ্রেশনের হার ৫০%! বিজ্ঞানীদের মতে এই অবস্থা অত্যন্ত ঝুঁকিপূর্ণ।

বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা (WHO)-এর দেওয়া গাইডলাইন অনুযায়ী ডিপ্রেশনকে যে কটি বিষয় দ্বারা চিহ্নিত করা হয়েছে সেগুলো হলো- দুঃখ, আগ্রহ বা আনন্দ হারিয়ে ফেলা, অপরাধবোধ, নিজেকে মূল্যহীন লাগা, ঘুম ও ক্ষুধায় বিরক্তি, ক্লান্তি, দুর্বল মনোযোগ। হ্যাঁ এইরকম অনেক মানুষ পাবেন আপনার আমার বন্ধু বা পরিচিত, যারা প্রতিনিয়ত ডিপ্রেশন বা মুড অফ নামের রোগে ভুগছে, কিন্তু আমাদের তাতে কী আসে যায়, আমরা তো ভাল আছি! আমাদের তো প্রিয় মানুষ আছে, আমাদের তো বেস্টফ্রেন্ড আছে! অথচ যে মানুষটা ডিপ্রেশন বা মুড অফ নামক রোগে ভুগছে সে মানুষটাই জানে এই রোগটা কতটা ভয়ংকর, কতটা ভয়াবহ! আত্মহত্যা করতেও তারা দ্বিধাবোধ করে না। কেউ হয়তো ফিউচার নিয়ে, কেউ ফ্যামিলি নিয়ে, কেউ মনের মানুষ নিয়ে, আবার কেউ নিজের বেস্টফ্রেন্ডকে নিয়ে ডিপ্রেশনে আছে। একজন ডিপ্রেশনে ভুগতে থাকা মানুষই ভালো করে জানেন সকলের সামনে নিজকে হাসিখুশি প্রমাণ করাটা ঠিক কতটা কষ্টের।

ডিপ্রেশন থেকে মুক্তির উপায় :

আপনি কেন বিষন্নতায় ভুগছেন সেই কারণটি খুঁজে বের করুন। ভালবাসাহীনতা? আপনি ভালবাসা খুঁজুন এমন মানুষের কাছে যে আপনাকে প্রত্যাখ্যান করবে না। আপনার মা হতে পারে, বন্ধু হতে পারে, নতুন কেউ আপনাকে ভালবাসতে পারে। তবে পরিবার হতাশার সবচেয়ে বড় উপশমকারী বলে আমি মনে করি। আর মা-যেমনই হোক, তাঁর চেয়ে বিশ্বস্ত বন্ধু কেউ নেই। আর আপনার যদি পছন্দের কোনো মানুষের সাথে সময় কাটাতে পারেন, যার সাথে মন খুলে সে কথা বলতে পাবেন, যে তার মনের যত্ন নিতে জানে, যে আপনাকে বুঝতে পারে এরকম ভালো সঙ্গ পেলে ডিপ্রেশন সহজে দূর হয়।

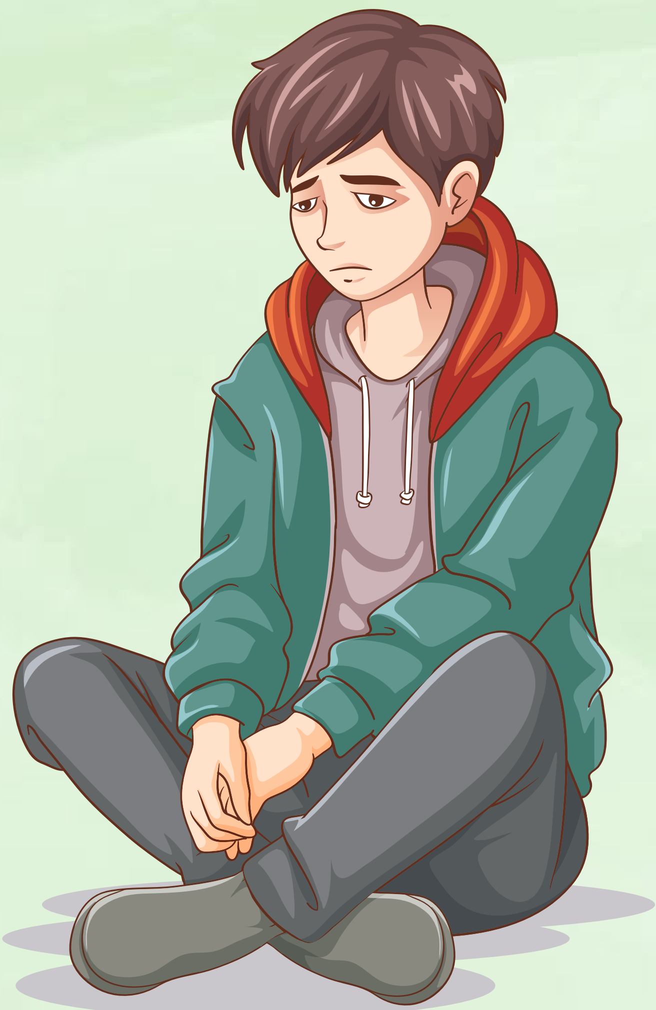

পদার্থ বিজ্ঞানে নোবেল

তাবাসসুম বিনতে আলম
শ্রেনি: ৮ম, শাখা: ক, রোল: ২৫০

আলফ্রেড নোবেল ১৮৩৩ সালের ২১ অক্টোবর সুইডেনের স্টকহোমে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি একজন রসায়নবিদ, প্রকৌশলী এবং উদ্ভাবক ছিলেন। বিশেষ করে ডিনামাইটের আবিষ্কারক হিসেবে স্বীকৃতি প্রাপ্ত।

বিশ্বব্যাপী মর্যাদাপূর্ণ পুরস্কার-নোবেল পুরস্কার যা ছয়টি ভিন্ন ভিন্ন ক্ষেত্রে আলাদাভাবে দেওয়া হয়। মূলত: পুরস্কারটি পদার্থবিদ্যা, রসায়নবিদ্যা, শারীরবিদ্যা বা মেডিসিন, সাহিত্য এবং শান্তির ক্ষেত্রে প্রদান করা হয়। নোবেল পুরস্কারে ভূষিত ব্যক্তি বা সংস্থাকে নোবেল পুরস্কার বিজয়ী বলা হয়। সুইডিশ বিজ্ঞানী আলফ্রেড নোবেলের নামানুসারে ১৯০১ সাল থেকে এই পুরস্কার প্রবর্তিত হয়। প্রতিবছর ডিসেম্বর মাসে ১০ তারিখে সুইডেনের স্টকহোম থেকে এই পুরস্কার দেয়া হয়। সাধারণত বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে রয়েল সুইডিশ একাডেমি, চিকিৎসার ক্ষেত্রে ক্যারোলিনস্কা ইনস্টিটিউট, সাহিত্যের ক্ষেত্রে সুইডিশ একাডেমি, শান্তির ক্ষেত্রে নরওয়েজিয়ান নোবেল কমিটি, অর্থনীতিতে সেভরিক রিক্স ব্যাংক এই পুরস্কার প্রদান করে থাকে। এখন পর্যন্ত ৯৭৫ জন ব্যক্তিকে পুরস্কারে ভূষিত করা হয়েছে। প্রতি নোবেল বিজয়ীকে ১৮ ক্যারেটের স্বর্ণপদক ও ১০ মিলিয়ন সুইডিশ ক্রোনার দিয়ে পুরস্কৃত করা হয়। ২০২২ সালে বিজ্ঞানে বিশেষ করে পদার্থবিজ্ঞানে নোবেল বিজয়ী তিনজন বিজ্ঞানী হলেন আমেরিকার জন ক্লোজার, ফ্রান্সের অ্যালেন অ্যাসপেক্ট এবং অস্ট্রেলিয়ার অ্যাটন জেলিঙ্গার। রসায়ন বিজ্ঞানে নোবেল পেয়েছেন আমেরিকার ক্যারোলিন আর বার্তোজি, কার্ল ব্যারি সার্পলেশ এবং ডেনমার্কের মর্টেন মেন্ডল।

নোবেল বিজয়ী ৯৭৫ জনের মধ্যে প্রথম বাঙালি হিসাবে নোবেল পুরস্কার লাভ করেন বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, ১৯১৩ সালে সাহিত্যে। পরবর্তীতে ১৯৯৮ সালে অমর্ত্য সেন অর্থনীতিতে এবং ২০০৬ সালে ড. মুহাম্মদ ইউনুস শান্তিতে এই পুরস্কার লাভ করেন। ২০১৯ সালে পুনরায় অর্থনীতিতে নোবেল পান অভিজিৎ বন্দোপাধ্যায়। ফোটন নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা বেল অসমতা এবং অগ্রণী কোয়ান্টাম তথ্য বিজ্ঞানের লঙ্ঘন প্রতিষ্ঠা করার জন্য ২০২২ সালে এই তিন বিজ্ঞানীকে নোবেল পুরস্কারে পুরস্কৃত করা হয়। যখন দুইটি কণা বিপরীত স্পিনে থাকে এবং পরস্পর মিথস্ক্রিয়া ঘটায় তখন এদেরকে কোয়ান্টাম এন্টাঙ্গেলমেন্ট বলে। এক্ষেত্রে একটি কণার স্পিন up হলে অপর স্পিনটি down হবে। কোয়ান্টাম পদার্থবিজ্ঞান মানুষকে যে সম্ভাবনার স্বপ্ন দেখাচ্ছে তা কখনোই চিরায়ত পদার্থ বিজ্ঞানের মাধ্যমে পূরণ হবে না। এক্ষেত্রে এটাকে এন্টাঙ্গেলমেন্ট বিষয়ক গবেষণা কোয়ান্টাম কম্পিউটেশন এবং কমিউনিকেশনের ভিত্তিস্বরূপ। এর ফলে ভবিষ্যতের কম্পিউটার গুলো হবে এখনকার সুপার কম্পিউটারের চেয়েও অচিন্তনীয় শক্তিশালী এবং দ্রুতগতির। যে হিসেব সম্পন্ন করতে ১০ হাজার বছর লেগে যাবে, এখনকার সুপার কম্পিউটারকে সেটি কোয়ান্টাম কম্পিউটার করে ফেলবে কয়েক মিনিটেই। ২০২২ সালের নোবেল পুরস্কার ঘোষণার মধ্য দিয়ে পদার্থবিজ্ঞানে এখন পর্যন্ত ২২১ জন বিজ্ঞানী নোবেল পুরস্কার জিতে নিলেন। ঠিক এক শতাব্দী আগে ১৯২২ সালে কোয়ান্টাম পদার্থবিজ্ঞানের অন্যতম প্রধান সারথী নীলস বোর পেয়েছিলেন পদার্থ বিদ্যায় নোবেল পুরস্কার। বিজ্ঞানীদের অবিরত উদ্ভাবন, বিকাশ এবং অগ্রযাত্রায় কোয়ান্টাম পদার্থবিজ্ঞানের জয় চলছেই।

নারীশিক্ষায় বেগম রোকেয়া

রুবাইয়া হাসান লামহা
শ্রেণি: ৮ম, শাখা: ক, রোল: ০৩

বাঙালি মুসলমান নারীর শিক্ষাবিস্তার সাধনার নিরলস তাপসকর্মী, অধিকার সচেতন, নারীমুক্তি আন্দোলনের অগ্রদূত এবং মুক্ত চিন্তায় উদ্বুদ্ধ সাহিত্যসেবী বেগম রোকেয়ার পরিচিতি সুবিদিত। ভারত উপমহাদেশের প্রেক্ষাপটে নারীশিক্ষার প্রয়োজনীয়তা গভীরভাবে উপলব্ধি করেন বেগম রোকেয়া। এই মহীয়সী নারী রংপুর জেলার পায়রাবন্দ গ্রামে এক রক্ষণশীল ও সম্ভ্রান্ত জমিদার পরিবারে ১৮৮০ সালের ৯ই ডিসেম্বর জন্ম গ্রহণ করেন। তখনকার দিনে বাঙালি মুসলমান সমাজে মেয়েদের আধুনিক শিক্ষার সুযোগ ছিল না। ফলে বেগম রোকেয়ার জীবনে কোনো প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার সুযোগ ঘটেনি।

ছোটবেলায়ই তাঁর মধ্যে চার দেয়ালের গণ্ডি পেরিয়ে মুক্ত পরিবেশে শিক্ষা লাভের অদম্য আকাঙ্ক্ষা জন্মায়। বড় ভাই ও বোনের সহযোগিতায় এবং নিজস্ব চেষ্টায় তিনি একজন শিক্ষিত আদর্শবাদী মানুষ হয়ে গড়ে ওঠেন। নারীকে শিক্ষার মাধ্যমে বিকশিত করে আর্থিকভাবে সাবলম্বী করার মাধ্যমে নারী-পুরুষ সাম্যের এক সমাজ প্রতিষ্ঠাই ছিল বেগম রোকেয়ার লক্ষ্য।

নিজ জীবনের অভিজ্ঞতা থেকে অনুধাবন করতে পারেন সমাজে নারীরা কতটা নিগৃহীত। তাই মেয়েদের মানবিক ও প্রকৃত যোগ্যতাসম্পন্ন করে গড়ে তোলার লক্ষ্যে তিনি শিক্ষাকে মাধ্যম হিসেবে বেছে নেন। অভাবনীয় আর্থিক অসুবিধা, সামাজিক বাধাকে মোকাবেলা করেই তাঁর বিদ্যালয়ের যাত্রা শুরু হয়। শত প্রতিকূলতার মাঝেও মানব হিতৈষীর সহযোগিতায় তার প্রতিষ্ঠিত স্কুল ক্রমে শক্তি লাভ করে। নারীদের অবস্থার উন্নতির জন্য তিনি ১৯০৯ সালে ভাগলপুরে মাত্র পাঁচ জন ছাত্রী নিয়ে 'সাখাওয়াত হোসেন মেমোরিয়াল বালিকা বিদ্যালয়' প্রতিষ্ঠা করেন। কিন্তু চক্রান্তের শিকার হয়ে তিনি সামাজিকভাবে নিন্দিত হন। হতাশা, অনিশ্চয়তা ও ভারাক্রান্ত মন নিয়ে তিনি ১৯১১ সালে স্কুলটি কোলকাতায় স্থানান্তর করেন। শুরুতে ছাত্রী সংখ্যা ছিল আট জন। ধীরে ধীরে ছাত্রীর সংখ্যা বাড়তে থাকে।

রোকেয়া বাঙালি মুসলমান মেয়েদের শিক্ষিত করার জন্য শুধু স্কুলই প্রতিষ্ঠিত করেননি, ঘরে ঘরে গিয়ে মেয়েদের স্কুলে পাঠানোর জন্য বাবা-মায়ের কাছে আবেদন-নিবেদন করেছেন। এই কাজে তিনি ছিলেন একজন নিরলস পরিশ্রমী কর্মী। তাঁর অক্লান্ত চেষ্টার ফলে নারীশিক্ষার অগ্রগতি সূচিত হয়। মেয়েরা ধীরে ধীরে শিক্ষার আলোর দিকে এগোতে থাকে। তিনি বিশ্বাস করতেন মানব জাতি পুরুষ ও নারীর মিলিত ধারারই ফল। তিনি নারী-পুরুষকে একটি সাইকেলের দুটি চাকার সাথে তুলনা করেছেন। একটি চাকা বড় এবং একটি চাকা ছোটো থাকলে সাইকেলটি যেমন চলতে পারে না তেমনি সমাজের অর্ধেক অংশ নারীর অবদান ব্যতীত সমাজের উন্নয়ন সম্ভব নয়।

নারীকে অর্থনৈতিকভাবে মুক্তি দেয়াই তাঁর জীবনের লক্ষ্য ছিল। ১৯১৬ সালে তিনি 'আঞ্জুমানে খাওয়াতিনে ইসলাম' নামে একটি মহিলা সংগঠন প্রতিষ্ঠা করেন। এই প্রতিষ্ঠান থেকে দুঃস্থ নারীদের বিভিন্নভাবে সাহায্য করা হতো। তাদের হাতের কাজ শেখানো হতো, সামান্য লেখাপড়া শেখানোর ব্যবস্থাও ছিল। এক কথায় এই সংগঠনটির লক্ষ্য ছিল সমাজের সাধারণ দুঃস্থ নারীদের সাবলম্বী করে তোলা। এছাড়াও তিনি তাঁর শিক্ষামূলক, সমাজ সংস্কারমূলক বিভিন্ন গল্প, কবিতা, প্রবন্ধ ও ব্যাঙ্গ রচনার মাধ্যমে নারীশিক্ষার প্রয়োজনীয়তা তুলে ধরেছেন। 'মতিচুর', 'সুলতানাজ ড্রিম', 'পদ্মরাগ' ও অবরোধবাসিনী ইত্যাদি প্রকাশিত বইয়ের মাধ্যমে তিনি নারীসমাজে পরিবর্তন এনেছিলেন।

রোকেয়া এই উপমহাদেশের একজন দূরদৃষ্টিসম্পন্ন মানুষ। নারীশিক্ষার অগ্রদূত হিসেবে বাঙালি সমাজে তিনি শ্রদ্ধার আসনে আসীন। বিংশ শতাব্দীর সূচনায় তিনি মেয়েদের জন্য স্কুল স্থাপন করে এবং নিজের রচনায় নারীমুক্তির দিক নির্দেশনা দিয়ে সাহায্য করেছেন। তাঁর অবদান আমাদের কাছে ভুলবার নয়।

শহীদ সৈয়দ নজরুল ইসলাম

অনিরুদ্ধ দাস
শ্রেণি: ৫ম, শাখা: ক, রোল: ১৬

বাগানের গোলাপ গাছে খুব সুন্দর একটা গোলাপ ফুল ফুটেছিল সেদিন। অনেক প্রাণবন্ত, অনেক সজীব। যেন নতুনের বার্তাবহ। কারও আগমনী গান গাইছে, সে আগমনী গানের সত্য ধারায় এই বাগানওয়ালা বাড়িতে জন্ম নেয় এক ছোট্ট ফুটফুটে শিশু। গোলাপ ফুলের মতো মনোহর, প্রাণ-প্রাচুর্যে ভরা। শিশুসুলভ স্নিগ্ধতায় টলটলে। দাদা সৈয়দ আবদুর রইস তাই নাম রাখলেন গোলাপ।

শিশুটির ভালো নাম রাখা হলো, নামের পূর্বে বংশ পদবি জুড়ে দিয়ে সৈয়দ নজরুল ইসলাম। ১৯২৫ সালের ১৮ ফেব্রুয়ারি জন্মগ্রহণ করা এই শিশুটি বড় হতে লাগল। কিশোরগঞ্জ জেলার, সদর থানার, যশোদল দামপাড়া তার বিচরণ ক্ষেত্র। লেখাপড়ার হাতেখড়ি হয় যশোদল মিডল ইংলিশ স্কুলে। এরপর কিশোরগঞ্জ আজিমুদ্দিন হাই স্কুল আর ময়মনসিংহ জিলা স্কুলে কাটে তাঁর স্কুলজীবন। ময়মনসিংহ জিলা স্কুল থেকে ১৯৪১ সালে দুই বিষয়ে লেটার মার্কসসহ প্রথম বিভাগে ম্যাট্রিক পাস করেন। ১৯৪৩ সালে আনন্দমোহন কলেজ থেকে কৃতিত্বের সাথে প্রথম বিভাগে আইএ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। এরপর আসেন বিশ্ববিদ্যালয় জীবনে। ভর্তি হন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাস বিভাগে।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় হলে থাকাকালে সাংগঠনিক রাজনীতির সাথে পরিচয় হয় তাঁর। সলিমুল্লাহ মুসলিম হলের ছাত্র সংসদের ক্রীড়া সম্পাদক হন প্রথম বর্ষে পড়ার সময়। এরপর ১৯৪৭-৪৮ সালে সলিমুল্লাহ্ মুসলিম হলের সহ-সভাপতি হিসেবে নির্বাচিত হয়ে দায়িত্ব পালন করেন। পরে মুসলিম ছাত্রলীগের সম্পাদক নির্বাচিত হন। ১৯৪৮ সালে মাস্টার্স উত্তীর্ণ হবার আগেই আনন্দমোহন কলেজে অধ্যাপনার কাজে নিযুক্ত হন। পরবর্তীকালে অবশ্য ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে তিনি ইতিহাসে প্রথম শ্রেণিতে মাষ্টার্স ডিগ্রী অর্জন করেন।

১৯৪৭ সাল। ভারত বিভক্তির সময়, সিলেট ভারত না পাকিস্তান কোন দেশের অন্তর্ভুক্ত হবে এ সমস্যা সমাধানে গণভোটের আয়োজন করা হয়। এ সময় পাকিস্তানের পক্ষে প্রচারণা চালাতে সৈয়দ নজরুল একদল ছাত্র নিয়ে সিলেট যান। একই সময়ে কলকাতা ইসলামিয়া কলেজের তুখোড় ছাত্রনেতা, কলেজ ছাত্রসংসদের জিএস হিসেবে শেখ মুজিবুর রহমানও পাকিস্তানের পক্ষে জনমত গড়ে তুলতে সিলেট আসেন। এখানেই এই দুই উদীয়মান নেতার পরিচয় ঘটে। পরিচয় থেকে বন্ধুত্ব। বন্ধুত্ব থেকে আজীবনের রাজনৈতিক সহকর্মী।

পিতার ইচ্ছা ছেলে সিএসপি অফিসার হোক। এ ইচ্ছা পূরণে তিনি ১৯৪৯ সালে সিএসপি পরীক্ষা দেন ও উত্তীর্ণ হয়ে কর বিভাগে অফিসার পদ লাভ করেন। কিন্তু তিনি মাত্র এক বছর সেই চাকরি করেন। কারণ একবার একটি গুরুত্বপূর্ণ ফাইল নিয়ে ঊর্ধ্বতন কমিশনারের রুমে গিয়েছিলেন তিনি। কমিশনার

তাঁকে বসতে না বলায় অপমানিত বোধ করেন তিনি। চাকরিতে ইস্তফা দেন। এরপর আর এ ধরনের সরকারি চাকরি করেননি।

১৯৫০ সালে কটিয়াদীর বনেদি পরিবারের মেয়ে বেগম নাফিসা ইসলামের সঙ্গে পরিণয়সূত্রে আবদ্ধ হন সৈয়দ নজরুল ইসলাম। ১৯৫১ সালে তিনি সরকারি চাকুরিতে ইস্তফা দেবার পর ময়মনসিংহে আনন্দমোহন কলেজে অধ্যাপনায় ফিরে আসেন। অধ্যাপনার কাজে ব্যস্ত থাকাকালীনই তিনি এলএলবি পরীক্ষায় সাফল্যের সাথে উত্তীর্ণ হন এবং ১৯৫৫ সালে ময়মনসিংহ বার কাউন্সিলে যোগ দিয়ে আইন পেশাকে জীবনের ব্রত হিসেবে বেছে নেন।

১৯৫৭ সালে তিনি খ্যাতিমান রাজনীতিক, সু-সাহিত্যিক ও পাকিস্তানের সাবেক বাণিজ্যমন্ত্রী আবুল মনসুর আহমেদকে কাউন্সিলের মাধ্যমে হারিয়ে বৃহত্তর ময়মনসিংহ জেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি নির্বাচিত হন।

আইয়ুব সরকারের আমলে মোনায়েম খান এবং তাঁর সৃষ্ট এনএসএফ সৈয়দ নজরুল এবং তাঁর পরিবারের উপর বিভিন্ন রকম নির্যাতন চালিয়ে যেতে থাকে। তবুও তিনি ছিলেন তাঁর বিশ্বাস ও সিদ্ধান্তে অটল। ১৯৬৪ সালে তিনি ইডেন চত্বরে অনুষ্ঠিত আওয়ামী লীগের কাউন্সিল থেকে কমিটির সিনিয়র সহ-সভাপতি নিযুক্ত হন। ১৯৭২ সাল পর্যন্ত এ পদে আসীন ছিলেন।

সারা দেশ জুড়ে বাঙালি জাতির স্বাধিকার আদায়ের লড়াই শুরু হয়ে গেছে এরই মধ্যে। এরই মাঝে শেখ মুজিবুর রহমান ঘোষণা করেন তাঁর ছয় দফা, বাঙালির মুক্তির সনদ। ১৯৬৬ সাল। সৈয়দ নজরুল দেশব্যাপী ছয় দফার পক্ষে প্রচারণা চালান ও জনমত গড়ে তোলেন। ছয় দফার তীব্রতা কমাতে আইয়ুব খানের মনোনীত প্রাদেশিক গভর্ণর মোনায়েম খাঁ, শেখ মুজিবুর রহমানসহ অনেক প্রথিতযশা নেতাকে বারংবার গ্রেফতার করে এবং কর্মীদের উপর জুলুম নির্যাতন চালায়। বাংলার ও আওয়ামী লীগের জন্য সংকটময় সময় এটা। বাঙালির আন্দোলন-সংগ্রামের আর এক কাণ্ডারী তাজউদ্দীন আহমদও গ্রেফতার হন। ১৯৬৬ সালের ৯ মে সঙ্কটময় মুহুর্তে সৈয়দ নজরুল আওয়ামী লীগের ভারপ্রাপ্ত সভাপতির দায়িত্ব গ্রহণ করেন। নিষ্ঠার সাথে সে দায়িত্ব পালন করেন ১৯৬৯ সাল পর্যন্ত। এগিয়ে নিতে থাকেন স্বাধীকার আন্দোলনকে।

১৯৬৮ সালে শেখ মুজিবুর রহমানকে প্রধান আসামি করে আগড়তলা ষড়যন্ত্র মামলা নামের একটি তথাকথিত রাষ্ট্রদ্রোহী মামলা দায়ের করা হয়। সৈয়দ নজরুল এ মামলায় শেখ মুজিবুরের অন্যতম আইনজীবীর দায়িত্ব পালন করেন। ১৯৬৯ সালের গণঅভ্যুত্থানে বিভিন্ন রাজনৈতিক দল 'ডেমোক্রেটিক অ্যাকশন কমিটি' নামে একটি সর্বদলীয় সংগ্রাম কমিটি গঠন করে।

আইয়ুব শাসনামলের অধিকাংশ সময় শেখ মুজিব কারারুদ্ধ ছিলেন। তাঁকে বার বার গ্রেফতার করা হতো। এ সময় একবার, এক সাংবাদিক মোনায়েম খানকে (জন্মসূত্রে ময়মনসিংহ অঞ্চলের) প্রশ্ন করেছিলেন, 'শেখ মুজিবকে বার বার আটক করলেও সৈয়দ নজরুলকে কেন আটক করেন না?' মোনায়েম খান বলেছিলেন, 'আমি চাই না ময়মনসিংহ অঞ্চলে আর এক মুজিবের উত্থান ঘটুক।'

গোলটেবিল বৈঠকে সৈয়দ নজরুলের এবং আওয়ামী লীগ নেতাদের বলিষ্ঠ ভূমিকা এবং প্রবল জনমতের চাপে শেখ মুজিব মুক্তি পান। পতন ঘটে পাকিস্তানের লৌহমানব আইয়ুব খানের। সরকার রাজনৈতিক দলগুলোর আন্দোলনে পরাভূত হয়ে ১৯৭০ সালে সাধারণ নির্বাচন আহ্বান করে। সৈয়দ নজরুল ১৯৭০-এর নির্বাচনে ময়মনসিংহ-১৭ আসন থেকে এম.এল.এ নির্বাচিত হন। সৈয়দ নজরুল ইসলাম সেই ঐতিহাসিক নির্বাচনে জয়লাভের পর আওয়ামী লীগের সংসদীয় দলের উপনেতা নির্বাচিত হন।

১৯৭১ সালের আন্দোলন-সংগ্রামেও সৈয়দ নজরুল ইসলাম ছিলেন অগ্রগামী। ১৯ মার্চ, ১৯৭১। ইয়াহিয়া প্রাদেশিক পরিষদের সংখ্যাগরিষ্ঠ দল আওয়ামী লীগের সাথে বৈঠক করেন। শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বে সে প্রতিনিধি দলের সদস্য ছিলেন সৈয়দ নজরুল ইসলাম।

শেখ মুজিব গ্রেফতারের পূর্বেই দলীয় হাইকমান্ড গঠন করে গিয়েছিলেন। সৈয়দ নজরুল ছিলেন দলীয় হাইকমান্ডের প্রধানতম নেতা। ২৫ মার্চ দুপুরবেলা শেখ মুজিবুর রহমান পূর্ব পাকিস্তান ডিএফআই চিফ মারফত গোপন খবরে অবগত হন যে, রাতে ঢাকায় ক্র্যাকডাউন হতে যাচ্ছে। দ্রুত শেখ মুজিব হাইকমান্ড এবং অন্যান্য নেতাদের গোপন আশ্রয়ে যাবার নির্দেশ দেন। নিজে রয়ে যান ধানমন্ডির ৩২ নম্বর রোডের বাড়িতে। ২৫ মার্চ রাতে শেখ মুজিবুর রহমান গ্রেফতার হলে সৈয়দ নজরুল ইসলাম আওয়ামী লীগের ভারপ্রাপ্ত সভাপতির দায়িত্ব গ্রহণ করেন।

সৈয়দ নজরুল ২৫ মার্চ রাতে ছিলেন প্রখ্যাত চক্ষু চিকিৎসক ডা. আলীম চৌধুরীর বাসায়। ২৫ মার্চের ধ্বংসযজ্ঞের পরদিন ডা. চৌধুরীর স্ত্রী শ্যামলী নাসরিন চৌধুরীর সহায়তায় বিধবা মহিলার পোশাক ও পরচুলা পরে, রিকশাযোগে সৈয়দ নজরুল নরসিংদী চলে যান। পথে দুবার পাক আর্মি রিকশা থামায়। চালক জানায়, আমার অসুস্থ বিধবা মাকে রিকশায় করে নিয়ে যাচ্ছি। নরসিংদী নিরাপদে চলে আসার পিছনে ওই রিকশাওয়ালার

অবদান তিনি সর্বদা কৃতজ্ঞতাভরে স্মরণ করতেন। এরপর তিনি কটিয়াদী চলে যান। তাঁর অবস্থানের খবর জানাজানি হয়ে গেলে তিনি কিশোরগঞ্জ শহরে আসাদুজ্জামান সাহেবের বাসায় আশ্রয় নেন। এরই মাঝে রাতে তাঁর সাথে দেখা করতে আসেন তাঁর জ্যেষ্ঠপুত্র সৈয়দ আশরাফ ও হামিদুল হক। তারা জিপে করে সৈয়দ নজরুল ইসলামকে নিয়ে যান হালুয়াঘাট সীমান্তে। মধ্যরাতে তারা হালুয়াঘাট পৌঁছেন। ভোর হবার আগেই সীমান্ত পাড়ি দেন।

তাজউদ্দীন আহমদ শেখ মুজিবুর রহমানকে রাষ্ট্রপতি এবং তাঁর অনুপস্থিতিতে উপ-রাষ্ট্রপতি সৈয়দ নজারুল ইসলামকে অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি এবং নিজে প্রধানমন্ত্রী হিসেবে একটা সরকারের কাঠামো তৈরি করেন এবং ১০ এপ্রিল, রেডিওতে স্বাধীন বাংলাদেশ সরকারের প্রধানমন্ত্রী হিসেবে ভাষণ দেন।

১৭ এপ্রিল, শেখ মুজিবুর রহমানের আদেশে হাইকমান্ডকে নিয়ে গঠিত সরকার মেহেরপুরের বদ্যিনাথতলার আম্রকাননে শপথ গ্রহণ করে। এ শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠানে তিনি তাঁর ভাষণে বলেন- 'যদি বিশ্বাসঘাতকতা করি, তবে আস্তাকুঁড়ে নিক্ষেপ করবেন।' তিনি তাঁর দায়িত্ব পালনের প্রতি ছিলেন প্রখর সচেষ্ট।

প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দীন আহমদের সাথে সুচিন্তিত মতামত বিনিময়ের মাধ্যমে এবং সমঝোতার ভিত্তিতে তাঁরা সরকার পরিচালনা ও যুদ্ধকে এগিয়ে নিতে থাকেন।

উপ-রাষ্ট্রপতি সৈয়দ নজরুল ইসলাম এবং প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দীন আহমদের যোগ্য নেতৃত্ব এবং বাংলাদেশের মুক্তিকামী জনগণ ও মুক্তিযোদ্ধাদের প্রবল আক্রমণের মাধ্যমে বাংলাদেশ স্বাধীনতার দিকে একটু একটু করে এগিয়ে যেতে থাকে।

একটু একটু করে জয়ের বন্দরে ভীড়ে বাংলাদেশের বিজয়ের তরী। ১৬ ডিসেম্বর, ১৯৭১ সাল। বাংলাদেশ স্বাধীন হয়।

স্বাধীন দেশে শেখ মুজিবুর রহমান ফেরার পর সংসদীয় শাসন ব্যবস্থায় সৈয়দ নজরুল ইসলাম শিল্প মন্ত্রী হিসেবে দায়িত্ব গ্রহণ করেন। যুদ্ধ বিধ্বস্ত বাংলাদেশে নতুন করে শিল্পের উপযোগী পরিবেশ তৈরিতে তিনি আত্মনিয়োগ করেন। এবং শিল্প ব্যবস্থা আধুনিকায়নে মনোযোগী হন। ছিলেন সংবিধান প্রণয়ন কমিটির গুরুত্বপূর্ণ সদস্য। সংসদে ১৯৭২ সালে উপনেতা নির্বাচিত হন। ১৯৭৩ সালে ময়মনসিংহ-২৮ আসন থেকে পুনরায় সংসদ সদস্য নির্বাচিত হন এবং দ্বিতীয়বারের মতো সংসদে উপনেতা নির্বাচিত হন। শিল্পমন্ত্রী থাকাকালে, শিল্প মন্ত্রণালয়ে শিল্প-কারখানা জাতীয়করণ করার সুপারিশ দেন এবং তা করা হয়। তিনি নতুন শিল্প কারখানা স্থাপন এবং শিল্প-বান্ধব পরিবেশ সৃষ্টিতে আত্মনিয়োগ করে দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলে ছুটে যেতে লাগলেন। যুদ্ধ বিধ্বস্ত নতুন দেশে এসব কাজ ছিল খুবই কঠিন। ১৯৭৫ সালে শেখ মুজিবুর রহমান রাষ্ট্রপতি হলে তিনি উপ-রাষ্ট্রপতি হন এবং নবগঠিত বাংলাদেশ কৃষক-শ্রমিক আওয়ামী লীগ (বাকশাল)-এর সহ-সভাপতি নির্বাচিত হন।

সেনাবাহিনীর কতিপয় বিপথগামী সদস্য স্বাধীনতা যুদ্ধে পরাজিত শক্তির প্রত্যক্ষ মদদে ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে হত্যা করে এবং সৈয়দ নজরুল ইসলাম, তাজউদ্দীন আহমেদ, এ.এইচ.এম. কামারুজ্জামান এবং ক্যাপ্টেন এম. মনসুরকে গ্রেফতার করে। খুনী চক্র বঙ্গবন্ধুর আদর্শের সাথী চার জাতীয় নেতাকে নিয়ে ভয়ে ছিল। খুনি চক্র সৈয়দ নজরুল ইসলামকে তাদের রাষ্ট্রীয় ক্ষমতায় অংশগ্রহণ করার জন্য চাপ দেয়। কিন্তু তিনি বলেন- 'বঙ্গবন্ধুর আদর্শের সাথে কোনো বেঈমানি নয়।'

জেলখানায় ১৯৭৫ সালের ৩ নভেম্বর রাত। থমথমে অবস্থা। অন্য তিন জাতীয় নেতাসহ সৈয়দ নজরুল ইসলামকে একত্রিত করা হয় একই সেলে। জেলখানায় অবৈধভাবে প্রবেশ করা খন্দাকর মুশতাকের অনুসারি ও সেনা সমর্থিত মাত্র ৪ জন সৈন্য ৬০টি বুলেট ও বেয়নেট দিয়ে খুঁচিয়ে হত্যা করে চার জাতীয় নেতাকে। সৈয়দ নজরুল ইসলামকে দাফন করা হয় বনানী কবরস্থানে।

ওরা চেয়েছিল স্বাধীনতা যুদ্ধে জয়ী মুক্তিযুদ্ধের আদর্শের চেতনা ও আশা-আকাঙ্ক্ষাকে দমিয়ে দিতে। ওরা পারেনি। বুলেট সবাক কণ্ঠকে রুদ্ধ করতে পারে, কিন্তু কণ্ঠের বাণীকে নয়। খুনিরা পেরেছিল সৈয়দ নজরুল ইসলামকে হত্যা করতে, কিন্তু তাঁর আদর্শকে নয়।

ময়মনসিংহ গীতিকার কথা

মুনাওয়ারা তারান্নুম
শ্রেণি: ৭ম, শাখা: ক, রোল: ০৩

ইংরেজি Ballad কথাটির বহুল প্রচলিত বাংলা অর্থ গীতিকা। তবে মধ্যযুগীয় পাশ্চাত্য আখ্যানমূলক লোকগীতিকে (Narrative folk song) ইংরেজিতে Ballad বলা হতো, যা অনেকটা নৃত্যনাট্যের মতো। লোকসাহিত্যের বিভিন্ন উপাদানের মধ্যে আমাদের দেশে সর্বাপেক্ষা অবহেলিত গীতিকা। গীতিকা সম্পর্কিত আলোচনাও আমাদের দেশে নিতান্ত সীমিত। গীতিকা সাধারণত দুরকম-প্রাচীন গীতিকা ও সাহিত্যিক গীতিকা। বাংলা লোকসাহিত্যে গীতিকা অবহেলিত হলেও লোকসাহিত্যের ভাণ্ডারে পালা বা গাথাগুলো অনেকটা স্থান দখল করে আছে। বাংলাদেশকে পালা বা গাথা চর্চার পীঠস্থান বলা চলে। কেননা বাংলাদেশ হলো খাল-বিল-হাওর-জঙ্গলে ভরা ব-দ্বীপ অঞ্চল। এখানকার মানুষের অবসর সময় বেশি। অবসর সময়ে বাঙালি মেতে ওঠে তাদের সমকালীন জীবনের নানান প্রসঙ্গ নিয়ে তৈরি পালাগানের চর্চায়। এই পালাগুলো শ্রোতার সম্মুখে গীত, বাদ্য ও নৃত্য সহযোগে আকর্ষণীয় করে উপস্থাপন করা হয়। দর্শক মোহিত হয় এবং এক প্রজন্ম থেকে আরেক প্রজন্মের মাধ্যমে পালাগুলো বেঁচে থাকে। ময়মনসিংহ গীতাকার জন্মস্থান বর্তমান বৃহত্তর ময়মনসিংহ জেলার অন্তর্ভুক্ত কিশোরগঞ্জ, নেত্রকোনা, জামালপুর, টাঙ্গাইল, শেরপুর ও ময়মনসিংহ জেলাকে নিয়ে। ভৌগোলিক মানচিত্রে প্রাচীন ময়মনসিংহ ছিল তৎকালীন ব্রিটিশ ভারতের সবচেয়ে বড় জেলা। যার বিস্তৃতি ছিল উত্তরে গারোপাহাড় থেকে দক্ষিণে বঙ্গোপসাগর অবধি। ব্রহ্মপুত্র নদের পূর্বাঞ্চল বিস্তৃত জলাভূমি হাওর দ্বারা বিস্তৃত। হাওর শব্দটি সাগর শব্দটিরই পরিবর্তিত রূপ। এই হাওর বা নদ-নদী প্লাবিত বিস্তৃত নিম্নভূমি বা ভাটি অঞ্চলই ময়মনসিংহ গীতিকার জন্মভূমি। ময়মনসিংহের দুটি মহকুমা কিশোরগঞ্জ ও নেত্রকোনা হবার কারণে গীতিকাটির নাম হয় ময়মনসিংহ গীতিকা। এটি প্রথম প্রকাশিত হয় ১৯২৩ সালে কোলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ড. দীনেশচন্দ্র সেনের সম্পাদনায়। সার্বিক সহযোগিতা করেন আশুতোষ মুখোপাধ্যায়। বইটিতে মোট ১০টি গীতিকা রয়েছে। সেগুলো হলো -মহুয়া, মলুয়া, চন্দ্রাবতী, কমলা, দেওয়ান ভাবনা, দস্যু কেনারামের পালা, রূপবতী, কঙ্ক ও লীলা, কাজলরেখা, দেওয়ান মদিনা। ড. দীনেশচন্দ্র সেন গীতিকাগুলো সংগ্রহ করেন স্বশিক্ষিত এক স্বভাব কবি চন্দ্র কুমার দের মাধ্যমে। কিশোরগঞ্জের কেদারনাথ মজুমদারের সাথে ড. দীনেশচন্দ্র সেনের পরিচয় ঘটে। কেদারনাথ মজুমদার ময়মনসিংহ হতে 'সৌরভ' নামে একটি পত্রিকা বের করতেন। এই পত্রিকাতেই চন্দ্র কুমার দের লোকসাহিত্যের উপর কয়েকটি প্রবন্ধ বের হয়। ১৯১৩ সালে সৌরভ পত্রিকায় মহিলাকবি চন্দ্রাবতীর উপর প্রকাশিত একটি প্রবন্ধ পড়ে ড. দীনেশ চন্দ্র মুগ্ধ হন এবং পরবর্তীতে চন্দ্রকুমার দের সাথে কথা বলেন। তাকে দিয়েই অতিকষ্টে দিনের পর দিন চেষ্টা করে সাধনার মাধ্যমে গ্রামে গ্রামে ঘুরে সংগ্রহ করেন এই পালাগুলো। ময়মনসিংহ গীতিকার পালাগুলো মূলত প্রেম-বিরহকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছে। এই প্রেমের বর্ণনা করতে গিয়ে লোককবিগণ লোক জীবনের নানা বাস্তব-অবাস্তব চিত্রের সংযোজন ঘটিয়েছেন। শুরুতেই মহুয়া পালা চিত্রিত হয়েছে। মহুয়া একটি ফুলের নাম। যে ফুলের সৌরভে মাদকতা বর্তমান। যে ফুল জ্যান্ত, যে ফুলের সৌন্দর্যে নদের চাঁদ পাগল। অনেক চড়াই-উৎরাই পেরিয়ে নদের চাঁদ ও মহুয়ার মিলন হয়। তবে সে মিলন প্রতিষ্ঠিত হয় মৃত্যুর পর অন্ধকার কবরে।

মূলত ময়মনসিংহ গীতিকা পুস্তকাকারে প্রকাশিত হবার সাথে সাথে সুধী সমাজে আলোড়ন সৃষ্টি করে। গীতিকাগুলো সাহিত্যিক মূল্যে বিদেশি সাহিত্যে ব্যাপক সমাদৃত। ময়মনসিংহ গীতিকা যার মাধ্যমে বিশ্ববাসী প্রথম জানতে পারে বাংলার লৌকিক-অলৌকিকে জীবনের এক একটি অনন্য উপাখ্যান, যা চিরায়ত অসাম্প্রদায়িক বাঙালির চেতনার পরিচয় বহন করে। বাংলার গ্রামের মানুষের হাসি-কান্না, সুখ-দুঃখ, প্রেম-বিরহের আকরগ্রন্থ ময়মনসিংহ গীতিকা। গ্রামের সহজ সরল যে মানুষের হাতে এত অপূর্ব সুন্দর সাহিত্য সৃষ্টি হয়, সেই সকল লৌকিক কবির প্রতি হাজার সালাম।

ময়মনসিংহে নজরুল

সূচনা আজাদ
শ্রেণি: ষষ্ঠ, শাখা: গ, রোল: ২৮৭

নজরুল জন্মগ্রহণ করেন পশ্চিমবঙ্গের বর্ধমান জেলার আসানসোল মহকুমার জামুরিয়া থানার চুরুলিয়া গ্রামে ১৮৯৯ সালের ২৫ মে। তাঁর পিতার নাম কাজী ফকির আহমেদ, মা জাহেদা খাতুন। নিতান্ত শিশু বয়সেই নজরুলের জীবনে শুরু হয়েছিল দুঃখ-দারিদ্র্যের সাথে যুদ্ধ। মাত্র আট বছর বয়সে তাঁর পিতাকে হারিয়ে দুঃখের সাগরে ভাসেন।

১৯০৯ খ্রিস্টাব্দে তিনি গ্রামের মক্তব থেকে নিম্ন প্রাইমারি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে মাত্র দশ বছর বয়সে ঐ মক্তবেই শিক্ষকতা করেন। ক্ষুধার অন্ন যোগাতে এই ছোটো বয়সেই তাঁকে আরো অনেক কিছু করতে হয়েছে। হাজী পালোয়ানের মাজারের খাদেম হয়েছেন, পীরপুকুর মসজিদে আযান দিয়েছেন, চাচার সাথে লেটোর দলে গান লিখেছেন ও গেয়েছেন। একসময় প্রতিবেশীদের সহায়তায় লেটোর দল ত্যাগ করে রাণীগঞ্জে সিয়ারসোল রাজ স্কুলে ষষ্ঠ শ্রেণিতে ভর্তি হন। এখানেও মন বসল না, এখান থেকে যান মাথরুন ইংরেজি উচ্চ বিদ্যালয়ে। তখন সম্ভবত ১৯১০ সাল। কিন্তু বছর যেতে না যেতেই আর্থিক অনটনের কবলে পড়ে স্কুলে যাওয়া বন্ধ হয়ে যায়।এর পর তিনি রেলওয়ে গার্ডের অধীনে চাকরি নেন। অকূল পাথারে খড়কুটোর মত ভাসতে ভাসতে একদিন হাজির হন আসানসোলে ওয়াহেদ মিয়ার রুটির দোকানে। মাসিক বেতন পাঁচ টাকায় রুটি বানানোর কাজ। ঐ দোকানের কাছে একটি বাড়ির সিঁড়ির নিচে তিনি রাত্রিযাপন করতেন। সে বাড়িতেই থাকতেন কাজী রফিজ উল্লাহ দারোগা। এখান থেকেই পুলিশ ইন্সপেক্টর কাজী রফিজ উল্লাহ বদলি হয়ে আসার সময় দুখু মিয়া নামের ১৪/১৫ বছর বয়সের ঝাঁকড়াচুলো কিশোর নজরুলকে নিয়ে আসেন ময়মনসিংহে ত্রিশালের কাজীর সিমলায়। কাজী রফিজ উল্লাহর বদলির চাকরি হওয়ায় তিনি তাঁর বড়ভাই সাখাওয়াত উল্লাহকে নজরুলের লেখাপড়ার বন্দোবস্তো করার দায়িত্ব দিয়ে কর্মস্থলে ফিরে যান। তখন ১৯১৪ সাল।

নজরুলের ত্রিশালজীবন সম্পর্কে তিনি নিজে কিছু লিখে যান নি। আর সেই সময়ে নজরুল ছিলেন এক আশ্রিত কিশোর। এমন অসহায় আশ্রিত কিশোরের কথা কেইবা মনে রাখে! তাঁর ত্রিশালজীবন সম্পর্কে জানা যায় কাজী রফিজ উল্লাহ সাহেবের স্ত্রী, নজরুলের সহপাঠী নিয়ামত মাস্টার, সমকালীন বিভিন্ন জনের সাক্ষাৎকার এবং কাজী রফিজ উল্লাহর ভ্রাতুষ্পুত্র কাজী তালেবুর রহমানের স্মৃতিচারণমূলক একটি পাণ্ডুলিপি থেকে।

১৯১৪ সালে নজরুলকে ত্রিশালের দরিরামপুর স্কুলে সপ্তম শ্রেণিতে ভর্তি করানো হয়। উল্লেখ্য যে ভর্তি পরীক্ষায় নজরুল এতটাই মেধার পরিচয় দেন যে তাঁকে ফুল-ফ্রি স্টুডেন্টশিপ দেয়া হয়। দারোগাবাড়িতে নজরুল তিন মাস ছিলেন। দারোগাবাড়ি থেকে দরিরামপুর স্কুল ছিল পাঁচ মাইল দূরে। একেতো হাঁটাপথ তার ওপর বর্ষাকালে কাদা ভেঙে স্কুলে যাতায়াত ছিল অত্যন্ত কষ্টকর। তাই তাঁকে দরিরামপুরেই নামাপাড়া বিচ্যুতিয়া বেপারি বাড়িতে জায়গীর থাকতে হয়। তিনি মাঝে মাঝে স্কুল কামাই করে শুকনি বিলের নিকটবর্তী বটগাছে চড়ে আপন মনে বাঁশি বাজাতেন। আবার বাঁশিটা ওই বটগাছের কোটরেই রেখে দিতেন। তাঁর বাঁশির সুরে মুগ্ধ হয়ে পথিক ছুটে আসতো। তখন স্কুলের প্রধান শিক্ষক ছিলেন বিপিন বাবু। একদিন হেডমাস্টার মহোদয়ের নজরুলকে স্কুল কামাই করার কারণ জিজ্ঞেস করলে নজরুল উত্তর দেন যে বিলে পানি হওয়ার কারণে তিনি স্কুলে আসতে পারেন না। নজরুলের এই অসুবিধা দূর করতে স্কুলের

শিক্ষক এ বি এম খিজির পণ্ডিত নজরুলকে দরিরামপুরের কাছেই বিরামপুরে নিয়ে যান। সেখান থেকেই কবি পুরো বর্ষাকাল স্কুল করেছেন। বর্ষা শেষে কবি আবার বিচ্যুতিয়া বেপারি বাড়িতে ফিরে যান। ১৯১৪ সালের জুন মাসে নজরুল ভর্তি হয়ে ছিলেন। একমাস পরেই সে স্কুলে মহিমচন্দ্র সহকারী শিক্ষক পদে নিযুক্ত হন। নজরুলদের ক্লাসে তিনি ইংরেজি পড়াতেন। মহিম বাবুর মতে নজরুল ক্লাসে প্রায় অন্যমনস্ক থাকতেন। কোনো প্রশ্নের উত্তর প্রথমে না দিলেও আবার জিজ্ঞাসা করা হলে নজরুল তার যথাযথ উত্তর দিতেন। নজরুলের পাঠাভ্যাস ছিল কিংবদন্তিতুল্য। এমন কি খাবারের সময়ে ও থালার পাশে বই খুলে রেখে পড়তেন। জায়গীর বাড়িতে নজরুল অনেক রাত পর্যন্ত বই পড়তেন। কেরোসিন তেল ফুরিয়ে গেলে কেরোসিন কিনবার পয়সা নানা জনের কাছ থেকে ধার নিতেন। স্কুলে যাওয়া আসার পথে একটা কাঠের পুল পড়তো, ঠুনিভাঙ্গা পুল নামে তার পরিচিত। পুলের পাশে বিস্তৃত ঠুনিভাঙ্গা বিল। আসা-যাওয়া দশ মাইল হেঁটে বাড়ি ফিরে ক্লান্ত হয়ে সন্ধ্যার পর গান গাইতে গাইতে ঘুমিয়ে পড়তেন।

জানা যায় নজরুল লেখাপড়ায় ভালো ছিলেন। ১৯১৪ সালের ডিসেম্বরে স্কুলে বার্ষিক পরীক্ষায় প্রথম স্থান লাভ করে অষ্টম শ্রেণিতে উত্তীর্ণ হন। নজরুলের সহপাঠী নিয়ামত মাস্টারের কাছে জানা যায় ক্লাসে নজরুল ইসলাম অন্যমনস্ক এবং শান্তশিষ্ট থাকতেন, কিন্তু স্কুল নাটক, বিতর্ক আবৃত্তিসহ বিভিন্ন প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করতেন এবং প্রশংসা লাভ করতেন। এসব কারণে শিক্ষকরা তাঁকে ভালবাসতেন। বিতর্ক বা রচনায় নজরুল কঠিন কঠিন শব্দ ব্যবহার করতেন যা শিক্ষকদেরকেও বিস্মিত করত। নজরুল ভালো বাংলা জানেন বলে ছাত্র-শিক্ষক সবাই তাঁকে বিশেষ গুরুত্ব দিত। দুরন্ত নজরুলের লেখাপড়া থেকে গান গাওয়া, কবিতা লেখার প্রতি আকর্ষণ বেশি। নাটক, আবৃত্তি কিংবা গানের কোনো অনুষ্ঠানের খোঁজ পেলে তিনি লেখাপড়া ছেড়ে ছুটে যেতেন সেখানে। মহিম বাবুর পরিচালনায় দরিরামপুর স্কুলে একটি বিচিত্রা অনুষ্ঠান হয় তাতে নজরুল রবীন্দ্রনাথের অপঠিত 'দুই বিঘা জমি' এবং 'পুরাতন ভৃত্য' কবিতা দুটি আবৃত্তি করে সবাইকে মুগ্ধ করেন। সবসময় ধুতি পরতেন এবং তাঁর ধুতির পেছনের কাছাটি বেশ লম্বা করে পরতেন। নজরুলের সহপাঠী দুষ্টু ছেলেরা নাকি তার ধুতির কাছা ধরে টানাটানি করত।

ভাষাগত পার্থক্য, বয়সগত ব্যবধান তুচ্ছ করে কবি ছুটে যেতেন কৃষকদের কাছে, তাদেরকে তিনি গান শোনাতেন। কাজির সিমলা থেকে দরিরামপুর প্রতিদিনের এই যাওয়া আসার পথে দেখতেন কাঠের পুলের দুপাশে বিস্তীর্ণ বিল। পুলের এক প্রান্তের বটগাছ আর দেখেছেন মাঠ ভরা সবুজ ধান, থৈ থৈ করা বিলে বর্ষার পানি। ত্রিশাল এসে নজরুল প্রকৃতিকে ভালবাসতে শিখেছিলেন। ত্রিশালের শ্যামলী, নদী-বিল-মাঠ প্রান্তর নজরুলকে আকৃষ্ট করেছিল।

ত্রিশালে থাকাকালে একদিনের জন্য নজরুল ময়মনসিংহ শহর এসেছিলেন। জানা যায় কাজী রফিজ উল্লাহর নির্দেশে কাজীর সিমলা গ্রামের এক যুবক কাজী ইস্রাইলের সাথে সিটি স্কুলে ভর্তি হতে এসেছিলেন। স্কুলটি তাঁর পছন্দ হয়েছিল। কিন্তু জায়গীর না পাওয়াতে ভর্তি হওয়া হয়নি। নজরুলের সহপাঠী নেয়ামত মাস্টারের কাছ থেকে পাওয়া তথ্যের ভিত্তিতে বলা যায় বার্ষিক পরীক্ষার খাতায় রচনার বদলে একটা কবিতা লিখেছেন নজরুল এরই ফলে স্কুলের পণ্ডিতমশাই তাকে বেত দিয়ে ভালোমতো উত্তম-মধ্যম দিয়েছিলেন। ওই রাতেই নজরুল দরিরামপুর ছেড়ে আসানসোলে পালিয়ে যান।

ময়মনসিংহ ছেড়ে চলে যাবার প্রায় সাত বছর পরে আবার পূর্ববঙ্গে ফিরে এসেছিলেন কিন্তু তখন মায়মনসিংহে আসার সুযোগ হয়ে ওঠেনি। কৈশোরের স্মৃতিঘেরা কাজীর সিমলা দরিরামপুর ত্রিশালের মাটিতে কাজী নজরুল ইসলাম আর কখনো ফিরে আসেননি, কিন্তু ময়মনসিংহের এই অঞ্চলের মাটি ও মানুষের কথা তিনি মনে রেখেছেন। ১৯২৬ সালে নজরুল ময়মনসিংহে এক সম্মেলনে যোগদানের আমন্ত্রণ পেয়েও অসুস্থতার কারণে আসতে পারেননি। সেসময় তাঁর অপারগতার কথা জানিয়ে ময়মনসিংহবাসীর উদ্দেশে একটি পত্র পাঠান যাতে তাঁর আন্তরিক ও কৃতজ্ঞচিত্তের পরিচয় পাওয়া যায়। তিনি লিখেছেন 'এই ময়মনসিংহ জেলার কাছে আমি অশেষ ঋণে ঋণী। আমার বাল্যকালের অনেকগুলো দিন ইহার বুকে কাটিয়া গিয়াছে। এইখানে থাকিয়া আমি কিছুদিন লেখাপড়া করিয়া গিয়াছি। আজও আমার মনে এইসব প্রিয় স্মৃতি উজ্জ্বল ভাস্বর হইয়া জ্বলিতেছে। এই আশা করিয়া ছিলাম আমার সেই শৈশব-চেনাভূমির পবিত্র মাটি মাথায় লইয়া ধন্য হইব। উদারহৃদয় ময়মনসিংহ জেলাবাসীর প্রাণের পরশমণির স্পর্শে আমার লৌহপ্রাণকে কাঞ্চনময় করিয়া তুলিব। কিন্তু তাহা হইল না, দূরদৃষ্ট আমার। যদি সর্বশক্তিমান আল্লাহ্ দিন দেন, আমার স্বাস্থ্য ফিরিয়া পাই, তাহা হইলে আপনাদের গরফরগাঁওয়ের নিখিল বঙ্গীয় প্রজা সম্মিলনীতে যোগদান করিয়া ও আপনাদের দর্শন লাভ করিয়া ধন্য হইব।'

বাকী জীবনে তাঁর সে আশা আর পূরণ হয়নি। তবু ময়মনসিংহ তাঁকে সযত্নে বুকের মাঝে লালন করে চলেছে ভক্তি ও ভালোবাসায় এমনভাবে যেন তিনি এ মাটির সন্তান। ১৯৪০ সাল থেকে প্রতি বছর অত্যন্ত আড়ম্বরের সাথে দরিরামপুরে পালিত হয় তাঁর জন্মোৎসব। ১৯৯০ সাল থেকে সংস্কৃতি মন্ত্রণালয়ের পৃষ্ঠপোষকতায় জাতীয়ভাবে উদযাপন করা হয়। তাঁর স্মৃতিকে অক্ষয় করে ত্রিশালে গড়ে তোলা হয়েছে জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলাম বিশ্ববিদ্যালয়।

ময়মনসিংহে একাত্তর

মুহতাদী আল মুঈদ তালুকদার (জাওয়াদ)
শ্রেণি: সপ্তম, শাখা: গ, রোল: ১১

"আমি যখন মুক্তিযুদ্ধের কথা বলি তেরোশত নদী গেয়ে ওঠে 'আমার সোনার বাংলা'

আমি যখন মুক্তিযুদ্ধের কথা বলি সাতই মার্চ জেগে ওঠে,

শেখ মুজিব ঘোষণা করেন স্বাধীনতা।"

ময়মনসিংহ ব্রহ্মপুত্র নদের তীরে বাংলাদেশের মধ্য অঞ্চলে অবস্থিত একটি জেলা শহর যার কোড নম্বর ৩৪। বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধের সময় এই জেলা ১১নং সেক্টরের অন্তর্ভুক্ত ছিল। যার সেক্টর কমান্ডার ছিলেন মেজর তাহের। বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধের ঘোষণার পর ১৯৭১ সালের ২৭ই মার্চ রাতে স্থানীয় ইপিআর ক্যাম্পের কক্ষে ঢুকে স্থানীয় কিছু সংখ্যক যুবক প্রচুর পরিমাণে কার্তুজ এবং অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে আসে। ২৮ মার্চ সারাদিন পাকিস্তানি বাহিনী আর যুবকদের মধ্যে যুদ্ধ হয়।

ঐতিহাসিক ৭ই মার্চের ভাষণের পর থেকেই খাগডহর তৎকালীন ইপিআর ক্যাম্প সংগ্রামী ছাত্র-জনতা ঘেরাও করে এবং বাঙালি ইপিআর সদস্যদের সহায়তায় পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীকে পরাস্ত করে বিপুল পরিমাণ অস্ত্র ও গোলা-বারুদ উদ্ধার করে। এই যুদ্ধে ইপিআর সদস্য দেলোয়ার হোসেন এবং তৎকালীন জেলা প্রশাসকের ড্রাইভারের পুত্র আবু তাহের মুকুল শাহাদত্ বরণ করেন। মূলত এই যুদ্ধের পর পরই ময়মনসিংহের সীমান্ত এলাকায় অবস্থিত সীমান্তফাঁড়িগুলো বাঙালি বিডিআরদের নিয়ন্ত্রণে চলে আসে। নিহত পাক সেনাদের লাশ নিয়ে বিজয়মিছিল করতে থাকে ময়মনসিংহবাসী। এছাড়াও অন্যান্য পাক সেনাদের যথাযথ কর্তৃপক্ষের মাধ্যমে জেলখানায় প্রেরণ করা হয়। এমনিভাবে যুদ্ধ চলাকালে একদিন সকালে পুরাতন বিডিআর ভবনের তৃতীয় তলার ছাদে হাজার হাজার মানুষের 'জয় বাংলা' ধ্বনিতে বাংলাদেশের নকশাখচিত পতাকা উত্তোলন করেন সাবেক কমান্ডার জেলা মুক্তিযোদ্ধা সাংসদ মোঃ সেলিম সাজ্জাদ।

ময়মনসিংহে বিমান হামলা: পাক সেনারা মধুপুর ও গফরগাঁও হয়ে ময়মনসিংহের দিকে এগিয়ে এলে এই শহর জনমানবহীন হয়ে পড়ে। পরবর্তীতে পাক হানাদার বাহিনী বিমান বাহিনীর সহায়তায় ময়মনসিংহ শহরে প্রবেশের চেষ্টা চালালে ব্রহ্মপুত্র নদের উত্তর পার্শ্বে বাসস্ট্যান্ড সংলগ্ন এলাকা এবং চলাচলরত নৌযান ক্ষতিগ্রস্থ হয়। অতঃপর ময়মনসিংহ শহরের সড়ক পথে হালুয়াঘাট হয়ে কড়ইতলী সীমান্তে বিডিআর এবং ছাত্র জনতা একসাথে পানিহাটা মিশনের পশ্চিমে গারো পাহাড়ে হাইড আউট গড়ে তোলে। পরবর্তীতে এখান থেকেই সকল অপারেশন পরিচালনা করা হয়।

২৪ মে পাক সেনারা পানিহাটা আক্রমণ করলে ময়মনসিংহের কৃষ্টপুর এলাকার আব্দুল মতিন শহিদ হন। এভাবেই চলতে থাকে সশস্ত্র সংগ্রাম।

দিনটি ছিল ১০ই ডিসেম্বর, ১৯৭১। এই দিনে বারুদের গন্ধ থেকে মুক্তির স্বচ্ছ বাতাসে নিঃশ্বাস নিয়েছিল ময়মনসিংহবাসী। সেদিনই অধ্যক্ষ মতিউর রহমান এবং মিত্রবাহিনীর প্রধান বিগ্রেডিয়ার সনৎ শিবাজীর নেতৃত্বে মিত্র বাহিনীর সম্মিলিত দল বিজয় পতাকা উত্তোলন করেন।

নতুন প্রজন্মের কাছে মুক্তিযুদ্ধের চেতনাকে তুলে ধরতে ময়মনসিংহের সিটি কর্পোরেশন চায়না চত্বরে প্রতিষ্ঠিত করেছে জয় বাংলা চত্বর। এছাড়া ও বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে আছে বিমূর্ত মুক্তিযুদ্ধ নামক ভাস্কর্য। ময়মনসিংহে মুক্তিযুদ্ধের বীর শহীদদের স্মরণে নির্মিত হয়েছে একটি স্মৃতিসৌধ যা শহরের চীন মৈত্রী সেতুর কাছে অবস্থিত। এই স্মৃতিস্তম্ভের শীর্ষে রয়েছে একটি রাইফেল। রাইফেলের বেয়োনেটে আছে ফুটন্ত শাপলা। পরিশেষে বলতে চাই 'ও আমার দেশের মাটি, তোমার পরে ঠেকাই মাথা।' অনেক রক্তের বিনিময়ে আমরা পেয়েছি যে স্বাধীনতা, জীবন দিয়ে রক্ষা করব সেই স্বাধীনতার মান।

ময়মনসিংহে রবীন্দ্রনাথ

আফিয়া ইবনাত হাবিব (অপ্সরা)
শ্রেণি: ৬ষ্ঠ শাখা: ক, রোল: ২০০

কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ৬৪ বছর বয়সে ৫ দিনের সফরে ময়মনসিংহে আসেন ১৫ ফেব্রুয়ারি ১৯২৬ খ্রীষ্টাব্দ, ৩ ফাল্গুন, ১৩৩২ বঙ্গাব্দ। অমৃতবাজার পত্রিকা সংবাদে ১২ ফেব্রুয়ারি ১৯২৬ প্রকাশ 'ময়মনসিংহ শহরে রবীন্দ্রনাথের আগমন সম্ভাবনায় বিপুল উদ্দীপনা দেখা দেয়। আনন্দমোহন কলেজের অধ্যক্ষ ড. জে.সি ঘোষের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত বৈঠকে কবিকে যথাযথ সংবর্ধনা জ্ঞাপনের উদ্দেশ্যে সর্বশ্রেণির প্রতিনিধিত্বমূলক একটি অভ্যর্থনা সমিতি গঠিত হয়। মিউনিসিপ্যালিটি, জেলা বোর্ড ও অন্যান্য সামাজিক-সাংস্কৃতিক সংস্থা সংবর্ধনা জ্ঞাপন ও নানাবিধ অনুষ্ঠানের আয়োজনে ব্যস্ত।'

ঢাকায় কাজ শেষ করে ১৫ ফেব্রুয়ারি ১৯২৬ ট্রেনে রবীন্দ্রনাথ তাঁর সঙ্গীদেরসহ বিকাল ৪টায় ময়মনসিংহ রেলষ্টেশনে পৌঁছান। সেখানে উপস্থিত ছিলেন অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি মুক্তাগাছার জমিদার শশীকান্ত আচার্য চৌধুরী ও তাঁর সেক্রেটারি ময়মনসিংহ মিউনিসিপ্যালিটির চেয়ারম্যান ডাঃ বিপিন বিহারী সেনসহ সমিতির অন্যান্য সদস্য এবং শহরের অনেক বিশিষ্ট ব্যক্তি ও সম্ভ্রান্ত মহিলাগণ।

তাঁর সঙ্গে ছিলেন কবিপুত্র রথীন্দ্রনাথ ঠাকুর, পুত্রবধূ প্রতিমা দেবী, দীনেন্দ্রনাথ ঠাকুর, ইটালিয় অধ্যাপক জোসেফ তুচ্চি, অধ্যাপক কারলো যারমিকি, কবির ব্যক্তিগত সচিব হিরজিভাই মরিস, অধ্যাপক নেপাল চন্দ্র রায় ও কালীমোহন ঘোষসহ আরো কয়েকজন।

রেলস্টেশনে যথাযথ অভ্যর্থনার পর কবিকে সসম্মানে জমিদার (মহারাজা খেতাবে ভূষিত) শশীকান্ত আচার্যের 'আলেকজান্ডার ক্যাস্‌ল'-(বর্তমান রবীন্দ্র বটমূল রবীন্দ্রমঞ্চ) নিয়ে যাওয়া হয়। যথাবিধি বিশ্রামের পর সন্ধ্যা ছয়টায় টাউন হলে কবিকে সংবর্ধনা জানানো হয়। মিউনিসিপ্যালিটির চেয়ারম্যান ও সদস্যগণের পক্ষ থেকে প্রদত্ত অভিনন্দন পত্রের শিরোনাম 'বিশ্ববরেণ্য মহাকবি শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, ডি.লিট ,মহোদয়ের করকমলেষু'।

গভীর আবেগ ও ভক্তিপূর্ণ অভিনন্দন বাণীর জবাবে রবীন্দ্রনাথ প্রথমেই বলেন যে আরো আগে আসতে না পারার জন্য তিনি ক্ষমাপ্রার্থী। তিনি আরো বলেন, পূর্ববঙ্গের প্রতি তাঁর শ্রদ্ধা চিরদিন। 'পূর্ববঙ্গের শ্যামল ক্ষেত্রের মধ্যে বঙ্গমাতার একটি

পীঠস্থান আছে। দেশমাতার পূজাবেদীর সম্মুখে ঈর্ষা, অশুচি ও বিদ্বেষ জর্জরিত হইতেছে বলিয়া তাহার পরিপূর্ণতা আবরণ ভেদ করিয়া প্রকাশিত হইতেছে না।' রবীন্দ্রনাথ দেশবাসীকে দেশের সেই প্রকৃতরূপ দেখার জন্য আহ্বান করলেন। টাউন হলে রবীন্দ্রনাথের পূর্বোক্তি ভাষণের বক্তব্য আরো সুস্পষ্ট ভাষায় 'দ্য মুসলমান' পত্রিকায় (১৮ফেব্রুয়ারি) প্রকাশ পেয়েছে।

পরেরদিন (১৬ ফেব্রুয়ারি) সকালে স্থানীয় ব্রাহ্মমন্দিরে কবিকে অভিনন্দন জানানো হয়। উত্তরে কবি বলেন, 'আজকের দিনে যে বাণী সকলের চেয়ে আকাশ বাতাস পূর্ণ করে আছে, সে হচ্ছে মুক্তির বাণী। মানুষের ইতিহাস মুক্তির ইতিহাস।....জীবনের অর্থই হচ্ছে নিয়ত কর্মচেষ্টা। আকাঙ্ক্ষা দিয়ে তার অভিব্যক্তি যে পরিমাণ ত্যাগ করতে পারে সে সেই পরিমাণ ধন্য।'একই বক্তব্য Advice to students শিরোনামে The mussalman পত্রিকায় প্রকাশিত হয়।

একই দিনে বিকালে 'মুক্তাগাছার ত্রয়োদশী সম্মিলনীর পক্ষ থেকে রবীন্দ্রনাথকে ময়মনসিংহে আগমন উপলক্ষ্যে অভিনন্দন জানানো হয়। মুক্তাগাছার অন্যতম জমিদার সুবেন্দুনারায়ণ আচার্য চৌধুরীর ময়মনসিংহ শহরের বাড়িতে এ অনুষ্ঠান সম্পন্ন হয়। মহারাজা শশীকান্ত আচার্য ও মুক্তাগাছার জমিদার সদস্যগণসহ বিশিষ্ট ব্যক্তিগণ ওই সভায় উপস্থিত ছিলেন।

পরদিন (১৭ই ফেব্রুয়ারি) বিকালে ময়মনসিংহ শহরের জনসাধারণ ও স্থানীয় সাহিত্যসভার পক্ষ থেকে কবিকে সংবর্ধনা জানানো হয়। জবাবে কবি যা বলেন তার মর্মার্থ হলো দেশের প্রতিটি মানুষের দেশসেবার মাধ্যমে জাতীয় ঐক্য ও সংহতি সাধিত হয়। জাতীয় কল্যাণ শুধু ফাঁকা বক্তৃতায় অর্জিত হয় না। এজন্য দরকার গ্রামে যাওয়া, যেখানে দারিদ্র্য অজ্ঞতা ও ব্যধির বিরুদ্ধে লড়াইয়ে অংশগ্রহণ করা।

একই দিনে (১৭ ফেব্রুয়ারি) স্থানীয় আনন্দমোহন কলেজের ছাত্র ও শিক্ষকগণ কবিকে সংবর্ধনা জানান। জবাবে রবীন্দ্রনাথ শিক্ষা বিষয়ক তার বহুকথিত বক্তব্যই নতুন করে উপস্থাপন করেন। দীর্ঘ বক্তৃতায় তিনি বলেন, 'জ্ঞান আমাদের অন্তর উদ্বোধিত করেনি, জ্ঞান হয়ে উঠেছে বোঝা' দেশকে জানতে হবে, চিনতে হবে জ্ঞানের দ্বারা, তথ্যের দ্বারা। চিন্তার দৈন্য, চিত্তের দৈন্য আমাদের মধ্যে বড় হয়ে উঠেছে। কবির এ ভাষণ আনন্দবাজার, অমৃতবাজার, দ্য মুসলমান, দ্য বেঙ্গলী পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। শিক্ষার্থী ও শিক্ষকবৃন্দ আন্তরিক উৎসাহ ও উদ্দীপনায় বিশ্ব ভারতীয় আদর্শ ও কর্মসূচির প্রতি শ্রদ্ধা নিদর্শন স্বরূপ ৬২৫ টাকার একটি তোড়া প্রদান করেন। রবীন্দ্রনাথ এরপর (১৮ ফেব্রুয়ারি) স্বনামখ্যাত 'বিদ্যাময়ী গার্লস স্কুল' ও 'সিটি স্কুল'-এ যান এবং যথাক্রমে স্কুলের ছাত্রী ও ছাত্রদের উদ্দেশ্যে বক্তৃতা দেন। গোপালচন্দ্র রায়ের মতে 'সিটি স্কুলে সেখানকার ছাত্ররা এবং জেলা স্কুলের ছাত্ররা কবিকে মানপত্র দেয়'। কিন্তু 'রবীন্দ্র জীবনীতে' এ বিষয়ে কোনো উল্লেখ নেই। একই দিনে ময়মনসিংহের নারী সমাজের পক্ষ থেকে স্থানীয় মহিলা সমিতি কবিকে অভিনন্দন জানিয়ে যে মানপত্র দেয় তার শিরোনাম 'চিরবরেণ্য বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথের চরণকমলে'। মহিলা সমিতির অভিনন্দনের উত্তরে রবীন্দ্রনাথ বলেন, 'সকল মঙ্গলকর্ম মেয়েদের দ্বারাই হয়। মাতৃভাষার যথার্থ যে বাণী তা মেয়েদের কাছে যেমন সত্য হয়ে পৌঁছায়, এমন আর কোথাও নয়। কর্মক্ষেত্রে কেবল পুরুষেরই যে স্থান আছে তা নয়, মেয়েদেরও সেখানে স্থান আছে। পল্লীর সেবাতে আজ পুরুষ-মেয়ে কর্মক্ষেত্রে একত্রে মিলিত হোক, এই আমি আশা করে রয়েছি'। উল্লেখ্য যে ময়মনসিংহ সফরে মিউনিসিপ্যালিটি, জনসাধারণ ও আনন্দমোহন কলেজের ছাত্রদের সংবর্ধনার জবাবে প্রদত্ত কবির বক্তব্য প্রবাসী পত্রিকায় স্বতন্ত্রভাবে ছাপা হয়। ১৯ ফেব্রুয়ারি, ১৯২৬ সকালে রবীন্দ্রনাথ শান্তি নিকেতনের প্রাক্তন ছাত্র আঠারবাড়ির জমিদার প্রমোদ চন্দ্র রায় চৌধুরীর আমন্ত্রণে তার আতিথ্য গ্রহণ করেন। পনেরো থেকে আঠার ফেব্রুয়ারি চারদিন ময়মনসিংহ শহরে রাজ আতিথ্যে ব্যস্ত সময় কাটিয়ে তাঁর ছাত্রের আপ্যায়নে তাঁর গৃহে যান এবং নবনির্মিত প্রাসাদোপম অট্টালিকার দ্বার উন্মোচন করেন। ময়মনসিংহ থেকে ট্রেনে আঠারোবাড়ি পৌঁছালে কবিকে অভ্যর্থনা জানাতে জমিদার প্রমোদ চন্দ্র ও তার এস্টেটের কর্মকর্তা ছাড়াও স্টেশনে উপস্থিত ছিলেন ময়মনসিংহ বার লাইব্রেরির সভাপতি দীননাথ চৌধুরীসহ বহু গণ্যমান্য ব্যক্তি। স্টেশনের বাইরে কয়েক হাজার লোক উপস্থিত হয়ে কবিকে বিপুল সংবর্ধনা জানান। স্টেশন থেকে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে শঙ্খধ্বনি করে হস্তী সমন্বিত শোভাযাত্রাসহ নতুন রাজ প্রাসাদ দ্বারে নিয়ে যাওয়া হয়। সেখানে সোনার চাবি দিয়ে তিনি নতুন প্রাসাদের তোরণ উন্মোচন করেন।

ঈশান দে
শ্রেণি: ৭ম, শাখা: ক, রোল: ২২৭

সংস্কৃতিবান্ধব শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান ও আমার অর্জন

প্রত্যেক মানুষের জীবনেই থাকে একটি লক্ষ্য পূরণের পাশাপাশি কিছু ভালো লাগার বিষয়। মানুষ মাত্রই সফল হতে চায়, সুখী হতে চায়, সচ্ছল জীবনযাত্রা চায়, ডাক্তার বা ইঞ্জিনিয়ার হতে চায়। আমারও এমন স্বপ্ন রয়েছে ঢের। এ সমস্ত কিছুর পাশাপাশি আমাকে আরো একটি স্বপ্ন ভীষণভাবে ঘিরে থাকে, আর তা হচ্ছে সুরের সাধনা। আমার বাউল মন শুধু সুরের মূর্ছনায় বিভোর হয়ে থাকে। সব মানুষের জীবনে কিছু ভালোলাগা ছুঁয়ে যায়। লেখাপড়ার পাশাপাশি খেলাধুলা, গল্প কবিতা লিখতে বা পাঠ করতে চাওয়া, বৃক্ষরোপণ, পশুপালন ইত্যাদি। এ সমস্ত কিছুর বাইরে আমাকে ভীষণভাবে আকৃষ্ট করে সংগীত। সুরের সাধনায় আমি মগ্ন হয়ে যাই প্রতিনিয়ত। আমার জীবনে সংগীতের অনুপ্রবেশ হয়ে ছিল সংস্কৃতি মনা বাবা-মার হাত ধরেই। স্কুল জীবনের শুরুতেই আমি আরো অনুপ্রাণিত হই। ২০১৫ সালে নার্সারি শ্রেণিতে আমার প্রিয় শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান ক্যান্টনমেন্ট পাবলিক স্কুল এন্ড কলেজ মোমেনশাহীতে ভর্তি হই। তখন আমি ওভাবে গান শেখা শুরু করিনি। মজার বিষয় হলো ভর্তির প্রাথমিক বাছাই পর্বে আমাকে উপাধ্যক্ষ স্যার জিজ্ঞেস করেছিলেন তুমি কি গান গাইতে জানো? আমি বলেছিলাম হ্যাঁ। আসলে তখন আমি গান শিখিনি। বাসায় সাউন্ড সিস্টেমে সবসময় পুরনো দিনের গান বাজতো, সেগুলো শুনে শুনে একটি গানের কয়েকটি কথা মুখস্থ করে ফেলেছিলাম। স্যার বললেন ঠিক আছে আমাদেরকে একটি গান শোনাও। আমিও শুরু করে দিলাম হেমন্ত মুখোপাধ্যায় স্যারের গাওয়া সেই কালজয়ী গান 'কাটেনা সময় যখন আর কিছুতে, বন্ধুর টেলিফোনে মন বসে না, জানালার গ্রিলটাতে ঠেকাই মাথা, মনে হয় বাবা যেন ডাকছে আমায়, আয় খুকু আয় আয় খুকু আয়;'

অস্পষ্ট স্বরে দু তিনটে লাইন গাইতে পেরেছিলাম। সে সময় বাছাই পর্বে উপস্থিত ছিলেন সদ্য বিদায়ী প্রিন্সিপাল স্যার লেফটেন্যান্ট কর্নেল মোঃ লুৎফর রহমান স্যার এবং সদ্য যোগদান করা প্রিন্সিপাল স্যার লেফটেন্যান্ট কর্নেল শহিদুল হাসান স্যার। আমার গান শুনে প্রিন্সিপাল স্যার দুজনই আমাকে অনেক আদর করলেন এবং কোলে নিয়ে চকলেট দিলেন। আমার কাছে মনে হয়েছিল চকলেটটা আমার গানের প্রথম পাওয়া পুরস্কার। সেই স্মৃতিময় দিন থেকেই হল সংগীত শিক্ষার পদচারণা এবং ধারাবাহিকভাবে আসতে থাকলো সাফল্য। স্কুলের সংস্কৃতিবান্ধব পরিবেশ সুসজ্জিত এবং সুবিশাল অডিটোরিয়ামে বিভিন্ন সময় আমাদেরকে নিপুণভাবে অনুশীলন করিয়েছেন আমাদের কালচারাল শিক্ষকমণ্ডলী। আমি তাঁদের কাছে চিরঋণী। আন্তঃহাউস সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতা ২০১৬ আমার জীবনের প্রথম কোনো প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করা এবং সেই প্রতিযোগিতায় ছড়াগান গেয়ে প্রথম স্থান অর্জন করা।

সেই থেকে এ বিষয়টির প্রতি আমার বাবা-মা একটু গুরুত্ব দিতে থাকলেন। আমি নিয়মিত সাধনা করতে থাকি, ২০১৬-২০২৩ ও ২০২৩ সালের বিভিন্ন সময় স্কুলের হয়ে বিভিন্ন প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করেছি এবং প্রতিবারই সাফল্য অর্জনে সমর্থ হয়েছি। যখনই কোনো প্রতিযোগিতা করতে গিয়েছি আমি আমার মাঝে আমার স্কুলের সম্মান রক্ষার চেতনাকে ধারণ করেছি আর যখন সাফল্য পেয়েছি তখন আমার স্কুলের ইউনিফর্ম সবার সামনে তুলে ধরার আনন্দে আত্মহারা হয়েছি। বিজয়ের আনন্দে কখনো চিৎকার দিয়েছি আবার কখনো আনন্দে কেঁদে ফেলেছি। গর্বে মনটা ভরে যেত যখন আমার নামের সাথে আমার স্কুলের নাম উচ্চারিত হতো।

আমি ২০১৯ সালে 'বঙ্গবন্ধু শিশু-কিশোর পদক' জাতীয় পুরস্কার অর্জন করেছি। সে বছরই উচ্চাঙ্গ সংগীতে বিভাগীয় চ্যাম্পিয়ন হয়েছি। ২০২২ সালে আর টিভিতে সম্প্রচারিত এক রিয়েলিটি শোতে অংশগ্রহণ করি, 'টফিস্টার সার্চ' ট্যালেন্ট হান্ট প্রতিযোগিতায় সারাদেশের বিভিন্ন মেধাবী প্রতিযোগিদের সাথে প্রতিযোগিতা করে জাতীয়ভাবে ফার্স্ট রানার আপ হয়েছি এবং অনেক বড় পুরস্কার অর্জন করি। এই অর্জনের পর আমার প্রিয় অধ্যক্ষ লে: কর্নেল শামীম আহমেদ স্যার আমাকে শুভেচ্ছা সহ মহামূল্যবান উপহার তুলে দিয়েছিলেন। স্যারের কাছ থেকে পাওয়া উপহার যেন আমাকে জাতীয় পুরস্কারের থেকেও অনেক বেশি আনন্দ দিয়েছিল। করোনা মহামারীর প্রকোপের কারণে ২০২০-২১ সালের জাতীয় শিশু পুরস্কার প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয় ২০২২ সালের ডিসেম্বরে আর সেই প্রতিযোগিতায় আমি সারা বাংলাদেশে 'ক' গ্রুপে উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতে প্রথম স্থান অধিকার করে স্বর্ণপদক অর্জন করি। মহামান্য রাষ্ট্রপতি আব্দুল হামিদ মহোদয়ের উপস্থিতিতে পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের প্রতিমন্ত্রী ফজিলাতুন নেসা এম,পি মহোদয় আমার হাতে স্বর্ণপদক তুলে দেন। জাতীয় পুরস্কার পাওয়ার আনন্দে তখন আমার চোখ ছলছলে। সে সময়কার অনুভূতি বলে বোঝানোর মত নয়। এছাড়াও উপজেলা, জেলা ও বিভাগীয় পর্যায়ে স্কুলের হয়ে প্রতিনিধিত্ব করে সংগীতের বিভিন্ন বিষয়ে অন্তত ২৩ টি প্রথম পুরস্কার অর্জন করেছি। স্থানীয় বিভিন্ন প্রতিযোগিতায় আরো অন্তত ৩৫ টিরও অধিক সনদ ও প্রথম স্থান পুরস্কার অর্জন করেছি। ২০২২ সালে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধুকে নিয়ে আমার একটি মৌলিক গান প্রকাশিত হয়েছে। অ্যালবাম 'হৃদস্পন্দনে মুজিব'। পরবর্তীতে গানটি বৈশাখী টিভিতেও সম্প্রচারিত হয়েছে। এ পর্যন্ত আমার পাঁচটি মৌলিক গান রেকর্ড হয়েছে। বর্তমানেও কয়েকটি গান রেকর্ডের প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। পাশাপাশি আমি দেশ এবং দেশের বাইরের বিভিন্ন অনলাইন যেমন ফেসবুক বা ইউটিউব এর বিভিন্ন লাইভ অনুষ্ঠানে গান গাওয়ার মধ্য দিয়ে মানুষের ভালোলাগায় স্থান পেয়েছি। অনেক মানুষের ভালোবাসা ও আশীর্বাদের অনেক উপহারও পেয়েছি। আমি সরাসরি দেশের বিভিন্ন মন্ত্রী, প্রতিমন্ত্রীসহ দেশের অনেক সম্মানিত ব্যক্তিবর্গের হাত থেকে পুরস্কার গ্রহণ করেছি। এ অনুভূতি আমার কাছে যে কী আনন্দের তা বলে বোঝানো যাবে না। আমি চাই আমার স্কুলের শিক্ষার্থীরা যেন সংগীত সাধনা করে ভবিষ্যতে আমার মতোই স্কুলের হয়ে বিভিন্ন প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করে সাফল্য অর্জন করে।

যে কথাগুলো না বললেই নয়, আমার এই অর্জনের পেছনে সবচেয় বড় অবদান আমার শ্রদ্ধেয় অধ্যক্ষ ও শিক্ষকমণ্ডলীর সহযোগিতা আর আমার প্রিয় শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের সাংস্কৃতিবান্ধব পরিবেশ। আমার স্কুলের শ্রদ্ধেয় শিক্ষকমণ্ডলীর প্রতি আমি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি এবং সেই সাথে আমার সংগীত গুরুদের প্রতি, যাঁদের প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ অবদানে আমি এ পথ পাড়ি দিচ্ছি তাদের সকলের প্রতি আমি শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করছি।

এবার আসি আমার শ্রদ্ধেয় প্রত্যক্ষ সঙ্গীতগুরুদের প্রসঙ্গে। মাত্র পাঁচ বছর বয়সে সংগীত জীবনে আমার হাতেখড়ি হয়েছিল আমার শ্রদ্ধেয় পিসিমণি সাথী দাস এর হাত ধরে। এরপর থেকে সংগীতের প্রতি এক অজানা আকর্ষণ বোধ করতে থাকি। পরবর্তীতে উনি আমাকে নিয়ে যান আমার শ্রদ্ধেয় গুরুজি ওস্তাদ চয়ন স্যারের নিকট। ওস্তাদ চয়ন সেন স্যারের সান্নিধ্যে আসার পর থেকে আমার জোরালোভাবে চলতে থাকে সংগীত সাধনা। এর কিছুদিন পরেই বাবা-মা আমাকে শাস্ত্রীয় সংগীত শেখানোর প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করেন আর শাস্ত্রীয় গুরুজী হিসেবে পেয়ে যাই ক্যান্টনমেন্ট পাবলিক স্কুল এন্ড কলেজ মোমেনশাহী এর কলেজ শাখার প্রাক্তন ছাত্র মামুনুল ইসলাম রনি স্যার কে। উনি কাজী নজরুল ইসলাম বিশ্ববিদ্যালয় হতে সংগীতে স্নাতক ও স্নাতকোত্তর ডিগ্রি লাভ করেন এবং বর্তমানে একই বিশ্ববিদ্যালয় এম, ফিল গবেষণারত আছেন। বিনম্র শ্রদ্ধা জানাই আমার গুরুজীদের প্রতি।

পরিশেষে বলতে চাই এ সমস্ত অর্জনের জন্য ধৈর্যসহ অনুশীলনের পাশাপাশি আমাকে অনেক ত্যাগও স্বীকার করতে হয়েছে। বর্জন করতে হয়েছে অনেক পছন্দের ঠাণ্ডা জাতীয় খাবারও। যেমন আইসক্রিম। তাই আমার যারা অনুজ তাদের প্রতি আমার পরামর্শ রইলো এই যদি সংগীত সাধনায় নিজেকে নিয়োজিত করতে চাও, তাহলে নিয়মিত অন্ততপক্ষে দুবেলা কণ্ঠ সাধন করতে হবে এবং ঠাণ্ডা জাতীয় খাবার পরিহার করে চলতে হবে। নিয়ম মেনে সাধনা করলে অবশ্যই তোমরাও পারবে আমাদের প্রিয় প্রতিষ্ঠানের হয়ে দেশের বিভিন্ন প্রতিযোগিতায় বিজয় ছিনিয়ে আনতে। লেখাড়ার পাশাপাশি একজন শিক্ষার্থীর সংস্কৃতিমনা হওয়া খুব জরুরী বিষয়।

পরিশ্রমই সাফল্য আনে

মিথিলা দেবনাথ হিয়া
শ্রেণি: ৭ম, শাখা: ক, রোল: ১২৩

প্রত্যেক মানুষই জীবনে সাফল্য পেতে চায়, নিজের কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্যে পৌঁছাতে চায়। সব মানুষের মতো আমিও এর ব্যতিক্রম নই। তাই নিজের ভবিষ্যৎ লক্ষ্য অর্জনের প্রবল আকাঙ্ক্ষা ও অনেক বিশ্বাস নিয়ে মা-বাবার হাত ধরে যেদিন এসেছিলাম ক্যান্টনমেন্ট পাবলিক স্কুল এন্ড কলেজ মোমেনশাহী প্রাঙ্গণে, সেদিন এর পারিপার্শ্বিক অবস্থান দেখে নিজের ছোট মনে অজান্তেই এঁকে ফেলেছিলাম একটা স্বপ্ন, আমি বড় হতে চাই। কিন্তু পারবো তো? সেই স্বপ্ন হৃদয়ে ধারণ করে এগিয়ে চলছি। জানিনা এর শেষ কোথায়। তবে থেমে যাব না, এ আমার দৃঢ় প্রতিজ্ঞা। ছোটবেলায় শুনেছি জীবনে লক্ষ্য অর্জন করতে হলে প্রথমে যেতে হবে বিদ্যালয়ে। কারণ বিদ্যালয় থেকেই সাফল্য লাভের সব গুণাবলী এবং জ্ঞানের বিকাশ হয়। স্কুলে ভর্তি হওয়ার পর থেকে পেয়েছি শিক্ষকদের স্নেহ, ভালোবাসা ও অনুপ্রেরণা। স্কুলের যে কোনো ধরনের কাজে যথাসাধ্য অংশগ্রহণ করার চেষ্টা করেছি। যেমন সমাবেশে গীতাপাঠ, কখনও বা সমবেতভাবে জাতীয় সংগীত পরিবেশন এবং বিভিন্ন সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করার সুযোগ পাওয়ায় আমি সবার কাছেই একটি পরিচিত মুখ। এ আমার পরম পাওয়া।

আমি যখন গানের কিছুই বুঝতাম না, তখন দিদির সঙ্গীত শিক্ষক বাসায় এসে গান শেখাতেন। আমি দিদির পাশে বসেই দিদির সাথে সার্গাম গীত গাইতাম। আমি দিদির প্রায় সমস্ত সার্গামগুলি মুখস্থ করে ফেলেছিলাম। আমার এমন আগ্রহ দেখে আমার বাবা আমাকেও সঙ্গীত শিক্ষকের কাছে ভর্তি করে

দিলেন। তখন আমার বয়স ৪ বছর। এভাবেই আমার সঙ্গীত জীবন শুরু হয়। কেজিতে পড়ার সময় স্কুলের একটি সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে আমি একক গান পরিবেশনের সুযোগ পেয়েছিলাম। এটা আমার হৃদয়ে এখনও অন্য রকম অনুভূতির সৃষ্টি করে। সঙ্গীতকে আমি মন-প্রাণ উজাড় করে ভালোবাসি। আমি বিভিন্ন প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করি, অন্যান্য স্কুলের শিক্ষার্থীদের সাথে নিজ প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধি হয়ে। সে সব ক্ষেত্রে বরাবরই ভলো ফলাফল অর্জন করি।

২০১৯ বঙ্গবন্ধু শিশু-কিশোর প্রতিযোগিতায় বঙ্গবন্ধুকে নিয়ে গানে 'ক' বিভাগে জাতীয় পর্যায়ে **১ম** স্থান অর্জন করি। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার কাছ থেকে পুরস্কার গ্রহণের কথা ছিল; কিন্তু মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বিদেশে চলে যাওয়ায় প্রধান বিচারপতির নিকট হতে পুরস্কার গ্রহণ করি। তখন আমি, তৃতীয় শ্রেণির শিক্ষার্থী। এ অর্জন আমার ভেতরের আত্মবিশ্বাসকে বহগুণ বাড়িয়ে দেয়।

২০২০ সালে জাতীয় শিশু পুরস্কার প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করে দেশাত্মবোধক গানে 'ক' বিভাগে জাতীয় পর্যায়ে প্রথম স্থান অর্জন করি। পুরস্কার প্রদান করেন মহামান্য রাষ্ট্রপতি। লটারির মাধ্যমে **১২** জন প্রথম স্থান অর্জনকারীকে মনোনীত করা হয়েছিল। অন্যান্য সকলে মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রনালয়ের প্রতিমন্ত্রীর নিকট হতে পুরস্কার গ্রহণ করি।

উক্ত পুরস্কার বিতরণ ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে বিজয়ীদের মধ্য থেকে ২০ জন প্রতিযোগী অংশগ্রহণের সুযোগ পেয়েছিল। তার মধ্যে আমিও একজন। এটা আমার পরম পাওয়া। উক্ত সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে আমার অনেক স্মৃতি জড়িয়ে আছে। পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানের আগে আমাদের কাছে হঠাৎ করে শিশু একাডেমি থেকে ফোন আসে। ফোনে বলা হয় যে আমি উক্ত অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণের সুযোগ পেয়েছি। এর পর আমি অনুষ্ঠানের ৫ দিন আগে ঢাকায় আসি। শিশু একাডেমির মহাপরিচালক আনজির লিটন মহোদয়ের কথায় ও আশরাফ বাবু এর সুরে মেট্রোরেল নিয়ে একটি গান ও কয়েকটি দেশাত্মবোধক গানের স্থায়ী আমরা রেকর্ড করি। এটি আমার জীবনের অন্যরকম অভিজ্ঞতা। রাত প্রায় ১:৩০ মিনিট পর্যন্ত আমাদের কখনও এককভাবে ও কখনও সমবেতভাবে রেকর্ড করা হয়, যে গানগুলো আমরা সকলে পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে উপস্থাপন করি। এখানে আমরা শিশু একাডেমির মহাপরিচালক এর অনেক জ্ঞানমূলক উপদেশ লাভ করি যা আমাদের জীবনে স্মৃতি হয়ে আছে।

বিভিন্ন সময় বিভিন্ন প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ ও সাফল্য লাভ করি। একাধিকবার পুরস্কার গ্রহণ করেছি মন্ত্রী, বিভাগীয় কমিশনার, জেলা প্রশাসক ও সম্মানিত ব্যক্তি বর্গের হাত থেকে, যা সত্যিই আনন্দের ও গৌরবের। উপজেলা, জেলা বিভাগীয় ও জাতীয় পর্যায়ে বিভিন্ন প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করতে গিয়ে সান্নিধ্য লাভ করেছি অনেক গুণী সঙ্গীত শিল্পীর, যারা বিচারকের আসনে ছিলেন। তাঁদের কাছ থেকে অনেক কিছু শিখতে পেরেছি ও তাঁদের আর্শীবাদ লাভ করেছি।

অনেকেই বলে থাকেন পড়াশোনার বাইরে অন্যান্য কার্যক্রমে অংশগ্রহণ করলে লেখাপড়ার ক্ষতি হয়। আমি এটা মনে করি না। এ ধারণার কোনো ভিত্তি নেই। বরং আছে নিজেকে দাবিয়ে রাখার মত দুর্বল মানসিকতা। পড়াশোনার পাশাপাশি সব ধরনের কাজের সাথেই নিজেকে জড়িয়ে রেখেছি। তবে তা পড়াশোনার ক্ষতি করে নয় বরং চেষ্টা করছি সবকিছু সমান তালে এগিয়ে নিতে। সকলের দোয়া ও অনুপ্রেরণায় এবং মহান সৃষ্টিকর্তার অশেষ কৃপায় সফলতার স্পর্শ পেয়েছি সব সময়। আমি বিশ্বাস করি শিক্ষা মানে শুধু বইয়ের পাতায় সঞ্চিত থাকা জ্ঞানকে অর্জন করা নয়। এবং জীবনের প্রতিটি পদক্ষেপ থেকেই শিক্ষা অর্জন করা যায়। এই বিশ্বাস নিয়েই এগিয়ে চলেছি। জীবনের বাকি সময় এই বিশ্বাস নিয়ে এগিয়ে যেতে চাই দূরে আরও বহুদূরে।

শিক্ষা উন্নয়নে বাংলাদেশ সেনাবাহিনী

ফারিয়া শারমীন (স্বর্ণালী)
শ্রেণি: দ্বাদশ, শাখা: বি, রোল: ২৪৭

"সমরে আমরা, শান্তিতে আমরা, সর্বত্র আমরা দেশের তরে" এই মূলমন্ত্রকে ধারণ করে পরিচালিত হচ্ছে বাংলাদেশ সেনাবাহিনী। আপসহীন ও রক্তক্ষয়ী মহান মুক্তিযুদ্ধের মধ্য দিয়ে জন্ম লাভ করেছে। আমাদের সেনাবাহিনী মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় উজ্জীবিত। বাংলাদেশ সেনাবাহিনী আমাদের গর্ব, সবার অহংকার।

বাংলাদেশের উন্নয়নে সেনা বাহিনীর অবদান গুরুত্বপূর্ণ। শিক্ষা ক্ষেত্রেও রয়েছে সেনাবাহিনীর ঈর্ষণীয় সফলতা। মানসম্মত শিক্ষা বিস্তারে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে বাংলাদেশ সেনাবাহিনী। সেনা সদস্যদের পেশাগত প্রশিক্ষণের জন্য বিভিন্ন প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানের পাশাপাশি বর্তমানে সেনাবাহিনী কর্তৃক ৩৯টি ক্যান্টনমেন্ট পাবলিক স্কুল ও কলেজ, ১২টি ক্যাডেট কলেজ এবং ১৬টি ইংলিশ মিডিয়াম স্কুল ও কলেজ রয়েছে। এসব শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থীরা দেশের মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষাসমূহে শীর্ষস্থান বজায় রাখছে। পিইসিই, জেএসসি, এসএসসি ও এইচএসসি পরীক্ষার ফলাফলে সেনাবাহিনী কর্তৃক পরিচালিত প্রতিষ্ঠানগুলোতে পড়ার সুযোগ পেলে প্রাইভেট শিক্ষা ও কোচিংয়ের পিছনেও ছুটতে হয় না। এসব শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের মধ্যে সবচেয়ে আলোচিত প্রতিষ্ঠান হচ্ছে ক্যাডেট কলেজ। বর্তমানে আমাদের দেশে ১২টি ক্যাডেট কলেজ রয়েছে। যেখানে সীমিত সংখ্যক শিক্ষার্থী অধ্যয়নের সুযোগ পায়। যেখানে একটি বিশেষ পরিবেশে একাডেমিক শিক্ষার পাশাপাশি বিভিন্ন প্রশিক্ষণেরও সুযোগ পায় এসব শিক্ষার্থী।

উচ্চ পর্যায়ের শিক্ষার জন্য সবচেয়ে আলোচিত প্রতিষ্ঠান হচ্ছে বাংলাদেশ ইউনিভার্সিটি অফ প্রফেশনাল্স (BUP)। একবিংশ শতাব্দীর চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় উদ্ভাবনী ক্ষমতাসম্পন্ন দক্ষ মানবসম্পদ তৈরির লক্ষ্য নিয়ে বাংলাদেশ ইউনিভার্সিটি অফ প্রফেশনাল্স ২০০৯ সালের ৮ এপ্রিল দেশের ৩৯ তম পাবলিক ইউনিভার্সিটি হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে। আমাদের জাতীয় নিরাপত্তা, যুদ্ধ কৌশল, মেডিকেল, প্রকৌশল ও তথ্য প্রযুক্তি এবং বিজনেস স্টাডিসহ অন্য বিষয়েও BUP উচ্চশিক্ষা ও গবেষণা কার্যক্রম চালিয়ে যাচ্ছে। এছাড়াও বিজ্ঞান প্রকৌশল প্রযুক্তিবিদ্যার পারদর্শিতা অর্জনের লক্ষ্যে ১৯৯৮ সালে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা "মিলিটারি ইনস্টিটিউট অব সাইন্স এন্ড টেকনোলজি" শুভ উদ্বোধন করেন। বর্তমানে ২৫৩৭ জন শিক্ষার্থী সেখানে অধ্যয়নরত আছে। এছাড়াও বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন শিশুদের শিক্ষাগত যোগ্যতা বিকাশের লক্ষ্যে সেনাবাহিনী প্রতিষ্ঠা করে 'প্রয়াস'। এখানে শিশুর শারীরিক বিকাশ, মানসিক বিকাশ, থেরাপিউটিক সেবা মনোবৈজ্ঞানিক টেস্ট, অডিওলজি টেস্ট, ইইজি পরীক্ষাসহ শিশুর বাক, শ্রবণ ও যোগাযোগ ক্ষমতা পরিমাপ করে শিশুর ও শিশুর অভিভাবকদের প্রশিক্ষণ কাউন্সেলিং বিষয়ে পরামর্শ দেওয়া হয়।

সাধারনত সুশৃঙ্খল জীবন ও নিয়ম কানুনের জন্যেই এসব প্রতিষ্ঠানের আকাশ ছোঁয়া সাফল্য। বাংলাদেশ শিক্ষা উন্নয়ন ও সম্প্রসারণে জাতির পিতা কর্তৃক গৃহীত পদক্ষেপের ধারাবাহিকতা বর্তমান প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা সরকারের সময়কালে অব্যাহত, যা সেনাবাহিনী কর্তৃক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলো সাক্ষ্য দিচ্ছে।

বাংলাদেশ সেনাবাহিনী আমাদের গর্ব

পুস্পিতা আনজুম নাজিফা
শ্রেণি: দ্বাদশ, শাখা: বি, রোল: ২৫৩

বাংলাদেশ সেনাবাহিনী আমাদের গৌরব ও জাতীয় ঐক্যের প্রতীক, 'সমরে আমরা শান্তিতে আমরা সর্বত্র আমরা দেশের তরে'-এ মূলমন্ত্র ধারণ করে বাংলাদেশ সেনাবাহিনী এগিয়ে যাচ্ছে। বাংলাদেশ সেনাবাহিনী ১৯৭১ সালে যুদ্ধ চলাকালে প্রতিষ্ঠিত হয়। প্রাথমিকভাবে ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্ট এর বাঙালি সৈন্য ও অফিসার এবং পাকিস্তান সেনাবাহিনীর অন্যান্য অংশ হতে যারা স্বাধীনতা যুদ্ধে যোগ দিয়েছিলেন, তাদের সমন্বয়ে এই বাহিনী গঠিত হয়। এই নতুন বাহিনী তিনটি ব্রিগেডে বিভক্ত ছিল।

কে ফোর্স - অধিনায়ক ছিলেন খালেদ মোশারফ এবং এটি গঠিত হয়েছিল ৪র্থ, ৯ম এবং ১০ম ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্ট নিয়ে।

এস ফোর্স- অধিনায়ক ছিলেন মেজর শফিউল্লাহ এবং এটি গঠিত হয় ২য় এবং ১১শ ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্ট নিয়ে ১৯৭১ সালের অক্টোবর মাসে।

জেড ফোর্স- অধিনায়ক ছিলেন মেজর জিয়াউর রহমান এবং এটি গঠিত হয় ১ম, ৩য় এবং ৮ম ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্ট নিয়ে।

১৯৭১ সালের ২৬ ডিসেম্বর পাকিস্তানি সেনা বাহিনীর বাঙালি সেনা ও মুক্তিবাহিনীর সদস্য নিয়ে সেনাবাহিনী গঠন করা হয়। বর্তমানে এই বাহিনীর সামর্থ্য প্রায় ২,০০,০০০ সদস্য, যাদের ৫০,০০০ প্রাক অবসরে (LPR) আছেন। বাংলাদেশ সেনাবাহিনী জাতিসংঘের UNPSO (United Nation Peace Support Operation) এর সাথে সক্রিয়ভাবে জড়িত। ১৯৯১ সালের ১ম উপসাগরীয় যুদ্ধ চলাকালে বাংলাদেশের ২১৯৩ জন সেনাবাহিনীর একটি দলকে সৌদি আরব এবং কুয়েত এর শান্তি রক্ষা কাজের পর্যবেক্ষক হিসেবে প্রেরণ করা হয়। পরবর্তীতে, বাংলাদেশ সেনাবাহিনী শান্তি রক্ষা কাজে অংশ গ্রহণ করে নামিবিয়া, কম্বোডিয়া, সোমালি, উগান্ডা/ রুয়ান্ডা, মোজাম্বিক, প্রাক্তন ইয়োগোস্লাভিয়া, লাইবেরিয়া, হাইতি, তাজিকিস্তান, পশ্চিম সাহারা, সিয়েরা লিয়ন, কসোভা, জর্জিয়া, পূর্ব তিমুর কঙ্গো, আইভরি কোস্ট ও ইথিওপিয়া। ২০০৬ এর এপ্রিল মাস থেকে বাংলাদেশের প্রায় ৯,৫০০ সৈন্য সারা বিশ্বে জাতিসংঘ শান্তি রক্ষী বাহিনীতে কর্মরত আছে, যা অন্য কোনো দেশের তুলনায় সর্বাধিক এবং তারা বাংলাদেশী শান্তিরক্ষী সদস্য হিসেবে সুনামের সাথে কাজ করে যাচ্ছে। ১৯৮৮ সাল থেকে সেনাবাহিনী, ১৯৯৩ সালে নৌ ও বিমানবাহিনী এবং ১৯৮৯ সালে পুলিশবাহিনীর সদস্যরা শান্তিরক্ষী পরিবারের সদস্য হন। জাতিসংঘের ৬৮টি মিশনের ৫৪টিতেই বাংলাদেশী শান্তিরক্ষীরা অত্যন্ত সুনামের সাথে কাজ করে যাচ্ছে। এছাড়াও যেকোনো দুর্যোগেই সেটা প্রাকৃতিক কিংবা মানুষসৃষ্ট হোক সেসব দুর্যোগে এখনও জনগণের আস্থা ও ভরসার নাম সেনাবাহিনী। তাদের অক্লান্ত পরিশ্রমের মাধ্যমেই আমরা স্বাধীনভাবে নিরাপত্তার সাথে বসবাস করতে পারি। অনেক সময় তারা তাদের পরিবার থেকে দূরে থাকে আমাদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করার জন্যে। তারা জনগণের ঢাল সেজে তাদেরকে রক্ষা করছে এবং সকল সমস্যা প্রতিরোধ করছে। তাই তারা এদেশের গর্ব এবং আমাদের অহংকার।

উন্নয়নশীল বাংলাদেশ: বাংলাদেশ সেনাবাহিনী

মালিহা নাওয়ার
শ্রেণি: দশম, শাখা: ক, রোল: ৬৯

স্বাধীনতার মহান স্থপতি ও জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের আহ্বানে এক রক্তক্ষয়ী সংগ্রামের অপরিহার্য শক্তি হিসেবে বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর জন্ম হয়েছিল। এটি বাংলাদেশ সশস্ত্র বাহিনীর স্থল শাখা। "সমরে আমরা, শান্তিতে আমরা, সর্বত্র আমরা দেশের তরে"-এ মূলমন্ত্র ধারণ করে বাংলাদেশ সেনাবাহিনী পরিচালিত হচ্ছে। জন্মলগ্ন থেকেই অনেক ত্যাগ তিতীক্ষা ও চড়াই-উৎরাই পেরিয়ে বাংলাদেশ সেনাবাহিনী আজ একটি দক্ষ ও চৌকস বাহিনী হিসেবে গড়ে উঠতে সমর্থ হয়েছে। দেশের স্বাধীনতা, সার্বভৌমত্ব ও অখণ্ডতা রক্ষার পাশাপাশি বাংলাদেশ সেনাবাহিনী শান্তি প্রতিষ্ঠায় বিশ্বপরিমণ্ডলে আজ একটি অতি পরিচিত ও গর্বিত নাম। সামরিক দায়িত্ব পালনের পাশাপাশি প্রাকৃতিক দুর্যোগ মোকাবেলাসহ যে কোনো অভ্যন্তরীণ সংকট নিরসনে এবং দেশের অবকাঠামোগত উন্নয়নে বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর অকুতোভয় সদস্যরা অসামরিক প্রশাসনকে সহযোগিতা করে যাচ্ছে। যে কোনো জাতীয় জরুরি অবস্থায় বেসামরিক প্রশাসনের সহায়তায় এগিয়ে আসতে বাংলাদেশ সেনাবাহিনী সাংবিধানিকভাবে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। বাংলাদেশ সেনাবাহিনী বিভিন্ন উন্নয়ন কর্মকাণ্ড বাস্তবায়ন করছে অত্যন্ত সফলভাবে।

পদ্মাসেতুতে রেল সংযোগ প্রকল্পের আওতায় ঢাকা থেকে যশোর পর্যন্ত ১৭২ কিলোমিটার ব্রডগেজ রেলপথ নির্মাণে চীনের একটি প্রতিষ্ঠানের সাথে চুক্তিবদ্ধ হয়ে রেললাইন সংযোগ প্রকল্প তত্ত্বাবধানের দায়িত্ব পালন করে। বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর ইঞ্জিনিয়ারিং কোরের কনস্ট্রাকশন সুপারভিশন কনসালটেন্ট (সিএসসি) পদ্মা বহুমুখী সেতুর তিনটি প্রকল্পের মধ্যে দুটি প্রকল্প যথাসময়ে সম্পন্ন করে বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষের কাছে হস্তান্তর করেছে। এর মাধ্যমে কর্মদক্ষতা ও পেশাদারিত্বের নতুন মাইলফলক রচনা করেছে কনস্ট্রাকশন সুপারভিশন কনসালটেন্ট, সিএসসি।

দেশের প্রথম ছয় লেনবিশিষ্ট ফ্লাইওভার ফেনীর মহীপালে নির্মিত হয়েছে। এই ফ্লাইওভারের আলাদা বৈশিষ্ট্য হচ্ছে, এটি উপরে ছয়লেন ও নিচে চারলেন। সেনাবাহিনীর ৩৪ ইঞ্জিনিয়ারিং কনস্ট্রাকশন ব্যাটালিয়নের নেতৃত্বে প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হয়েছে। যোগাযোগ ব্যবস্থায় এনেছে এক যুগান্তকারী সূচনা।

হাতির ঝিল প্রকল্প বাস্তবায়নের মাধ্যমে এলাকাটি রূপকথার ছবির মত সুন্দর ও মনোরম হয়েছে। নগরবাসী উপভোগ করছে ফুরফুরে বিশুদ্ধ বাতাস। বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর ১৬

ইঞ্জিনিয়ারিং কনস্ট্রাকশন ব্যাটালিয়নের মাধ্যমে হাতির ঝিল প্রকল্প বাস্তবায়নের ফলে রাজধানীর মধ্যাঞ্চলে এখন আর জলাবদ্ধতা নেই। চারপাশে পাম্প স্থাপন করায় আশপাশে পানি সংকটও দূর হয়েছে। অবকাঠামো নির্মাণে রাজধানীতে বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর সক্ষমতার একটি দৃষ্টান্ত হচ্ছে দৃষ্টিনন্দন হাতির ঝিল প্রকল্প।

বাংলাদেশ সেনাবাহিনী আত্মত্যাগে, দেশ ও জাতির যে কোনো দুর্যোগে অগ্রণী ভূমিকা পালন করে। বিশেষ করে পাহাড়ে বিভিন্ন জাতিসত্তার সাধারণ মানুষের শিক্ষা-স্বাস্থ্য অবকাঠামোগত উন্নয়নে আমাদের সেনাবাহিনী নিরলসভাবে দেশ ও জাতির স্বার্থে কাজ করে যাচ্ছে। প্রায় প্রতি বছরই আমাদের দেশ ঘূর্ণিঝড়, জলোচ্ছ্বাস, বন্যাসহ নানা প্রাকৃতিক দুর্যোগের কবলে পড়ে। এসব প্রাকৃতিক দুর্যোগে পর্যাপ্ত সেবা নিয়ে মানুষের পাশে দাঁড়িয়েছে সেনাবাহিনী। প্রাকৃতিক দুর্যোগে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাওয়া যোগাযোগ ব্যবস্থা পুনঃস্থাপনে সেনাবাহিনীর তাৎক্ষণিক প্রয়াস চোখে পড়ার মতো। পার্বত্য এলাকার ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর জীবন ও মান উন্নয়নে সেনাবাহিনীর অবদান অনস্বীকার্য। প্রত্যন্ত এলাকায় রাস্তা নির্মাণ, ডিজিটাল শিক্ষা, বিভিন্ন দুর্গম এলাকায় ক্যাম্প করে স্বাস্থ্যগত সেবা ও সব শ্রেণির সাধারণ মানুষের নিরাপত্তার কাজে নিয়োজিত তারা। বিভিন্ন ক্রান্তিলগ্নে সেনাবাহিনীর সদস্যরা সর্বোচ্চ নিষ্ঠা ও আন্তরিকতার সাথে ত্রাণ ও পুর্নবাসন কর্মকাণ্ড কিংবা উদ্ধার কার্যক্রম পরিচালনা করে আসছে। করোনা মহামারি মোকাবেলায় সেনাবাহিনীর ভূমিকা সত্যিই প্রশংসনীয়। বিশ্বশান্তি রক্ষায় সেনবাহিনী অত্যন্ত গৌরবের সাথে কাজ করে চলেছে।

বাংলাদেশ সেনাবাহিনী দেশের আর্থসামাজিক উন্নয়নে বিশেষ ভূমিকা রেখে চলেছে। অবকাঠামোগত উন্নয়নে দক্ষতার পরিচয় রেখেছে। ৮০ কিলোমিটার দীর্ঘ কক্সবাজার- টেকনাফ মেরিন ড্রাইভ প্রকল্পটি বাংলাদেশ সেনাবাহিনী বাস্তবায়িত করেছে। অন্যান্য প্রকল্পের মধ্যে ২১ কিলোমিটার দীর্ঘ বাঙ্গালহালিয়া রাজস্থলী সড়ক উন্নয়ন প্রকল্পটি সেনাবাহিনীর তত্ত্বাবধানে বাস্তবায়িত হয়েছে। যোগাযোগ ব্যবস্থায় এক বৈপ্লবিক পরিবর্তন এনেছে বাংলাদেশ সেনাবাহিনী।

দেশের আর্থসামাজিক উন্নয়নের লক্ষ্যে গ্রহণ করা হয় বিভিন্ন আশ্রয়ণ প্রকল্প। যেমনঃ- খুরুশকুল বিশেষ আশ্রয়ণ প্রকল্পের মাধ্যমে জলবায়ু উদ্বাস্তু ও বিমানবন্দর সম্প্রসারণের কারণে ভূমিহীন ৩ হাজার ৮০৮টি পরিবারকে পুর্নবাসন করা এই প্রকল্পের মূল লক্ষ্য। দেশের উন্নয়নে বাংলাদেশ সেনাবাহিনী অগ্রণী ভূমিকা পালন করছে।

বিভিন্ন সময়ে দেশের জাতীয় প্রয়োজনে বাংলাদেশ সেনাবাহিনী তাদের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছে। জাতীয় সংসদ নির্বাচনে স্ট্রাইকিং ফোর্স হিসেবে কাজ করে জনগণের আস্থা অর্জন করেছে।

২০২১ সালে বাংলাদেশ উন্নয়নশীল দেশের মর্যাদা পেয়েছে। ২০৪১ সালের মধ্যে বাংলাদেশকে উন্নত দেশ হিসেবে গড়ে তোলার লক্ষ্যে সেনাবাহিনী বিভিন্ন আর্থসামাজিক উন্নয়ন কর্মকাণ্ড পরিচালনা করছে। যুদ্ধ পরবর্তী দেশ গঠনে, বিভিন্ন দুর্যোগ মোকাবেলায় এবং আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলে বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর আত্মত্যাগ ও অবদান অসামান্য। দেশের সার্বভৌমত্ব রক্ষাসহ যে কোনো জাতীয় প্রয়োজনে বাংলাদেশ সেনাবাহিনী সর্বোচ্চ ত্যাগ স্বীকারে সর্বদা প্রস্তুত।

চীনের ঐতিহাসিক ইউ ইউয়ান

সারামাত বিনতে শামীম আদৃতা
শ্রেণি: ৭ম, শাখা: গ, রোল: ১২৬

চীন বিশ্বের সবচেয়ে উন্নত দেশগুলোর মধ্যে একটি। চীনের সংস্কৃতি এবং ইতিহাসও বরাবরই সমৃদ্ধ। চীনের অন্যতম ঐতিহাসিক স্থানগুলোর মধ্যে ইউ গার্ডেন বা ইউ ইউয়ান গার্ডেন এক বিশেষ স্থান দখল করে রেখেছে।

ইউ গার্ডেন হলো চীনে সাংহাই শহরের পুরাতন অংশে অবস্থিত এক বিশেষ বাগান ও ঐতিহাসিক স্থাপনা। ইউ ইউয়ান গার্ডেন প্রথম নির্মাণ হয় ১৫৫৯ খ্রিষ্টাব্দে মিং রাজবংশের সময়কালে। প্যান ইউনদুয়ান নামের একজন যুবক তার পিতা, মন্ত্রী প্যান এন এর আরামের জন্য ইউ গার্ডেন স্থাপন করেন। প্যান ইউনদুয়ান সর্বপ্রথম ইউ গার্ডেনের কাজ শুরু করেন তাঁর ইম্পেরিয়াল পরীক্ষায় ব্যর্থ হওয়ার পর। 'ইউ' শব্দটির অর্থ-"মা-বাবার সন্তুষ্টি"। এই বাগানটি স্থাপন করার পেছনে তাঁর প্রেরণা হলো তাঁর পিতা-মাতার প্রতি শ্রদ্ধা ও ভালোবাসা প্রদর্শন করা এবং তাঁদেরকে বৃদ্ধ বয়সে আনন্দ দেওয়া। পরবর্তীতে ইউনদুয়ান সিচুয়ানের গভর্ণরের দায়িত্বভার গ্রহণ করার কারণে ইউ গার্ডেন নির্মাণের কাজ ২০ বছরের জন্য স্থগিত করা হয়। ইউ গার্ডেন চীনের "শান্তি ও স্বাচ্ছন্দের বাগান" হিসেবেও পরিচিত।

ইউ গার্ডেনে অনেকগুলো জলপথ, রাস্তা, বিশেষ পাথুরে উদ্যান, গাছপালা এবং ভবন রয়েছে। মাঠগুলি 'লেশোউ টাং' নামে একটি কেন্দ্রের বিভিন্ন উদ্যানের একটি কম্প্লেক্স হিসেবে ডিজাইন করা হয়েছিল। ইউনদুয়ানের নিজস্ব রেকর্ড থেকে জানা যায়, বাগানটি বিভিন্ন সামাজিক কর্মকাণ্ডের কেন্দ্র হিসেবে ব্যবহৃত হতো যখন তিনি সেখানে অবস্থান করতেন।

১৯ শতকে বাগানগুলি বহুবার ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছিল। প্রথম আফিম যুদ্ধের সময়, ১৮৪২ সালে ব্রিটিশ সেনাবাহিনী হ্যাক্সিন্টিং চা-ঘরকে একটি ঘাঁটি হিসেবে ব্যবহার করেছিল। ১৮৫৬ সাল থেকে ১৯৬১ সাল পর্যন্ত সাংহাই সরকার কর্তৃক নিযুক্ত লিয়ানশুন হান দ্বারা মেরামত করার আগে ১৯৪২ সালে জাপানিদের দ্বারা সেগুলি আবার ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছিল। ১৯৬১ সালে এটি জনসাধারণের জন্য উন্মুক্ত করা হয়।

বর্তমানে ইউ ইউয়ান গার্ডেন ২ হেক্টর জমি জুড়ে অবস্থান করছে। চা-ঘরসহ একটি ছোট পুকুর পেরিয়ে নয় বাঁকের ব্রিজ অতিক্রম করে বাগানে যাওয়ার পথ। ব্রিজের শেষ প্রান্তে প্রবেশদ্বার। ইউ ইউয়ান গার্ডেনের আকর্ষনীয় এই ইতিহাস প্যান ইউনদুয়ানের পিতামাতার প্রতি শ্রদ্ধা ও ভালোবাসা আমাদের সবার জন্য অণুকরণীয়। চীনের এই ঐতিহাসিক স্থাপনা সম্পর্কে জানার পর এ জায়গা ভ্রমণ করার আগ্রহের কমতি ছিল না আমার। এই স্থাপনা সম্পর্কে পড়ে যেমন আকর্ষনীয় মনে হয়েছিল, তা আমার নিজ চোখে দেখার পর আরো রোমাঞ্চকর মনে হয়।

ঘুরে এলাম চর তারুয়া এবং চর কুকরি-মুকরি

রাবিয়া তাবাসসুম রাইসা
শ্রেণি: ৭ম, শাখা: ঙ, রোল: ২৯৬

বাংলাদেশ প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের লীলাভূমি। আর এমনই এক অপার সৌন্দর্য বরিশাল বিভাগের চরফ্যাশন জেলার অর্ন্তগত চর তারুয়া আর চর কুকরী-মুকরী, যা ভ্রমণপিপাসু মানুষদের হাতছানি দিয়ে ডাকছে। আর এই অপার সৌন্দর্যকে নিজ চোখে উপভোগ করার সুযোগ এসেছিল গত ডিসেম্বর মাসে। নতুন জায়গায় ভ্রমণ করতে পারা আমার জন্য খুব আনন্দের হয় সব সময়। আর সেই আনন্দ বহুগুণ বেড়ে যায় যদি পরিবারের সবাই একসাথে ভ্রমণ করতে পারা যায়। গত ডিসেম্বর মাসের ২২ তারিখ রাতে আমরা পরিবারের সবাই ঢাকার সদরঘাট থেকে লঞ্চে করে চরফ্যাশনের উদ্দেশে যাত্রা শুরু করি।

আমরা সংখ্যায় ছিলাম মোট ২৩ জন নানা, নানি, মা, বাবা, ভাই,দুই খালা, দুই মামা, খালু ও খালাতো মামাতো বোনেরা। সারা রাতের আনন্দময় জার্নি শেষ করে খুব ভোরে শীতের কুয়াশাকে উপেক্ষা করে আমরা চরফ্যাশন পৌঁছাই। হোটেলে উঠে ফ্রেশ হয়ে আমরা প্রথমে চলে যাই আমার খালার শ্বশুর বাড়িতে যা ঠিক হোটেলের পাশেই। সেখানে আমরা নাস্তা করে বের হয়ে যাই সিটি ট্যুর-এ। প্রথমে আমরা যাই চরফ্যাশনের জ্যাকব খামার বাড়ি দেখতে যা গড়ে উঠেছে বিশাল পরিসর নিয়ে। সেখানে রয়েছে নানা প্রজাতির গাছ, বড় বড় জলাশয়। তারপর আমরা যাই মায়া ব্রিজ দেখতে। দুপুরে ফিরে এসে কিছুক্ষণ বিশ্রাম নিয়ে সন্ধ্যায় বের হয়ে যাই। জ্যাকব টাওয়ার দেখতে। জ্যাকব টাওয়ার দক্ষিণ এশিয়ার দ্বিতীয় সর্ববৃহৎ ওয়াচ টাওয়ার। রাতের জ্যাকব টাওয়ারের দৃশ্য সত্যিই অসাধারণ। তারপর আমরা ঘুরে দেখি ফ্যাশন স্কয়ার এবং শেখ রাসেল শিশুপার্ক যার আলোকসজ্জা এবং পানির ফোয়ারাগুলো অত্যন্ত মনমুগ্ধকর। রাতে হোটেলে ফিরে এসে খাওয়া দাওয়া করে তাড়াতাড়ি ঘুমাতে চলে যাই, কেননা পরদিন ভোরেই আমাদের যাত্রা শুরু হবে নারকেল বাগান, চর তারুয়া ও চর কুকরী-মুকরীর উদ্দেশে। আমরা ভোরে উঠে নাস্তা করে, রেডি হয়ে বেরিয়ে পড়ি। কচ্ছপিয়া ঘাট থেকে আমরা সি-বাস এ করে যাত্রা শুরু করি। গন্তব্য নারকেল বাগান। আমাদের সি-বাস মেঘনা নদীর বুক চিরে আস্তে আস্তে বঙ্গোপসাগরের পাড়

ঘেঁষে আমাদের নিয়ে যায় নারকেল বাগান চরের দিকে, আর আমরা মন ভরে উপভোগ করতে থাকি সৃষ্টিকর্তার তৈরি অপার সৌন্দর্য, নদীর দুই পাড়ের দৃশ্য। বক ও শঙ্খচিলের ঝুপ করে নদীতে ডুব দিয়ে মাছ ধরে শূন্যে ওড়ার দৃশ্য সত্যিই ভোলা যায় না। অবশেষে আমরা এসে পৌঁছি নারকেল বাগানে। এখানে সাগর ও বন যেন মিতালি করেছে। নারকেল বাগানের সৌন্দর্যে বিমোহিত হয়ে যাত্রা শুরু করি চর তারুয়ার উদ্দেশে। চর তারুয়া যেন ভ্রমণপিপাসু মানুষদের ডাকছে হাতছানি দিয়ে। চারপাশে বঙ্গোপসাগর আর মাঝখানে ছোটো এই চরটি প্রকৃতি আর সাগরের মিলনে তৈরি করেছে এক অপার বিস্ময়। পথ কিছুটা দুর্গম বলে চর তারুয়ায় এখনো বেশি পর্যটকদের আনাগোনা নেই। এই চরটিকে সেজন্য নাম দেওয়া হয়েছে ভার্জিন বিচ। দুপুরে চর তারুয়ায় লঞ্চে করে রওনা হতে হতে প্রায় বিকেল গড়িয়ে সন্ধ্যা। আমরা সবাই একটু ভয় পাচ্ছিলাম অন্ধকারে সাগর পাড়ি দিয়ে চর কুকরী-মুকরীতে পৌঁছানোর কথা ভেবে। যা ভেবেছিলাম তার থেকে বেশি রোমাঞ্চকর ছিল রাতের অন্ধাকারে সাগর পাড়ি দেওয়া। আমাদের চারপাশে পানি আর পানি আর মাথার উপরে ছিল বিস্তীর্ণ আকাশ। শীতের রাত বলে কুয়াশার কারণে যেদিকে তাকাই মনে হয় আমরা মেঘের রাজ্য দিয়ে ভেসে চলেছি। মাঝখানে দুবার আমাদের বোটম্যান পথ হারালো। আর আমাদের ভয় আরো বেড়ে গেল এবং আমরা মনে মনে শুধু আল্লাহকে স্মরণ করছিলাম। বোটম্যান আকাশের তারা দেখে দেখেই পথ ঠিক করছিল। তবে এখানে আমার বাবার মোবাইলের গুগুল ম্যাপও অনেক সাহায্য করছিল। অবশেষে দীর্ঘ চার ঘণ্টার এই ভয়ঙ্কর জার্নি শেষে আমরা রাত ৯ টায় কুকুরী-মুকরী এসে পৌঁছালাম যা স্বপ্নের দ্বীপ নামে পরিচিত। ভোলা শহর থেকে ১২ কি. মি. বঙ্গোপসাগরের কোল ঘেঁষে মেঘনা নদীর মোহনায় অবস্থিত চর কুকুরী-মুকরী দেশের অন্যতম বন্য প্রাণীদের অভায়ারণ্য হিসেবে পরিচিত। এক সময় প্রচুর কুকুর এবং মেকুর ও বড় ইদুরের দেখা মিলত এ চরে। এই কারণে এই চরের নাম দেওয়া হয়েছে চর কুকরী-মুকরী। চর কুকরী-মুকরীতে আমরা ২ দিন থাকি এবং পরিবারের সাথে খুব সুন্দর সময় কাটিয়ে ২৭ তারিখ ভোরে চরফ্যাশনের উদ্দেশে রওনা হই। সকাল ৮ টার মধ্যে আমরা কচ্ছপিয়া ঘাটে এসে পৌছাঁই এবং মাইক্রোবাসে করে বেতুয়া লঞ্চ ঘাটের উদ্দেশে রওনা হই। বেতুয়া লঞ্চ ঘাটে যাওয়ার পূর্বে আমরা বরিশালের সর্ববৃহৎ ইলিশ প্রক্রিয়াজাত কেন্দ্র এবং মাছের আড়ৎ ঘুরে দেখি। সেখানকার সারি সারি ট্রলারের দৃশ্য সত্যিই মনোমুগ্ধকর। এরপর আমরা আবার জ্যাকব টাওয়ার এ গেলাম, সেখান থেকে দিনের ভিউ দেখার জন্য যা ছিল অসাধারণ। অবশেষে বেতুয়া প্রশান্তি পার্ক ঘুরে আমরা ৫টার লঞ্চে করে ঢাকার উদ্দেশে যাত্রা শুরু করলাম। কিন্তু সঙ্গে নিয়ে এলাম মুগ্ধতা এবং নতুন কিছু অভিজ্ঞতা।

মেঘের রাজ্যে ভ্রমণ

সায়মা তাবাসসুম
শ্রেণি: দ্বাদশ, শাখা: এ, রোল: ২৮২

দিনটি ছিল বৃহস্পতিবার ১ নভেম্বর ২০২২, যে দিন সপরিবারে আমরা সাজেক ভ্রমণে গিয়েছিলাম। সকাল ৯টায় আমরা সাজেকের উদ্দেশে যাত্রা শুরু করি। দেখতে দেখতে দুপুর ২টায় আমরা দীঘিনালা পৌঁছে যাই। তারপর আবার দুপুর ৩টায় দীঘিনালা থেকে সাজেকের উদ্দেশে চান্দের গাড়ি করে রওনা দেই। রাস্তার পাশের মানুষজন, পাহাড়ে সবুজের সমারোহ দেখে মুহূর্তে হারিয়ে গেলাম অন্য এক জগতে। উঁচু-নিচু পাহাড়ের মাঝে সাপের মতো আঁকাবাঁকা রাস্তায় গাড়ি সামনে এগিয়ে যেতে লাগল। চলতে চলতে দু'পাশে চোখে পড়ল পাহাড়ি মানুষদের বাড়ি-ঘর, চলাচল। ছোট ছোট বাচ্চারা দাঁড়িয়ে ছিল রাস্তার পাশে চকলেটের জন্য। আমরা পৌঁছালাম 'মাসালাং বাজার' আর্মি ক্যাম্পে। এখানে সব গাড়ি এসে জমা হয়। সাজেক ভ্যালি যেতে কয়েকটি সেনাবাহিনী এবং বিজিবির চেকপোস্ট পড়ে। সেখান থেকে চেক করে গাড়ি ছাড়া হয়। অতঃপর আমরা সেই কাঙ্ক্ষিত জায়গায় পৌঁছাই সন্ধ্যার দিকে। তারপর আমাদের বুকিং করা রিসোর্টে যাই বিশ্রামের জন্য। কিছুক্ষণ বিশ্রামের পর আমরা হালকা নাশতা করি তারপর রাতের খাবার খাই। পরদিন ভোরে ঘুম থেকে উঠেই সেই কাঙ্ক্ষিত মেঘের দেখা পাই। চারদিকে শুধু সাদা মেঘের ভেলা ব্যতিত অন্য কিছু চোখে পড়ে না। অপূর্ব মনোরম সেই দৃশ্য! তারপর পাহাড়ের চূড়া থেকে আস্তে আস্তে সূর্যোদয় দেখা যায়। সূর্যোদয় দেখার পর আমরা রওনা দেই সাজেক ভ্যালির সর্বোচ্চ চূড়া 'কংলাক পাহাড়ের' উদ্দেশে। এর উচ্চতা সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে প্রায় ২২০০ ফুট উপরে। এত উঁচু জায়গায়ও মানুষের বসবাস রয়েছে। এখানে অধিকাংশই লুসাই এবং ত্রিপুরা উপজাতি। কংলাক পাহাড় থেকেই মূলত মেঘের আসল খেলা দেখা যায়। পাহাড়ের একপাশ থেকে ভারতের মিজোরাম রাজ্যের পাহাড়গুলো স্পষ্ট দেখা যায়। কংলাক পাহাড়ে উঠেই একপাশে একটি কাঠগোলাপ গাছ আমার নজর কাড়ে। অপূর্ব সুন্দর ছিল সেই গাছটি। সেখানে কিছু সময় অতিবাহিত করার পর আমরা নিচে নেমে আসলাম। আমরা যে এলাকাতে ছিলাম তার নাম হলো 'রুইলুই পাড়া'। তারপর আমরা বিচিত্র রকম খাবারের সাথে পরিচিত হলাম। যেমন– ব্যাম্বো চিকেন বিরিয়ানি, ব্যাম্বো টি, ব্যাম্বো চিকেন, পাহাড়ী মুরগি ইত্যাদি। সেখান থেকে আমরা গেলাম হ্যালিপেডে। হ্যালিপেডে সূর্যাস্তের দৃশ্যটিও ছিল উপভোগ করার মতো। তারপর আমরা রাতের সাজেক ঘুরে ঘুরে দেখতে লাগলাম। সেখানকার মানুষের আচার-আচরণ, রীতি-নীতি সবই কিছুটা আলাদা। আমরা স্টোন গার্ডেন, আর্মি রেস্ট হাউজসহ আশেপাশের জায়গা ঘুরে দেখলাম। তারপর রাতের খাবার শেষে আমরা আবার রিসোর্টে ফিরে গেলাম। রিসোর্টটাও ঘুরে-ফিরে দেখতে লাগলাম। তারপরদিন সকালবেলা আমরা সেই মেঘের স্বর্গরাজ্য নৈসর্গিক লীলাভূমি সাজেক ভ্যালি থেকে আমাদের গন্তব্যে ফিরে আসি। প্রকৃতির সান্নিধ্যে, বিচিত্র পরিবেশে সাজেক ভ্রমণ আমার চিরদিন মনে থাকবে। যদি কখনো আবারও সুযোগ হয় তাহলে আবারো পাড়ি জমাবো সেই মেঘের স্বর্গরাজ্য সাজেক ভ্যালিতে।

ঐতিহ্যবাহী হুমগুটি খেলা

ফারজিন কায়সার সারা
শ্রেণি: সপ্তম, শাখা: ঙ, রোল: ৯২

ছোটোবেলা থেকেই দেখতাম পৌষের শেষ দিন কনকনে শীতে আমাদের এলাকায় সবাই দল বেঁধে ঢোল-বাজনা বাজিয়ে অনেক আনন্দের সাথে হাজার হাজার মানুষ যেত খেলায়। কেউ যেত খেলার জন্য আবার কেউ কেউ দেখার জন্য। সকলের ঘরে মেহমানে ভরে যেত। বিভিন্ন জায়গা থেকে মেহমান আসত খেলা দেখার জন্য। ঘরে ঘরে নানা রকমের রান্নাবান্না আর আনন্দ। এ যেন এক ঈদের আমেজের মতো। তবে আমি ছোটোবেলা থেকে এই খেলা কখনো দেখিনি। কিন্তু এইবার জানুয়ারির ১৪ তারিখ, ২০২৩ এ আমি এই ঐতিহ্যবাহী হুমগুটি খেলা দেখতে গ্রামে যাই। আমাদের গ্রামটি অর্থাৎ আমার দাদাবাড়ি ময়মনসিংহ জেলার ফুলবাড়িয়া উপজেলায় অবস্থিত কালিবাজাইল নামক গ্রামে। খেলাটি হয় বড়ই আটাবন্ধ মাঠে। মাঠের মাঝখান দিয়ে ফুলবাড়িয়া উপজেলার মেইন রোড। আমি আমার পরিবারের সাথে গিয়েছিলাম। মেলায় গিয়েতো আমি অবাক। লক্ষ লক্ষ মানুষের ভিড়ে আমি নিজেকে প্রায় হারিয়েই ফেলেছিলাম। পা ফেলার পর্যন্ত জায়গা নেই। ফুলবাড়িয়া মেইন রোডে সকল প্রকার গাড়ি বন্ধ, রাস্তায় অনেক জ্যাম। এসব দেখে আমি দিশেহারা। তখনি বুঝতে পেরেছিলাম ছোটো বেলায় আমাকে কেন দাদা এই খেলায় নিয়ে যেতে চাইতেন না। যাই হোক খেলায় তো আর শুধু খেলাই হয় না, নানান রকমের মেলাও বসে। সেই সাথে গান-বাজনা, হই-হুল্লোড়। অনেক মজা করেছিলাম এলাকার মানুষের সাথে। এখন হুমগুটি খেলা নিয়ে বিস্তারিত বলার পালা। হুমগুটি হচ্ছে একটি পিতলের তৈরি ৪০ কেজির গোলাকার বল। লাখো মানুষের কাড়াকাড়ি হয় এর দখল নিয়ে। জায়গাটির চারদিকে গ্রাম থাকে। প্রত্যেকটা গ্রামের মানুষদের আলাদা আলাদা দল থাকে। গুটি নামিয়ে দিলে প্রত্যেক গ্রামের মানুষরা বল নিয়ে কাড়াকাড়ি করে তাদের গ্রামের সীমান্তের ভেতর নিয়ে আসতে পারলেই সেই গ্রাম জয়ী হবে। তখন সবার মুখে উচ্চারিত হয়, 'জিতই আবা দিয়া গুটি ধরবে হেইও ......। সাধারণত ফাল্গুনে আমনধান ও তৎপরবর্তী রবিশস্য তোলার পর চৈত্রের শেষে অথবা বৈশাখের প্রথমে ফসলবিহীন দিগন্ত বিস্তৃত খোলা প্রান্তরে এ খেলা জমে ওঠে। প্রধানত গ্রাম বাংলার খেটে খাওয়া কৃষাণ পরিবারের সুস্থ-সবল সাহসী যুবক থেকে শুরু করে প্রাক-প্রবীণ বয়সীরাই এ খেলায় অংশগ্রহণ করে। খেলায় থাকে একটি মাত্র অদ্ভুত উপকরণ। বৃহদাকার পিতলের কলসির নিচের গোলাকার যে অংশ, ঠিক সেরকম একটি অংশের ভেতরে এমনভাবে মাটি ঠেসে ভরা হয় যে, মুখ বন্ধের পর তাতে হাতুড়ি দিয়ে পিটিয়েও মাটি বের করা যায় না। এটি একটি দলগত খেলা। এ খেলাটির মূল সরঞ্জাম হলো গুমগুটি। পৌষ মাসের শেষ দিনকে এ অঞ্চলের আঞ্চলিক ভাষায় বলা হয় পুহুরা। এই দিনেই যুগ যুগ ধরে অনুষ্ঠিত হচ্ছে এই খেলা। বিকেল সোয়া ৪টায় শুরু হয় এ খেলা। খেলা চলে বিকেল থেকে। অনেক সময় নিয়ে এই খেলাটি হয়। অনেক সময় দুই-তিন দিন কিংবা আট-নয় দিন পর্যন্ত এই খেলা বিরতিহীনভাবে চলতে থাকে। এই দিনে গ্রামে গ্রামে ছোটো থেকে বড়ো ছেলে-মেয়েরা সকলেই পিকনিক করে। যাকে আমরা বলি জুলামাতি খেলা। এ সময় অনেক আনন্দ হয়। ২৫০ বছর আগে মুক্তাগাছার রাজা শশীকান্ত আচার্যের সঙ্গে ত্রিশালের বৈলরের জমিদার হেমচন্দ্র রায়ের জমির পরিমাপ নিয়ে বিরোধের সৃষ্টি হয়। তখনকার দিনে তালুকের প্রতি কাঠা জমির পরিমাপ ছিল ১০ শতাংশ, পরগণার প্রতি কাঠা জমির পরিমাপ ছিল সাড়ে ৬ শতাংশ। একই জমিদারের দুই নীতির কারণে প্রতিবাদী আন্দোলন শুরু হয়। এই বিরোধ মিমাংসা করার জন্য লক্ষ্মীপুর গ্রামের বড়ই আটা নামক স্থানে 'তালুক পরগনার সীমানায়' এই গুটি খেলার আয়োজন করা হয়। গুটি খেলার শর্ত ছিল গুটি গুমকারী এলাকাকে 'তালুক' এবং পরাজিত অংশের নাম হবে 'পরগনা'। মুক্তাগাছা জমিদারের প্রজারা বিজয়ী হয়। জমিদার আমলের সেই গুটি খেলায় স্থানীয় মোড়ল পরিবার বর্তমানে ধারাবাহিকভাবে এ খেলার আয়োজন করে আসছে। এ 'হুমগুটি' নামক ঐতিহ্যবাহী খেলাটি ব্রিটিশ আমল থেকে পালিত হয়ে আসছে। এবার আরো অনেক বারের মতো আমাদের পূব্বাবাসী অর্থাৎ আমাদের এলাকা জিতেছে। এ ঐতিহ্যবাহী 'হুমগুটি' খেলা দেখা আমার জীবনের একটি নতুন অভিজ্ঞতা। এ খেলাটি অনন্তকাল ধরে চলুক-এই আমার প্রত্যাশা, কেননা এ খেলাটি আমাদের গ্রামের ঐতিহ্য।

কথাবন্ধু

তাসনিম জাহান
শ্রেণি: অষ্টম, শাখা: চ, রোল: ৪৯

'ফটিক, তুমি কী করছ?' 'তোমার সাথে কথা বলছি' 'আমি কে?' 'কে আবার? ক্লাসের সবচেয়ে দুষ্ট ছেলে।' এ কয়দিনে ভেন্ট্রিলোকুইজমের প্রতি খুব আগ্রহ বেড়েছে ইমনের। এবার ছুটিতে গ্রামে গিয়ে এক মজার ম্যাজিক দেখেছিল সে। তার থেকে চার-পাঁচ বছরের বড় এক কিশোর হাতে বানানো এক পুতুলের সাথে কথা বলে সকলকে তাক লাগিয়ে দিচ্ছে। তা দেখে তার আনন্দের সীমা নেই। কিশোর ছেলেটিকে বহুবার অনুনয়-বিনয় করা সত্ত্বেও সে তাকে এই কৌশল শিখিয়ে দিতে রাজি হয়নি। জেদ চেপে বসলো তার মাথায়। ইমন নিজেই একটা ভালো দেখে ভেন্ট্রিলোকুইজমের বই কিনে এর কৌশলগুলো রপ্ত করার চেষ্টা করে। তারপর অনেক যত্ন করে একটা পুতুল বানায়; নাম দেয় ফটিক। এখন সে পড়ার টেবিলে বসে ফটিকের সাথেই কথা বলছে। ইমনের এ আগ্রহ নিয়ে তার মা খুবই বিরক্ত। কিন্তু হাজারবার বারণ সত্ত্বেও ইমন ভেন্ট্রিলোকুইজমের পেছনেই পড়ে আছে। আর এর মধ্যেই সে অনেক ভালোভাবেই ম্যাজিক শিখে গিয়েছে। অন্যদের কাছে ম্যাজিক মনে হলেও তার কাছে খুব সহজ। মুখের কথাগুলোকে ছায়ার মতো লুকিয়ে রেখে, পুতলের মুখ নাড়ানোর ভঙ্গিতে বলে দেওয়া এ আর এমনকি। ইমনের এ ভিন্ন প্রতিভা দেখে ক্লাসের স্যারও খুব খুশি। আগামী সপ্তাহে তিনি ইমনকে একটা পাপেট শো করতে বলেছেন। ক্লাসে সবাই ইমনের চটর-পটর পুতুল ফটিক ও তার কথোপকথন খুব উপভোগ করলো। সকলের কৌতূহল দেখে ইমন খুব উৎসাহ পেল।

সেদিন খুব উৎফুল্ল মনে খাওয়া-দাওয়া শেষ করে রাতে ঘুমাতে গেলো ইমন। 'ইমন, এই ইমন', 'কি হলো ফটিক?' 'আমি চলে যাচ্ছি, বিদায় বন্ধু' হঠাৎ ঘুম ভেঙ্গে গেলো ইমনের। চারদিকে সকালের আলো মাত্র ফুটেছে। হতভম্বের মতো ইমন তার পুতুলবন্ধু ফটিককে খুঁজতে লাগল, কোথাও পেল না। কাল রাতে ইমন ঘুমিয়ে যাওয়ার পর মা ফটিক আর ভেন্ট্রিলোকুইজমের বইটা ফেলে দেয়। মাকে জিজ্ঞেস করতেই খেলো এক ঝাঁড়ি। তার সবসময়ের সঙ্গি ফটিককে হারিয়ে শোকে কাতর হয়ে গেল সে। জড় পর্দাথ হলেও পুতুলটা যেন সত্যিই তার মনের সাথে কথা বলত। তাই স্বপ্নেই বিদায় জানালো প্রিয় কথাবন্ধুকে।

ইচ্ছা থেকে প্রাপ্তির গল্প

সাবরীন মুনতাহা ছোঁয়া
শ্রেণি: ১০ম, শাখা: ঙ, রোল: ১৯৭

প্রথমেই স্মরণ করছি মহান সৃষ্টিকর্তাকে, যিনি আমাকে পরিপূর্ণ রূপে পৃথিবীতে পাঠিয়েছেন। মনের মাধুর্য মিশিয়ে কোনো কিছু লেখার সামর্থ আমার নেই। তবে নিজের অভিজ্ঞতা সাবলীল ভাষায় কিছুটা বর্ণনা করতে পারি। সে রকম একটি অভিজ্ঞতার কথাই না হয় আজ বর্ণনা করি। সময়টি ছিল ২০২০, তখন আমি ৭ম শ্রেণির শিক্ষার্থী। ২০২০ সালে ক্যান্টনমেন্ট পাবলিক স্কুল এন্ড কলেজের বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতায় আমি প্যারেডে অংশগ্রহণ করি। তখন আমি দেখতাম যে প্যারেড এবং প্যারেডের পাশাপাশি পারিপার্শ্বিক যেকোনো কিছুতে আমাদের স্কুল এবং কলেজ প্রিফেক্ট গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালন করতেন। এছাড়াও তারা ক্লাসে ক্লাসে বিভিন্ন প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণকারী বিভিন্ন প্রতিযোগীদের নাম নিতে আসতেন। এই সব দেখে আমার মনে কিঞ্চিৎ পরিমাণ আগ্রহ জাগে কলেজ কিংবা স্কুল প্রিফেক্ট হওয়ার, যদিও আমি তখন ৭ম শ্রেণিতে পড়ি। যত বড় হতে থাকি ততই যেন প্রিফেক্ট হওয়ার আগ্রহ আমার বাড়তে থাকে। একদিন কৌতুহলবশত একজন প্রিফেক্টকে জিজ্ঞেস করেই ফেললাম। "আপু তুমি কীভাবে প্রিফেক্ট হয়েছ?" আপু একটু মুচকি হেসে আমার কথার উত্তরে বল্লেন, প্রিফেক্ট হতে হলে সবকিছুতে পারদর্শী হওয়া লাগে। যেমন: নাচ-গান, আবৃত্তি, বিতর্ক, বক্তৃতা, পরীক্ষার ভালো রেজাল্ট, সময়ানুবর্তিতা ইত্যাদি। আপুর এতসব কথা শুনে আমার মনে একটু ভয় লাগতে শুরু করল। আর আমার মনে প্রশ্ন জাগল প্রিফেক্ট হতে এত কিছু লাগে! তাহলে কি আমি পারব না! এ হীনম্মন্যতায় ভুগলাম দুই-তিন দিন। এভাবে কেটে গেল তিন বছর। সময়টা ২০২৩, এখন আমি ১০ম শ্রেণির ছাত্রী। শ্রেণিকক্ষে হঠাৎ মনোয়ার স্যার এসে বললেন, জয়নুল হাউসের কেউ প্রিফেক্ট হওয়ার জন্য নাম দিবে? অন্য সকলের মতো আমিও হাত তুললাম। তখন স্যার বললেন টিফিন পিরিয়ডের পর শহিদ মিনারের সামনে এসে দাঁড়াতে। আমি সময়মতো সেই জায়গায় যাই এবং দেখি আমার মতো অনেকেই এসেছে এখানে এবং অন্য সকল হাউসের ক্ষেত্রেও তাই। আমার মনে ভয় লাগছিল যে, আমি কি হতে পারব! যখন তারিকুল গণি স্যার জয়নুল হাউসের সকলের অ্যাচিভমেন্ট শুনছিলেন এবং সেখান থেকে ১০জন ছেলে এবং ১০জন মেয়ে সিলেক্ট করেন এরপর প্যারেডকমান্ড

ইত্যাদি শুনে ৫ জন ছেলে ও ৫ জন মেয়ে সিলেক্ট করেন। ঐদিন আর প্রিন্সিপাল স্যার নির্বাচন করলেন না এবং জানিয়ে দিলেন পরবর্তী দিন নির্বাচন করা হবে। আর হ্যাঁ একটা কথা তো আমি বলতে ভুলেই গিয়েছি তারিকুল গণি স্যার যে ৫ জন মেয়ে এবং ৫ জন ছেলে সিলেক্ট করেছেন সেখানে আমি নির্বাচিত ছিলাম। তখন আমার মনে ভয়ও হচ্ছিল আবার আনন্দও হচ্ছিল। কী অদ্ভুত অনুভূতিটাই না হচ্ছিল আমার! বাসায় গেলাম নিজে নিজে প্র্যাক্টিস করতে লাগলাম কিভাবে প্রিন্সিপাল স্যারকে নিজের অ্যাচিভমেন্ট বলবো। পরদিন সকালে স্কুলে এসে শহিদ মিনারের সামনে এসে উপস্থিত হলাম। একটু পরে প্রিন্সিপাল স্যার, উপাধ্যক্ষ স্যারসহ হেডমাস্টার স্যার আসলেন। সেখানে স্কুল শাখার এবং কলেজ শাখার প্রায় সব শিক্ষক উপস্থিত ছিলেন। প্রিন্সিপাল স্যার সকলকে বললেন যে প্রথমে সকলে যার যার নাম, শ্রেণি, শাখা, রোল বলে তারপর নিজের অ্যাচিভমেন্ট বলবে। একে একে সবাইকে স্যার জিজ্ঞেস করতে লাগলেন। যখন স্যার আমার পাশের জনকে জিজ্ঞেস করলেন তখন আমার মনে ভয় আরো বাড়তে লাগল আর মনে হচ্ছিল যে এবার আমার পালা, আর ভয়ে আমার হার্টবিট যেন আর চলছে না। আমার ঐ এক সুবিধা যে আমি কথা বলার সময় নিজের ভয়টাকে প্রকাশ করি না। যখন প্রিন্সিপাল স্যার আমার সামনে এসে আমার অ্যাচিভমেন্ট জিজ্ঞেস করলেন তখন আমি ভালোভাবেই সেগুলো বলতে পারি। তখন আমার আরও ভয় লাগছিল আমি কি হতে পারবো! প্রিন্সিপাল স্যার একে একে সকলের কথা শুনলেন। এবার ফল প্রকাশের পালা। সকলের মুখে আমার মতো দুশ্চিন্তার ছাপ, কারণ আমার মতো সকলেই এখানে আশা নিয়ে এসেছে। প্রিন্সিপাল স্যার হঠাৎ করেই আমাদের সারির মধ্যে আমাকে সামনে আসতে বলেন। তখন আমার মনে যেন কোনো কিছুরই চিন্তা হচ্ছিল না। ২-৩ মিনিটের জন্য নিজেকে যেন ভিনগ্রহের প্রাণী মনে হচ্ছিল। তখন আমি একটু একটু আন্দাজ করতে পারছি যে স্যার আমাকে নির্বাচন করেছেন। এরপর যখন স্যার অন্য সকল হাউস থেকেও একজন করে সামনে আসতে বলছিলেন, তখন আর বোঝার বাকি রইল না যে, আমি নির্বাচিত। আমার মনে হচ্ছিল আমি স্বপ্ন দেখছি। নাহ, এটাই বাস্তব যে প্রিন্সিপাল স্যার আমাকে জয়নুল হাউসের স্কুল প্রিফেক্ট হিসেবে নির্বাচিত করেছেন এবং আজ থেকে আমি ক্যান্টনমেন্ট পাবলিক স্কুল এন্ড কলেজের জয়নুল হাউসের স্কুল প্রিফেক্ট। একটা কথা বলতে ভুলেই গেছি যে আমি কখনো ক্লাসের মধ্যে ফার্স্ট ক্যাপ্টেন হতে পারিনি সবসময় সেকেন্ড ক্যাপ্টেন হয়েছি তাও খুব কম। সেই আমিই স্কুল প্রিফেক্ট হওয়ার আকাশকুসুম স্বপ্ন দেখতাম। হ্যাঁ আমার সেই আকাশকুসুম চিন্তাটাই আজ সত্য হয়েছে। কেননা আমার ইচ্ছাশক্তি এবং মনোবল ছিল। ছোটবেলায় বাবার মুখে শুনতাম এবং এখনও শুনি যে, যে যেটা আশা করে সে সেটা দেরিতে হলেও পাবে। হ্যাঁ আজ আমার বাবার কথাটাই সত্যি হয়েছে। কেননা স্কুল প্রিফেক্ট হওয়াটা খুব একটা সহজ ছিল না আমার জন্য। আমার প্রবল আকাঙ্ক্ষা এবং মনোবল ছিল বলেই আজ আমি আমার স্বপ্ন পূরণ করতে পেরেছি। সকলের উদ্দেশে একটা কথা লিখে রেখে যাচ্ছি যে, নিজেকে কখনো ছোট ভাববে না নিজেকে ছোট ভাবলে তো হেরে গেলে।

মেসি ও তার স্বপ্নজয়

আব্দুল্লাহ্ দ্বীন সিফাত
শ্রেণি: সপ্তম, শাখা: খ, রোল: ৪৪

মেসি নামটি শুনলেই যেন একজন এমন মানুষের কথা মনে পড়ে, যাকে মনে পড়লে ফুটবলের কথা মনে পড়ে। হ্যাঁ আজ আমি একজন আর্জেন্টিনিয়ান ফুটবলার -এর কথা বলব যিনি পুরো ফুটবল বিশ্বকে জয় করেছেন।

লিওনেল এ্যানড্রেস মেসি। ১৯৮৭ সালে আর্জেন্টিনার রোযারিওতে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। বাবা জর্জ মেসি ছিলেন লোহার কারবারি এবং মা ছিলেন গৃহিণী সেলিয়া মারিয়া কুকিটিনি। যে সংসারের জন্য মাঝে মাঝে নানা জনের বাড়ি কাজ করতেন। মেসি ছোটবেলা থেকেই ফুটবল খেলার প্রতি আকৃষ্ট ছিলেন। মাঠে ফুটবল নিয়েই তার সময় কাটতো। প্রথম প্রথম তিনি তার স্কুলে বন্ধুদের সাথে খেলতেন। এরপর তিনি যোগ দেন স্থানীয় দলে। এভাবে এ উন্নতির ধারাক্রমে তিনি এক একটি ক্লাবে যোগ দেন। তার পায়ে বল নিয়ে ড্রিবলিং ও এক একটি গোল মানুষকে মুগ্ধ করে। কিন্তু প্রত্যেক সফল মানুষের জীবনই সফল হয় বাধা-বিপত্তি কাটিয়ে। মেসির বেলায়ও এর বিপরীত হলো না। জন্মগত শারীরিক উচ্চতা হ্রাসজনিত রোগ মেসিকে দমিয়ে দিল। সবাই তাকে নিয়ে ব্যঙ্গ করত। কিন্তু মেসি সেসবে কান না দিয়ে নিজের খেলা চালিয়ে গেলেন। এ ধারাবাহিকতার খবর এমনভাবে ছড়ালো যে, মেসির খেলার খবর বিশ্ব ফুটবলের এক বিখ্যাত দল বার্সেলোনা (এফসিবি) -এর নিকট পৌঁছালো। তারা জলদি মেসিকে এ দলের হয়ে খেলতে বললেন। আর এভাবেই ৩০ নাম্বার জার্সি পরিহিত বার্সেলোনা ক্লাবের প্লেয়ারের বিশ্বজয়ের গল্প শুরু হলো। বার্সেলোনার হয়ে বা নিজে একান্ত জীবনে কম পুরস্কার বা সম্মান তো অর্জন করেননি লিও মেসি। লা লিগা জিতেছেন ৪ বারের বেশি। ইউএফ আ চ্যাম্পিয়ন লিগস্ ৬ বারের বেশি। বার্সেলোনা ক্লাবের হয়ে ওয়ার্ল্ড কাপ জিতেছেন ৩ বার। এছাড়াও তাঁর পুরস্কার এবং মেডেল এর আরও অনেক নমুনা আছে। সর্বশেষ ২০২১ সালে বার্সেলোনাকে কাঁদিয়ে ও নিজে কেঁদে বার্সেলোনা থেকে অবসর নেন। ২০২১ সালেই কোপা আমেরিকা জয় করেন তিনি।

এখন আসি তার দেশের জন্য তিনি কী অর্জন করেছেন। ২০১৪ সালে ফাইনালে জার্মানির কাছে হেরে গিয়ে বিশ্বকাপের আশা ছেড়ে দেন। ৭ বার ব্যানোন্ডিয়অর জয়ী মেসি ২০১৮ সালেও অর্জন করতে পারেননি বিশ্বকাপ। ২০২২ সালে বিশ্বকাপে শেষ খেলা জাতীয় দলে প্রথম ম্যাচ হেরে পর পর সব ম্যাচে জিতে উঠে গেলেন ফাইনালে। প্রতিপক্ষ ফ্রান্স। মেসি ডি মারিয়ার গোলে এগিয়ে গেল আর্জেন্টিনা। কিন্তু মধ্য বিরতির পর ফ্রান্সের খেলোয়াড় কিলিয়ান এমবাপ্পে এর গোলে স্কোর গড়ালো সমানে। পরে মেসি এক গোল করে ৩-২ এ দাঁড়ালেও এমবাপ্পে ৩য় গোলে আবার স্কোর সমান করে। খেলা গড়ায় পেনাল্টিতে। ফ্রান্স পর পর ২ পেনাল্টি মিস করলেও আর্জেন্টিনা ও মেসি তার দলকে নিয়ে গেল জয়ের চূড়ায়। হাসিল করল বিশ্বকাপ। ২ বার গোল্ডেন বল ও ৬ বার গোল্ডেন বুট বিজেতা মেসি জিতে নিলেন তার বিশ্ব শিরোপা।

প্রশান্তি

আনিকা ইসলাম জ্যোতি
শ্রেণি: ৩য়, শাখা: ঘ, রোল: ২২৭

প্রকৃতি আমার খুবই প্রিয়। আর প্রকৃতিকে নিবিড়ভাবে দেখার একমাত্র উপায় ভ্রমণ। সপরিবারে ভ্রমণ করার মত সুখ আর কোথাও নেই।

দূরে কোথাও ঘুরতে যাওয়ার লম্বা জার্নি বরাবরই ভালো লাগে। প্রতি বছরই আমাদের দূরে ঘুরতে যাওয়া হয়। কিন্তু করোনার কারণে অনেকদিন কোথাও যাওয়া হয় না। তাই একটু হাঁপিয়ে যাচ্ছিলাম। মনে হতো দূরে কোথাও ঘুরে আসলে ভালো হতো। প্ল্যান করলাম ২০২২ এর ডিসেম্বরে। বাবাকে বললাম কিন্তু বাবার ছুটি কম থাকায় তখন আর বাবা রাজি হননি আর আমাদের যাওয়াও হলো না। ২০২৩ সালে বাবা ছুটিতে আসেন। প্রথমেই বলে রাখি আমার বাবা একজন সেনাবাহিনী কর্মকর্তা। বাবা ছুটিতে আসলেই আমরা আবার শুরু করে দেই যে, বাবা সিলেট ঘুরতে নিয়ে যাও। প্রথমে বাবা রাজি হননি, দেখতে দেখতে ছুটি প্রায় শেষের দিকে আর এক সপ্তাহ বাকি তখন বাবা রাজি হলেন। হাজার হোক বাবা-মা, ছেলে-মেয়ে মুখ ফুটে কিছু চাইলে সহজে না করতে পারেন না। প্রথমে না করেছেন পরে আবার রাজি হয়ে গিয়েছেন। ২০২৩ সালের মার্চ মাস, বাবার ছুটির আর এক সপ্তাহ বাকি। অবশেষে আমরা সিলেট যাওয়ার জন্য বাসের টিকেট কেটে নিলাম। পরের দিন সকালে সিলেটের উদ্দেশে বাসা থেকে বেরিয়ে পড়লাম সকাল ৮টায়। বাস ছাড়বে ৯টায় ময়মনসিংহ টু সিলেট, সাদাপাথর ভোলাগঞ্জের বাস বিআরটিসি। বাস সিলেটের উদ্দেশে ছেড়ে দিলো, আপন মনে ছুটে চলেছে তার গন্তব্যে। একটু পর পর খাবার নিয়ে আসে হকার। বলে শসা নিবেন, চানাচুর, আমড়া, তেঁতুলের আচার ইত্যাদি। আমরা তিন ভাইবোন মজা করে খেলাম। জানি বাইরের খাবার খাওয়া ভালো না। তাও খেয়ে নিলাম, এগুলো দেখলে তো আর মন মানে না। মাঝরাস্তায় বাস বিরতি দিলো দুপুরের খাবার খাওয়ার জন্য। ব্রাহ্মণবাড়িয়া পানসী রেস্টুরেন্টে এসে আমাদের বাস থামলো। আমরা সকলে ফ্রেশ হয়ে নিলাম। তারপর আম্মুর রান্না করা বিরিয়ানি খেলাম। আবারও উঠে পড়লাম বাসে। সিলেটের অপরূপ সৌন্দর্য চা বাগান, পাহাড় দেখতে দেখতে আমরা নিজ গন্তব্যে পৌঁছলাম সন্ধ্যা ৭.৩০ টায়। ভোলাগঞ্জে তেমন কোনো হোটেল নেই, তাই আমরা কোম্পানীগঞ্জ এক আত্মীয়ের বাসায় উঠলাম। রাতে খাবার খেয়ে ঘুমিয়ে পড়লাম। সেদিন সবাই অনেক ক্লান্ত ছিলাম। পরেরদিন সকাল ছয়টায় ঘুম থেকে উঠলাম।

এবার আসা যাক আসল গল্পে, প্রথমে সিলেটের আম্বরখানার উদ্দেশে বেরিয়ে পড়লাম সিলেটের শাহ জালাল ও শাহ পরান মাজার দেখার জন্য। তার আগে এক হোটেলে সকালের নাস্তা সেরে নিলাম। প্রথমেই শাহ জালাল মাজারে গেলাম সেখানে ছিল ঝাঁকে ঝাঁকে জালালী কবুতর। তারপর গেলাম শাহ পরান এর মাজারে। কিছু খেলনা কিনে নিলাম। সেখান থেকে বেরিয়ে সিএনজি করে মালনীছড়া চা বাগান দেখার জন্য। চা বাগানের সৌন্দর্য আসলেও অতুলনীয়। আমরা পাহাড়ে উঠলাম। ডিএসএলআর দিয়ে ছবি তুললাম। সেখানেই চা বাগানের যাত্রা সমাপ্ত। এরপর আবার সিএনজি করে সাদা পাহাড়ের উদ্দেশে রওনা দিলাম। সিলেটি ভাষা ইন্টারেইস্টিং লাগলো। আমরা সাদা পাহাড়ের কাছে পৌঁছলাম। সেখান থেকে নৌকা করে সাদা পাথর দেখতে যেতে হয়। কিন্তু নৌকার টিকেটের জন্য অনেক কষ্ট করতে হয়েছিল। রোদে অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে ছিলাম। এতো ভিড়ে টিকেট পাওয়ার আশাই ছেড়ে দিয়েছিলাম। কিন্তু অবশেষে বিজিবির সাহায্যে টিকেট পেলাম। নৌকা করে সাদাপাথর পৌঁছালাম। সাদাপাথর এর শীতল পানি ও মনোরম পরিবেশ দেখে সত্যিই আমরা মুগ্ধ। একপাশে ছিল ভারতের পাহাড়। স্পষ্ট দেখা যাচ্ছিলো। সাদাপাথরের শীতল পানিতে পা ভিজালাম সবাই। সবাই মিলে পরিবারের ছবি তুললাম। সাদাপাথর নামটা শুনলেই মাথায় আসে পাথর। আসলেও সেখানে ছিল হাজার হাজার পাথর। সেখানেই আমরা দুপুর অব্দি ছিলাম। এরপর এক রেস্টুরেন্টে আমাদের দুপুরের খাবার খেয়ে নিলাম। পরদিন পরিকল্পনা করলাম জাফলং। রাতারগুল ও লালাখালে যাব, সেদিনটি ছিল সত্যিই স্মরণীয় কারণ সকাল থেকে রাত পর্যন্ত বাইক এ করে সারাদিন ঘুরেছি। আমাদের আত্মীয়ের ৩টি বাইক ছিলো তা নিয়েই আমরা ঘুরলাম। প্রথমে গেলাম রাতারগুল। এর অন্য নাম সুইম্প ম্যানগ্রোভ জলভূমি। বলা যায় মিনি সুন্দরবন। সেখানের সৌন্দর্য আমরা নৌকায় করে উপভোগ করলাম। চারপাশে গাছপালা বন জঙ্গল আর মাঝখানে জলাভূমি। আমরা ঘুরতে ঘুরতে পৌঁছে গেলাম এর শেষ সীমানায় এবং দেখতে গেলাম একটি ওয়াচ টাউয়ার। এরপর আমরা বনের মাঝে নামলাম, কাদা-মাটি খালি পায়ে পাড়ালাম। ভালোই লেগেছিলো। এরপর সেখান থেকে জাফলং যাওয়ার পথে লালখাল গেলাম প্রথমে লালাখাল এর পানির রং ছিল সবুজ, দেখতে ভালোই লাগছিল। আল্লাহ তায়ালার সৃষ্টি আসলেই অতুলনীয়। এবার আবার বাইকে উঠলাম এখন পৌঁছলাম জাফলং। সেখানে ছিল অনেক দোকানপাট। আমরা চকলেট, সাবান, তেল আরও অনেক কিছু কিনে নিলাম। আমি আমার প্রিয় বান্ধবীর জন্য ছোট্ট এক উপহার নিলাম। জাফলং জায়গাটা সত্যিই অসম্ভব সুন্দর। একপাশে পাহাড় আর অন্য পাশে নদী। আহ সত্যিই আমরা মুগ্ধ! নিজের চোখে না দেখলে জায়গাটার সৌন্দর্য বলে বুঝানো সম্ভব না। নিজের চোখে দেখলে বিশ্বাস করা যায় আল্লাহর সৃষ্টি কতোই না সুন্দর! জাফলং -এ আমরা ছবি তুললাম, গোসল করলাম। মুহুর্তগুলো আমার জীবনের স্মরণীয় মুহুর্তের তালিকায় যোগ হলো। আবার বাইকে উঠে পড়লাম। চা বাগান দেখতে দেখতে আমাদের ভ্রমণ শেষ হলো। চায়ের দেশকে পরের দিন সকালে বিদায় জানালাম।

"চা দিয়ে শুরু, চা দিয়ে শেষ
চায়ের দেশ ভ্রমণ এখানেই শেষ।"

দিনগুলো সত্যিই অনেক স্মরণীয় হয়ে থাকবে। আমি কখনো ভুলব না। আব্বুকে অনেক ধন্যবাদ আমাদেরকে এতটা আনন্দ উপভোগ করার সুযোগ দেওয়ার জন্য।

স্কুলজীবনের অন্তিম বেলায়

ইসরাত তাহসিন সামিয়া
শ্রেণি: ১০ম, শাখা: ঙ রোল: ৩৪

সালটা ছিল ২০১৪। সেপ্টেম্বর মাসের ১৪ তারিখ শিক্ষার্থী হিসেবে প্রথমবার সিপিএসসিএম এ পা রাখি। আমি তখন প্রথম শ্রেণির শিক্ষার্থী। অনেকের মতো নার্সারি থেকে এই প্রতিষ্ঠানে পড়ার সৌভাগ্য না হলেও এই দশ বছরে অনেক কিছুই দেখার সৌভাগ্য হয়েছে।

"স্কুল লাইফ মানে
পরিবারের বাইরে আরেকটি পরিবার
কিছু মনের মতন বন্ধুর সমাহার
ঝগড়া ও মন খারাপের শেষে
গলা জড়িয়ে ধরে কাঁদা বারংবার।"

প্রকৃতপক্ষেই নিজের পরিবার ছাড়াও শিক্ষক এবং বন্ধু-বান্ধব নিয়ে নতুন একটি পরিবার উপহার দিয়েছে সিপিএসসিএম। প্রথমদিন আমার সহপাঠীরা আমাকে যতটা আন্তরিকতার সাথে গ্রহণ করেছিল, আজ দশ বছর পরে এসেও তাদের মধ্যে ততটুকুই আন্তরিকতা বিদ্যমান। তবে স্কুল জীবনের প্রায় শেষ মুহূর্তে এসে সব অনুভূতিই যেন বর্ণহীন হয়ে যায়। শুধু মনের দরজায় কড়া নাড়তে থাকে পুরনো স্মৃতিগুলো। বন্ধুদের সাথে কাটানো খুনসুটি মাখানো অমূল্য কিছু মুহূর্ত, টিচারের ভালোবাসা মাখানো বকুনি, পরিচিত ক্লাসরুমের চেনা গন্ধ, টিফিন ভাগ করে খাওয়ার আনন্দ আর টিচারদের মজার কিছু নাম যা শুধু স্টুডেন্টরাই জানে। ক্লাস ক্যাপ্টেন হওয়ার অম্ল-মধুর অভিজ্ঞতাও ভোলার মতো নয়। ভাবতেও অবাক লাগে চোখের পলকে জীবনের দশটি বসন্ত কাটিয়েছি এই সিপিএসসিএমএ। নিঃসন্দেহে জীবনের শ্রেষ্ঠ সময়টাই হলো স্কুল জীবন। একটা সময়ের পর কড়া রোদে দাঁড়িয়ে এসেম্বলি করার মাঠটাও ভালো লাগতে শুরু করে। প্রিয় শিক্ষক, প্রিয় বন্ধু-বান্ধব যাদের সাথে আড্ডা হাসিতে মেতে থাকতাম, সুখ-দুঃখের ভাগিদার ছিল যারা, প্রিয় ক্যাম্পাস, প্রিয় ক্যান্টিন সবাইকে বিদায় জানানোর দিনটি কেমন হবে তা জানিনা কিন্তু এই স্বর্নালী দিনগুলো মনের মণিকোঠায় আজীবন তোলা থাকবে। স্কুল, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়ের গণ্ডি পেরিয়েও আমার কাছে শ্রেষ্ঠ থেকে যাবেন আমার স্কুলজীবনের শিক্ষকবৃন্দ কারণ তাদের মতো যে আর শিক্ষক হয় না। জীবনের অন্তিমে গিয়ে আমাকে যদি জীবনের শ্রেষ্ঠ সময়ের কথা লিখতে বলা হয় আমি হয়তো লিখব-

'গল্পটা আবেগের, গল্পটা ভালোবাসার, গল্পটা সিপিএসসিএম এর'

কবিতা

বঙ্গকন্যা

রুবীনা আজাদ
প্রভাষক, বাংলা

বীরের কন্যা তুমি বীরকন্যা
মহীয়সী জননেতা তুমি ধন্যা
বিশ্ব সমাদৃত বঙ্গনেতা।
ডিজিটাল বাংলার তুমি প্রণেতা
অতুল্য অনন্য দেশরত্ন
দেশগড়া কাজে তাই এত যত্ন
তুমিতো 'মাদার অব হিউম্যানিটি'
মানবিক হৃদয়ের শুকতারাটি
নারীর ক্ষমতায়নে দৃঢ়হস্ত
উন্নয়নের পথ সুপ্রশস্থ।'
ঘরে ঘরে বিদ্যুৎ জ্বলছে আলো
প্রতি গ্রামে পিচ-ঢালা পথ বানালো।
ইস্কুলে লেখাপড়া উপবৃত্তি
সুষম খাবার খেয়ে খুশি নিত্যি।
শতভাগ শিক্ষায় উন্নত দেশ
বিশ্বের বুকে হবে গর্ব অশেষ।
প্রবৃদ্ধি অর্জনে গড়ে ইতিহাস
সোনার বাংলা আজ সুখের আবাস।
অসহায় দুঃখীর তুমিই সহায়
আছো তাই কোটি প্রাণে হৃদয়-গুহায়।
সার্থক জন্মটা মুজিবের ঘরে
আদর্শ মাতা রেনু বিধাতার বরে।

পাখির রূপকথা

মোঃ রিয়াদুল ইসলাম
শ্রেণি: দ্বাদশ, শাখা: গ, রোল: ৫৮

আলী আবুর বাড়ির পাশে
ঝিঙে ফুলের গাছ,
তারই পাশে ছোট্ট পুকুর
মাছরাঙাদের বাস।
ঝিঙে গাছে ফিঙে নাচে
লিচু গাছে দোয়েল
তারি সাথে নাচছে সুখে
ছোট্ট পাখি কোয়েল।
ঘুঘু অনেক ভালো পাখি
বাবুই বড় সৌখিন,
তাদের দেখে ছবি আঁকছে
পাশের বাড়ির মৌরিন।
গাছে গাছে উড়ছে পাখি
সারাটি রাত দিন
তাদের সাথে সুর মেলাচ্ছে
আমাদের ফারদিন।
খিদে পেলে পাখিগুলো
করে কিচিরমিচির,
তখন তাদের খাবার দেয়
ভালো ছেলে শিশির।
ছোট্ট কবি পাখি নিয়ে
কবিতা লিখে বেশ,
পাখিদের রূপকথা
আপাতত হলো শেষ।

ছোট্ট বেলার গল্প

আরিয়ান হক
শ্রেণি: ৮ম, শাখা: চ, রোল: ১৬৪

এখন আমি গল্প লিখি ছোট্ট বেলার গল্প,
মায়ের কোলে মুখ লুকিয়ে রোদ পোহানোর গল্প।
বাবার হাতের আঙুল ধরে হাঁটতে শেখার গল্প,
মেঝের কোণে জমে থাকা ময়লা খাওয়ার গল্প।
আছাড় খেয়ে বোকার মত কাঁদতে থাকার গল্প,
মিষ্টি ভেবে আপন মনে পয়সা গেলার গল্প।
বিছানা-বালিশ-চাদর-সোফা ভিজিয়ে ফেলার গল্প,
বন্ধু ভেবে কুকুরটাকে জড়িয়ে ধরার গল্প।
শত্রু ভেবে পিঁপড়েটাকে পিষে মারার গল্প,
অবাক হয়ে দেখা পথের গাড়ি-ঘোড়ার গল্প।
হঠাৎ জোরে শব্দ হলে আঁতকে উঠার গল্প,
ইঁদুর হয়ে কুট কুটা কুট কাগজ কাটার গল্প।
এখন আমি গল্প লিখি শিশু বেলার গল্প,
এখন আমি লিখছি প্রথম বৃষ্টি ধরার গল্প।
ঠাণ্ডা জলে মুখ ভিজিয়ে সর্দি লাগার গল্প,
কুসুম জলে নাইতে গিয়ে জ্বর বাঁধানোর গল্প।
বিকেল বেলা ঘুরতে গিয়ে ঘুমিয়ে পড়ার গল্প,
মায়ের দেয়া রঙিন ছবি প্রথম বইয়ের গল্প।
মাল্টিপ্লাগে হাত ঢুকিয়ে ঝাকুনি খাওয়ার গল্প,
খাটের নিচে লুকিয়ে থেকে হারিয়ে যাওয়ার গল্প,
বাবার চেকের পাতা ছিঁড়ে প্লেন বানানোর গল্প।
লাল আকাশে সবুজ রঙের সূর্য আঁকার গল্প,
দাদির সাধের পানের বাসন হারিয়ে ফেলার গল্প।
এখন আমি গল্প লিখি অবুঝ বেলার গল্প,
বাঁধনহারা দিনগুলো সব কাব্য কথাকল্প।
আবার যদি যেতাম ফিরে আমার ছেলেবেলায়,
প্রজাপতির ডানায় ভেসে কাটতো যে দিন খেলায়।

মানবধর্ম

নাফিসা নাইয়ার জয়া
শ্রেণি: দ্বাদশ, শাখা: এফ, রোল: ৫৬৩

গায়ে পাঞ্জাবি যাচ্ছ কি মসজিদ?
খোদা সেখানে মিলবে না জেনো
হোক যত শক্ত ভিত্।

গেরুয়া বসন দেহে তোমরা হয়ত যাচ্ছ ফিরে
কোথাও এক মস্ত শহরে
প্যাগোডা বা মন্দিরে।

মন্দির বল, মসজিদ বল, বল গির্জারে ভাই
মানবধর্ম সবার উপরে
বাকি সব মেকী তাই।

রাস্তার ধারে ক্ষুধার্ত ছেলেটি জাপটে ধরেছে পায়
দুইটা টাকা দিয়ে যাবেন স্যার !
বড় বেশি ক্ষুধা পায়।"

"সর সর" বলে সরিয়ে তাকে দ্রুত হন্ হন্ পায়,
তীর্থযাত্রী পুণ্যের লোভে
তীর্থের দেশে ধায়।

বাড়ির ধারেই ক্রন্দনরত রুগ্ণ মুসাফির
বলে "না, না মোটেই সময় নেই
যাচ্ছি যে মন্দির।"

ধিক্কার সেই মসজিদ তবে ধিক্কার মন্দির।
ধিক্কার সেই তীর্থযাত্রা
মিছে তোমাদের জিকির।

সেই মসজিদে বিধি নাহি থাকে, নাহি গির্জায়
বিধি থাকেন পীড়িতের মাঝে
ভুলে থাকো যাকে হায়!

পরহিতে ব্রত

জাদিদ মাহমুদ জিৎ
৫ম: শ্রেণি, শাখা: ঘ, রোল: ৮

ফুলবনে পাখি গায়
প্রজাপতি নাচে।
মৌমাছি ফুলমধু
খেয়ে প্রাণ বাঁচে।
ঝরা-ফুল পাতা নিয়ে
মাটি হলো খাঁটি,
ফুলের সুবাস মেখে
হাওয়া বোনে পাটি।
পরহিতে দান করা
মহতের ব্রত,
করিবে যত দান
বেড়ে যাবে তত।
গুণীজন পথ ধরে
চলো পাশে পাশে
করো না জীবন ক্ষয়
মরীচিকা আশে।

ছোট বোন

সাফিয়া জান্নাত
শ্রেণি: ৩য়, শাখা: ঘ, রোল: ৭৩

সবার ছোটো বোনটি আমার
সাফা যে তার নাম,
রেগেমেগে লাল হয়ে যায়
যদি শোনে তার দুর্নাম।
একটি ক্যান্ডি দিয়ে যদি
আপু বলে ডাকি,
মিষ্টি করে হেসে বলে
আরেকটু দিবে নাকি?

আমাদের স্কুল

নাঈম মুক্তাদির
শ্রেণি: ১০ম, শাখা: ঘ, রোল: ৫৬

সূর্যমুখী ফুলের উপর পড়লো আলোর ছটা,
স্কুলটা অনেক বড় হলেও স্যার মাত্র কটা।
হেডস্যার স্কুলটাকে চোখে চোখে রাখে,
স্কুলটাকে ভালোবাসি, যেমন বাসি মাকে।
প্রথম যেদিন স্কুলে গেলাম পেলাম সাথি স্বজন,
আরো পেলাম সহপাঠী কাছের বন্ধু কজন।
প্রতিদিন আমরা সবাই স্কুলেতে যাই,
লেখাপড়া ছাড়া কভু জ্ঞানের কথা নাই।
ধীরে ধীরে ক্লাস ডিঙিয়ে এলো মাধ্যমিক,
লেখাপড়ায় জয়ী হবো, যাব দিগ্বিদিক।
দশম শ্রেণির জীবন স্মৃতি হয়ে রবে,
স্কুলটা ছেড়ে যেতে বড়ই কষ্ট হবে।

জাতীয় কবি

আতিয়া অনামিকা তমা
শ্রেণি: দ্বাদশ, শাখা: বি, রোল: ৩৮৪

চুরুলিয়ার ছোট্ট ঘরে
দুখু মিয়ার জনম
চমকে দিল লেখা দিয়ে
ক্ষুরধার তাঁর কলম।

লেখাপড়ায় মন ছিল না
লেখাজোখার নেশা
বয়স আটে বাবা হারায়
গান লেখা হয় পেশা।

কাঠবিড়ালি, লিচুচোর
শিশু-কিশোর লেখা
এমন সহজ মিষ্টি ভাষা
যায় কি কোথাও দেখা?

কলম হাতে লড়াই করে
ঢাল ও তলোয়ার
'বিদ্রোহী' নিয়ে তুমুল কাণ্ড
মহা সে তোলপাড়।

দুখু মিয়া হলো শেষে
বিদ্রোহী কবি
এক হাতে চাঁদ যার
ভালে জ্বলে রবি।

কে জানত সেই ছেলেটি
জাতীয় কবি হবে
তাঁর লেখা গান কবিতা
উচ্চারিত সকল উৎসবে।

ময়মনসিংহ

অনুষ্কা সরকার
শ্রেণি: ৩য়, শাখা: ক, রোল: ২০

ময়মনসিংহে বাড়ি আমার
শ্যামল-সবুজ দেশে
ব্রহ্মপুত্র যায় বয়ে যায়
ছলাৎ ছলাৎ হেসে।

উত্তরেতে গারো পাহাড়
সীমান্তে মেঘালয়
সবাই থাকি মিলেমিশে
শান্তিপূর্ণ লোকালয়।
ময়মনসিংহ শিক্ষানগরী
এবং বিভাগ সেরা
ধান-পাট ও মৎস্য খামার
গ্রামগুলো সুখে ঘেরা।

তাই তো আমার গর্বের ধন
আমার ময়মনসিংহ
সকল জেলার শ্রেষ্ঠ সে যে
বনের রাজা যেমন সিংহ।

শরৎ

মো. মাহমুদুল হাসান
শ্রেণি: দ্বাদশ, শাখা: ই, রোল: ৪০১

শরৎ এলে নদীর তীরে
কাশফুলেরা ফোটে
নীল আকাশটা নদীর জলে
সাঁতার কাটতে ছোটে।

তালের রসের মধুর সুবাস
ভরিয়ে তোলে মন
ঘরে ঘরে তালের পিঠে
মায়ের হাতের যতন।

শরৎ এলেই পুজোর খুশি
চারদিকেতে সাজ
বাদ্য-বাঁশী ঢোলোক বাজে
দেবীর মাথায় তাজ।

শরৎকালে আকাশ জুড়ে
মেঘের তুলো ওড়ে।
শিউলি ফুলের জাফরানি রং
শিশির ভেজা ভোরে।

ইচ্ছেডানা

আবীর হোসেন
শ্রেণি: দ্বাদশ, শাখা: জি, রোল: ৫৭১

প্রত্যাশিত সুদিন পানে
ছুটছি যেন প্রাণের টানে
অতীত সুতান বাজছে কানে
হৃদয় ভাসছে পুলক বানে।

আকাশ ভাসে শুক্লরাতে
আঁধার যেন আলোর হাতে
জোনাইরা সব খেলছে তাতে
নির্জনতা হাওয়ায় মাতে।

ভোরের ফোটা শুভ্র আলো
নিসর্গ যেনো ফিসফিসালো
বিহঙ্গ সব পাখা উড়ালো
মধুর গানে ঘুম ভাঙালো।

ইচ্ছেরা আজ খুলেছে ডানা
ফিরতে এবার নেইতো মানা
মেঘমালা দল দিচ্ছে হানা
মেলেছি তাই ইচ্ছেডানা।

এ যুগের শিশু

সাঈদা আমরিন রাফা
শ্রেণি: ৫ম, শাখা: ডি, রোল: ১৯২

ভোর হলে, দোর খুলে
খুকুমণি জাগে না,
ঘুম থেকে ওঠে তারা
দশটার আগে না।
ঝিঙে ফুল, লিচু চোর
এইসব পড়ে না,
ইংলিশ মিডিয়ামে
বাংলা তো ধরে না।
বাংলা ভাষা উৎসব
হয় শুধু পালিত,
শিশুরা দিনরাত
ডোরেমন-এ লালিত।
এ যুগের শিশুরা
দেশি কিছু জানে না
স্বদেশের সংস্কৃতি,
ওদের আর টানে না।

পথ শিশু

মোঃ আশফাক শাহরিয়ার অপি
শ্রেণি: দ্বাদশ, শাখা: জি, রোল: ৫৭০

দূর দেশের সেই ছেলেটি সারাদিন কাজ খোঁজে
লেখা-পড়ার ব্যাপারটি সেকি আর বোঝে?
বাবা মায়ের অবহেলায় কাটছে জীবন যার
এমন কি কেউ আছে খোঁজ নিবে তার?
হোটেলের কাজ সেরে রাতে ফিরে বাড়ি
সকালে উঠে কাজে যেতে হবে তাড়াতাড়ি।
খেলাধুলা, পড়াশোনা সব কাজ ছেড়ে
রোজগার করতে হয় তাকে জীবিকার তরে।
এতকিছু করার পরও তার ভাগ্যে স্নেহ না জোটে,
স্নেহের বদলে বকুনি খেয়ে তার দিন কাটে।
পরিশ্রম করতে হয় তাকে বেলা-অবেলায়
জীবন কাটছে তার এমনই অবহেলায়।

সময়ের মূল্য

বুশরা তাসনিম নুসাইবা
শ্রেণি: ৬ষ্ঠ, শাখা: ডি, রোল: ২৬৫

সময় হলো তীব্রবেগে চলা নদীর মতো,
সে কারও জন্য না থামছে, না থামতো।
সময় যদি চলে যায় একবার
সে ফিরে আসে না কখনও আর।
কর যদি সময়ের সঠিক ব্যবহার,
সাফল্যের দরজা খুলে যাবে তোমার।
আর যদি কর সময়ের অপচয়
তোমার জীবনে ঘটবে প্রলয়।
চল করি সময়ের সঠিক ব্যবহার
গড়ব দেশ সবচেয়ে সুন্দর সবার।

ভোরের আকাশ

সানজিদুর রশিদ সাদমান
শ্রেণি: দ্বাদশ, শাখ: জি, রোল: ৬৩৭

সকালে পাখি ডাকে মিষ্টি সুরে
পাখিদের কলরবে মনটা ওঠে ভরে,
কোকিলের কণ্ঠের মিষ্টি সুরে
হিমেল হাওয়ায় ভেসে ভেসে যায় বহু দূরে
সোনালি রবির আলোয় আলোকিত ভোরের আকাশ,
তার সাথে মিশে আছে শীতল বাতাস।
ইচ্ছে করে তখন
আমিও ছুটে চলি,
বাতাসে ভর করে একটু একটু ডানা মেলে,
কোকিলের গানের সুরে ভেসে যাই অজানা দেশে।
মায়াবি এই সকালে স্নিগ্ধ বাতাসে,
মন জুড়িয়ে আসে
তাই ভেবেছি আমি রোজ প্রভাতের সঙ্গী হবো,
কোকিলের সুরে সুরে হারিয়ে যাবো,
প্রভাতের হাতে রাখবো আমি হাত,
সবাইকে জানাবো তখন আমি সুপ্রভাত।

মুজিব

মোঃ খাদেমুল ইসলাম (সাগর)
শ্রেণি: দ্বাদশ, শাখা: জি, রোল: ৫৩৫

তুমি ছিলে তুমি রবে,
শেখ মুজিবুর রহমান,
তোমার কৃতী তোমার স্মৃতি
চিরদিনই বহমান।

আগস্ট এলে শোকে দু'চোখ
ব্যথার জলে যায় ভরে,
তোমার গড়া বাংলাদেশে
শোক পতাকায় জল ধরে।

অমর অবিস্মরণীয়
জাতীয় নেতা তুমি,
বিশ্ব মাঝে উজ্জ্বল তুমি
উজ্জ্বল এই জন্মভূমি।

বিচার হবে

তাওসিফ মোস্তাকিন
শ্রেণি: ৫ম, শাখা: ডি, রোল: ১৩৯

এক যে ছিল মহান নেতা
বাংলা ভালোবাসতেন,
এই মাটিতে জন্ম তাঁর,
এই মাটিতেই হাসতেন।
বাংলাদেশের স্রষ্টা তিনি
বাংলাদেশের প্রাণ,
নিজের জীবন তুচ্ছ করে
দেশ করেছেন দান।
এই নেতারে করলো শহিদ,
এমন সাহস যাদের
হবেই হবে, শাস্তি হবে
তাদের অপরাধের।

একুশ মানে স্বাধীনতা

ফাতেমা তাবাসসুম (ঝুমা)
শ্রেণি: ৫ম, শাখা: ডি, রোল: ১৬৮

একুশ মানে বাংলা ভাষা,
একুশ মানে হাসা,
একুশ মানে বাংলাদেশের
কৃষক, শ্রমিক, চাষা।
একুশ মানে স্বাধীনতা,
একুশ মানে গান,
একুশ মানে মাতৃভাষা
আমাদের সম্মান।

কৌতুক, ধাঁধা ও জানা-অজানা

সাদিয়া জান্নাত সায়মা
শ্রেণি: ৩য়, শাখা: ঘ, রোল: ১৪৫

- এক ঘরের এক থাম। বলো তো তার কী নাম?

উত্তর: ছাতা

- আমি যাকে মামা বলি বাবাও বলে তাই, ভাইও তাকে মামা বলে, মাও বলে তাই। কাকে সবাই মামা বলে?

উত্তর: চাঁদ

- কাটলে বেড়ে যাবে, সব শেষে জল পাবে

উত্তর: পুকুর।

- আমি তুমি একজন দেখিতে এক রূপ, আমি কত কথা কই, তুমি কেন থাক চুপ?
  উত্তর: নিজের ছবি।

সাফওয়াত রহমান জাওয়াদ
শ্রেণি: ৩য়, শাখা: ক, রোল: ১২৬

- পাখিটির পাখা তিনখানা
  শীতকালে তার চলতে মানা

উত্তরঃ ফ্যান

- চার বর্ণে নাম তার
  বেকারিতে মিলে
  লেখার সামগ্রী হয়
  শেষ দুবর্ণ মুছে দিলে।

উত্তরঃ চকলেট

- ইংরেজিতে বাদ্য
  বাংলায় খাদ্য
  কী বা সেই ফল
  চট করে বল?

উত্তরঃ বেল

- দুধের উপর যা পেলে
  মিষ্টিতে আছে উল্টে দিলে
  বলতো উত্তর কী হবে?

উত্তর: রস/সর

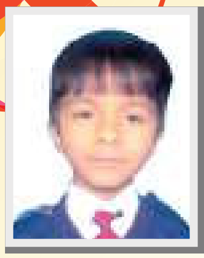

বসীর আজাদ নায়ের
শ্রেণি: ২য়, শাখা: চ, রোল: ১৭৯

হাসতে মানা

- মেয়ে: মা, আমার কোন হাতটা বড়?
  মা: কেন? তোমার দুটো হাতই সমান।
  মেয়ে: তাহলে যে স্যার আমাকে বড় হাতের A B C D লিখে আনতে বলেছেন?

- পুলিশ: আগামীকাল তোর ফাঁসি।
  আসামি: কিন্তু স্যার আমার ফাঁসি তো আরো একমাস পরে হওয়ার কথা ছিল।
  পুলিশ: জেলার সাহেব বলল তুই নাকি উনার গ্রামের লোক। তাই তোর কাজটা আগে করে দিতে বলল।

- বাবা: বুঝলি নায়ের, এক জায়গায় বার বার যেতে নেই। আদর থাকে না।
  নায়ের: ঠিকই বলেছ বাবা। সেজন্যেইতো আমি প্রতিদিন স্কুলে যেতে চাই না।

- ডাক্তার: আপনাকে নিয়মিত খেলাধুলা করতে হবে।
  রোগী: আমিতো রোজই দীর্ঘ সময় ধরে খেলি।
  ডাক্তার: কতক্ষণ?
  রোগী: যতক্ষণ আমার মোবাইলে চার্জ থাকে।

- শিক্ষক: বল তো নায়ের শিক্ষকের স্থান কোথায়?
  নায়ের: আমার পেছনে!
  শিক্ষক: শিক্ষককে সম্মান করতে শিখ্।
  নায়ের: কেন,আমার বাবাই তো বলেন 'তোর পেছনে কত শিক্ষক দিলাম, তবু পাশ করলি না'

- বাবা: নায়ের, মেলায় যাবি?
  নায়ের: একশবার।
  বাবা: থাক আজ নয়।
  নায়ের: কেন বাবা?
  বাবা: একশবার গেলে আজ মরেই যাব।

ইমতিয়াজ মাহমুদ ফিয়াদ
শ্রেণি: ৫ম, শাখা: ই, রোল: ১৪৫

- ক্লাসে শিক্ষক পড়াচ্ছেন,
  শিক্ষক: এই ছেলে তুমি পড়া বলো।
  ছাত্র : স্যার, পড়া ভুলে গেছি!
  শিক্ষক: হাত পাতো, তোমাকে পিটুনি খেতে হবে।
  ছাত্র : তাহলে স্যার, হাতটা ধুয়ে আসি?
  স্যার: কেন?
  ছাত্র : মা বলেছেন, কোন কিছু খাওয়ার আগে হাত ধুতে।

- ১ম বন্ধু: জানিস, আমার মা একটা নতুন গাড়ি কিনেছে।
  ২য় বন্ধু: বাহ, গাড়ির কোম্পানির নাম কি?
  ১ম বন্ধু: বলবো।
  ২য় বন্ধু: এখন বল না!
  ১ম বন্ধু: বলবো
  ২য় বন্ধু: এখন বললে সমস্যা?
  ১ম বন্ধু: আরে বলদ, গাড়ির কোম্পানির নামই হচ্ছে বলবো।

জুহায়ির নূর-ই-রিয়াদ
শ্রেণি: ৮ম, শাখা: ডি, রোল: ১১৫

- তিন অক্ষরে নাম যার নাহি অদ্য মিঠে,
  কখনও বা হাতে আবার কখনও বা পিঠে,
  প্রথম অক্ষর যদি মোর লয়ে যাও মুখে,
  গরম গরম লাগবে খাবে মহা সুখে,
  শেষ দুই অক্ষর দেখ সকলের তরে,
  কী নাম আমার বল পিঠে আর হাতে!

উত্তর: চাবুক।

- এক ঝাঁক মৌমাছি একটি বাগানে এসে ফুলের উপর বসল। যদি তারা জোড়ায় জোড়ায় বসে তবে কোনো ফুল বাকি থাকে না। আবার যদি তারা বিজোড় ভাবে বসে তবে একটি মৌমাছি বসতে পারে না। তাহলে বাগানে কয়টি ফুল ও কয়টি মৌমাছি আছে?

উত্তর: ১টি ফুল, ২টি মৌমাছি।

- আসছে যত, আসবে তত। তার অর্ধেক, তার পাই।
  তোরে নিয়ে শত পুরাই। কত হবে?

উত্তর: ৩৬। [৩৬+৩৬+১৮+৯+১=১০০]

রোবাইয়াত হোসাইন হৃদিতা
শ্রেণি: ৫ম, শাখা: ডি, রোল: ৫২

- টিচার: আচ্ছা পল্টু! আমি তোকে একটা প্রশ্ন করি?
  ছাত্র: জি স্যার করুন।
  টিচার: আচ্ছা পল্টু বলত, যে খেলে তাকে কী বলে?
  ছাত্র: তাকে খেলোয়াড় বলে।
  টিচার: বাহ, চমৎকার!! তাহলে বল যে জানে তাকে কী বলে?
  ছাত্র: ওম্‌ম্‌, স্যার! তাকে জানোয়ার বলে।

- বন্ধু: কিরে সাইকেল নিয়ে হেঁটে যাচ্ছিস কেন?
  আমি: আরে স্কুলে যেতে দেরি হয়ে গেছে, সাইকেলে ওঠার টাইম নাই।

সানজিদা রহমান তানহা
শ্রেণি: ৫ম, শাখা: বি, রোল: ৩৭

- বাবা: কিরে তোর পরীক্ষার রেজাল্ট কী হলো?
  ছেলে: আর বলো না বাবা, হেডমাস্টার সাহেবের ছেলে ফেল করেছে।
  বাবা: তুই পাস করেছিস তো?
  ছেলে : ডাক্তার সাহেবের ছেলেও ফেল।
  বাবা: আরে, তোর রেজাল্ট বল।
  ছেলে: ম্যাজিস্ট্রেট সাহেবের ছেলে পর্যন্ত ফেল!
  বাবা: আমি জানতে চাইছি, তোর রেজাল্ট কী?
  ছেলে: আমি কোন জমিদারের ছেলে যে, পাস করব!

হোমায়রা হাফসা হিমু
শ্রেণি: দ্বাদশ, শাখা: এ, রোল: ২৮১

আজকাল ইন্টারনেটের কল্যাণে আমরা অনেক ধরনের তথ্যই তো জানতে পারি। তবে আমাদের অনেকগুলো জানা তথ্যের মধ্যেও কিন্তু কিছু মজার মজার অজানা বৈজ্ঞানিক তথ্য আছে। সেগুলোর কয়েকটাই আজ আমরা জানব।

- আমরা সকলেই জানি যে, পৃথিবীর সবচেয়ে বড় প্রাণী হলো নীল তিমি। কিন্তু আমরা কি জানি যে, এমন একটি নীল তিমির জিহ্বার ওজন কখনো কখনো একটা প্রাপ্ত বয়স্ক হাতির সমান হয়।
- প্যারিসে অবস্থিত বিখ্যাত আইফেল টাওয়ারের নাম তো আমরা সবাই জানি। কিন্তু মজার ব্যাপার কি জানো, টাওয়ারটি প্রথম স্থাপন করার কথা ছিল স্পেনের বার্সেলোনায়। কিন্তু বার্সেলোনার নগর কর্তৃপক্ষ টাওয়ারটি একদমই পছন্দ করেননি। তাই গুস্তাভো আইফেল নকশাটি প্যারিসে নিয়ে যান। এবং সেখানেই এটি স্থাপিত হয়।
- তুমি কি জানো যে, একজন পূর্ণবয়স্ক মানুষের শরীরের চামড়ার ওজন তার ওজনের প্রায় ১৫% হবে?
- আচ্ছা, শীতের সময় তো আমরা অনেকেই আমাদের মাথাকে শীতের হাত থেকে বাঁচাতে কানটুপি পরি। কিন্তু কানটুপি পরলে শুধু মাথাই নয় তার সাথে পায়ের পাতাও গরম হয়। এটা কি আমাদের জানা?
- আমরা নিশ্চয় প্রায় সকলেই আমাদের কম্পিউটার পাসওয়ার্ডটি অনেক চিন্তাভাবনা করে জটিল কিছু দিয়ে থাকি। কিন্তু এটা জানি কি পৃথিবীর বেশিরভাগ মানুষের কম্পিউটার পাসওয়ার্ড হলো ১২৩৪৫৬।
- আমাদের জানামতে, এখন প্রায় সকল দেশেই এয়ারপোর্ট আছে, তাই না? কিন্তু অবিশ্বাস্য হলেও সত্যি যে, ভ্যাটিকান সিটি, সান ম্যারিনো, মোনাকো, লিচেনস্টাইন ও এন্ডোরা এই পাঁচটি দেশে কোনো এয়ারপোর্ট নাই।
- আচ্ছা, তুমি কি কখনো খেয়াল করেছো যে হাঁচি দেওয়ার সময় কখনোই চোখ খোলা রাখা যায় না?
- ‘পিরামিড’ শুনলেই তো আমাদের চোখে মিশর ভাসে, তাই না? কিন্তু মিশর থেকেও সুদানে পিরামিডের সংখ্যা বেশি।
- ইংরেজি বর্ণমালার অ থেকে ত পর্যন্ত তো আমরা সবাই জানি। বর্ণমালার সর্বশেষ বর্ণ ত হলেও কিন্তু সবার শেষে বর্ণমালায় যুক্ত হয়েছে ঔ বর্ণটি।
- তুমি কি বিশ্বাস করতে পারো যে, যুক্তরাষ্ট্রের ঔপন্যাসিক আর্নেস্ট ভিনসেন্ট রাইটের লেখা উপন্যাস ‘Gadsby’তে রয়েছে প্রায় ৫০ হাজার শব্দ। কিন্তু উপন্যাসটির মধ্যে একবারও ইংরেজি উ বর্ণটি নেই।
- হাঙর তো আমরা চিনি, তাই না? আচ্ছা আমরা কি জানি মানুষের দাঁত হাঙরের দাঁতের মতোই শক্ত হয়?
- পৃথিবীর সর্বোচ্চ দৈর্ঘ্যবিশিষ্ট পর্বতমালা হলো হিমালয় পবর্তমালা। এই হিমালয় পবর্তমালার উচ্চতা প্রতিবছর প্রায় আধা ইঞ্চি করে বাড়ে।
- ছোট বাচ্চা অর্থাৎ যাদের বয়স এক মাস হয় না তাদের কান্নার সময় কিন্তু চোখ দিয়ে কোনো পানি বের হয় না।
- পৃথিবীর সবচেয়ে বড় ক্রান্তীয় বন হলো আমাজান। এটি এতই বড় যে, গোটা যুক্তরাজ্য আর আয়ারল্যান্ডকে প্রায় ১৭ বার এর ভেতরে জায়গা দেয়া যাবে।
- এক মাইল দূরত্ব তো আমাদের কাছে কোনো ব্যাপারই না। কিন্তু এই এক মাইল দূরত্ব পাড়ি দিতে একটি শামুকের লেগে যায় প্রায় ২২০ ঘন্টা।
- আমাদের দৃষ্টিতে মিল্কিওয়ে গ্যালাক্সিটি কতই না বড়। কিন্তু এই মিল্কিওয়ে গ্যালাক্সিতে যে পরিমাণ নক্ষত্র আছে, পৃথিবীতে গাছের পরিমাণ তার চেয়েও বেশি।
- আচ্ছা, তুমি কি জানো যে, শীতকালের তুলনায় গ্রীষ্মকালে মাথার চুল দ্রুত বড় হয়?

Bengali Thoughts in English Language

The Bengal Renaissance that began with Raja Ram Mohan Roy in the nineteenth century had a profound impact on Bengali literature. The Nobel laureate Rabindranath Tagore, a key literary figure in the renaissance movement, remains the most well-known Bengal writer for his translation of Bengali Literature into English.

FOLK TEACHINGS AND MYSTICAL SONGS

Sabina Ferdousi
Asst. Professor, English

A common saying "The Identity of the clan of a person is known by his/her etiquette" was once visible inside or outside of the passenger vehicles. Usually these sentences were used to rouse the innermost morality and awareness of people. But these are not part of Biblical or Religious or Vedanta scripture. They are commonly used in the society from ethical point of view to rectify unethical practice of debased morality. For example we find "Oti loove tati nasta" (grasp all lose all) "Mullar dour masjid porjonta" (people with little or no knowledge can go a short way) and so on. There are also some local dialects that are introduced based on the geographical, social and natural environment of a specific region. There is a satirical saying about jackfruit in Mymensingh area - "Hauser shail kadal diya khaujjai" (to show off people, someone itches the uncomfortable feeling on the skin with jackfruit). In the mind of common people such kind of sayings are embedded as 'saytta bachan' (true speeches) and people hold them in the core of their hearts for years. It is an ideological part of our tradition of Bengali society. In the changeable course of our tradition, these speeches (sattya bachans) have turned into proverbs or excellent speeches in English.

These expressions are usually folkloric, resulting from the creativity and thoughtfulness of the people living in the society. In folk society, the literature written from oral expression of common people is known as folk literature. Folk songs, folk riddles, folk rhymes are different branches of our folk literature which are basically ethical, critical, social and satirical.

In our enriched vast folk literature, folk music has got a special place which has two phases- formal and informal. The components of folk songs at the formal level are religious and social. These are Gainer Geet, Fakirali Jikir Song, Halkar Song, Jarigan, Pyler Song, Punthi, Sarigan, Bhatiali, Meyili Geet, Baidani Song and so on. The songs at the informal level also have two parts - giving pleasure and giving theoretical teaching. The joyous songs are performed in the form of Kabigan and Gadugan. Baul, Murshidi, Marfati are the three genres of songs which are only to giving the basic theoretical lesson to spread music.

The treasure of our folk culture of Mymensingh has been enriched with the wide variety of literature and music of diverse folk genres. Many people say that these are our 'Lokayat Charyapad'. They are the products of collective efforts of the people and the non-communal spirit. They express the Nature and the mysterious nature of the land, the ways of public life and the thoughtfulness of common people. This folk culture is a direct tribute to the fertile land of Mymensingh and the productive experience of agricultural life with it. The varied rhythm of life and diversified relation with water of the river basins or large water bodies of haor are the elements of folk music. The folk songs of Mymensingh are a unique creation of the feelings and perceptions of the people of this area.

As there is creativity in the creation of this folk music, there is a description of misery, wretchedness, complexity of life, simplicity of common people, fraudulence of society, bad customs, ferocity and fundamentalism of religious manipulation based on tradition. To make the people humane against social superstitions and religious misinterpretations is the main component of these songs.

Source: Conversation with
Rezaul Karim Aslam
Secretary, Mymensing Baul Shomity
Chairman, Vovice Foundation and
Collector of Folkloric Musical Instruments

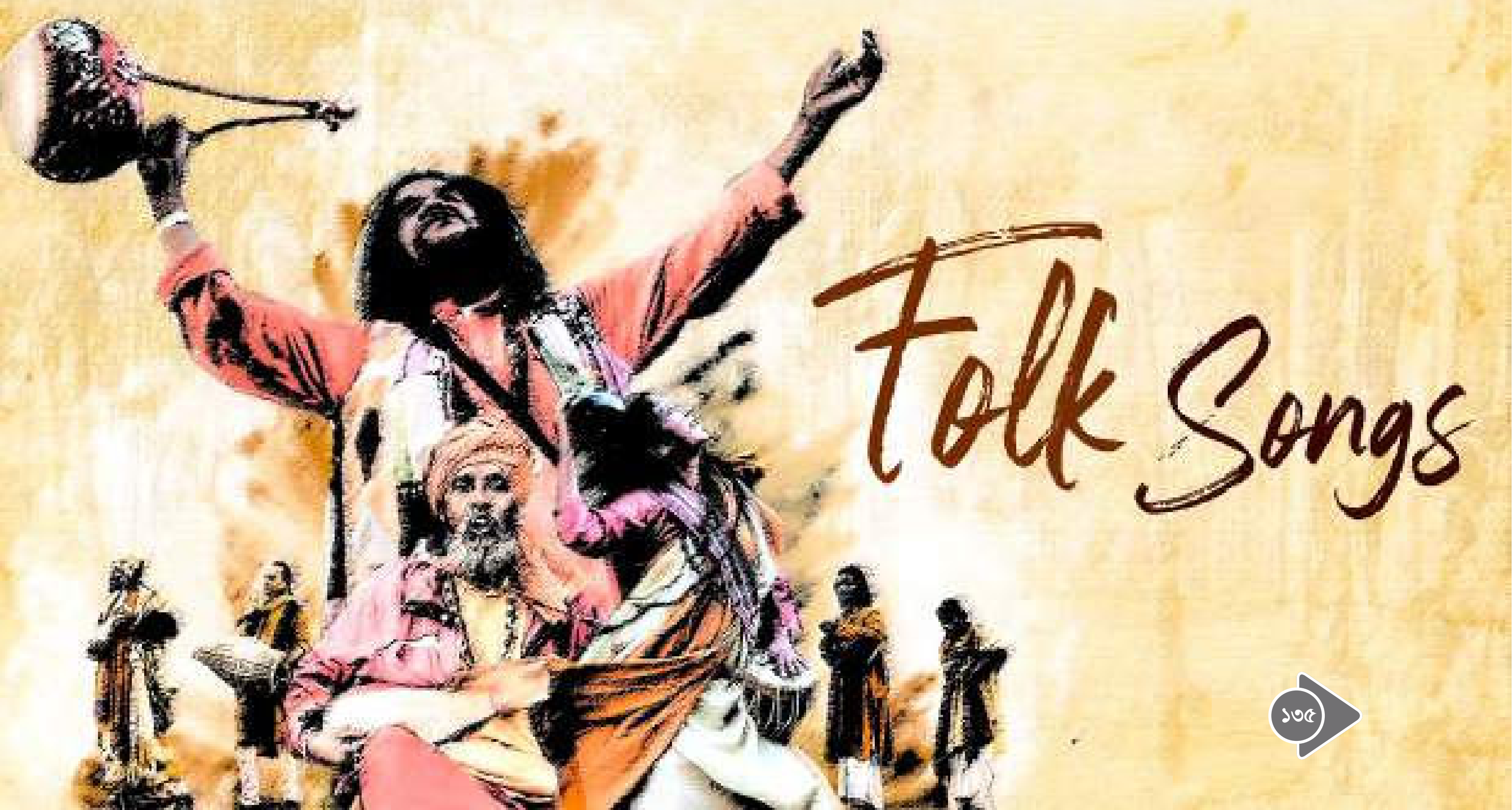

Students-Teachers Positive Relationship

Elias Khan
Asst. Headmaster

The student-teacher relationship is an essential aspect of education and plays a crucial role in the academic and personal development of students. It refers to the interaction and dynamic relation between students and their teachers within the educational setting. Here are some key points to understand about the student-teacher relationship:

Learning and Instruction: Teachers are responsible for imparting knowledge, facilitating learning and providing instruction to students. A positive student-teacher relationship can enhance the effectiveness of this process by creating a conducive learning environment where students feel motivated, engaged and supported.

Trust and Communication: Trust forms the foundation of a healthy student-teacher relationship. Students should feel comfortable approaching their teachers with questions, concerns, or challenges they may be facing. Teachers, in turn, should maintain open lines of communication, actively listening to students and providing timely feedback and guidance.

Support and Guidance: Teachers not only serve as instructors but also as mentors and guides for students. They can offer academic support, provide guidance in career choices and help students navigate personal and social challenges. A supportive and caring teacher can positively influence a student's self-esteem, confidence and overall well-being.

Individual Attention: Every student is unique, with varying learning styles, strengths and challenges. Teachers who develop a strong student-teacher relationship can better understand their students' individual needs and tailor their instruction accordingly. This personalized approach fosters better learning outcomes and students' success.

Motivation and Engagement: A positive student-teacher relationship promotes student motivation and engagement. When students feel valued, respected and connected to their teachers, they are more likely to actively participate in class, ask questions and take ownership of their learning. This, in turn, can lead to increase academic achievement.

Role Modeling: Teachers serve as role models for their students, not only in terms of subject expertise but also in terms of character, values and behavior. Positive role modeling can inspire students to develop positive attitudes, work ethics and values that extend beyond the classroom.

Emotional Support: Students may face emotional challenges, stress, or personal difficulties that can affect their academic performance. Building a strong student-teacher relationship allows teachers to provide emotional support and create a safe space for students to express themselves. Teachers can offer guidance, empathy and resources to help students cope with their emotions and navigate challenges.

It is important to note that the student-teacher relationship should always be professional and respectful, maintaining appropriate boundaries. Building positive relationships can contribute

to a conducive learning environment, promote student success and foster lifelong learning.

To improve the relationship with students, a teacher can take several steps:

1. **Build rapport:** Take time to get to know your students individually. Learn their names, interests and backgrounds. Show genuine interest in their lives and make an effort to connect with them on a personal level. This helps create a positive and welcoming classroom environment.

2. **Foster a safe and inclusive space:** Create an environment where students feel safe to express their thoughts, opinions and concerns without fear of judgment or ridicule. Emphasize on the importance of respect and inclusivity among classmates.

3. **Active listening:** Practice active listening when students speak. Give them your full attention, maintain eye contact and provide verbal and non-verbal cues to show that you are engaged in the conversation. This validates their thoughts and makes them feel valued.

4. **Show empathy and understanding:** Recognize that students have diverse backgrounds and experiences. Be empathetic and understanding towards their challenges, both inside and outside the classroom. Acknowledge their feelings and provide support when needed.

5. **Provide constructive feedback:** Offer feedback that is specific, constructive and supportive. Focus on strengths as well as areas for improvement. Use encouraging language and highlight progress to motivate students to continue growing.

6. **Be approachable and available:** Create opportunities for students to approach you with questions, concerns, or ideas. Maintain open-door policies or designate specific times for one- on-one discussions. Respond promptly to emails or messages from students to show that you are accessible and responsive.

7. **Incorporate student's interests and choices:** Tailor your teaching methods and content to incorporate students' interests and choices whenever possible. This demonstrates that you value their input and helps make learning more engaging and relevant to their lives.

8. **Collaborative activities:** Encourage collaborative activities and group work that foster teamwork, communication and cooperation among students. This promotes a sense of community in the classroom and strengthens relationships between students and the teacher.

9. **Be fair and consistent:** Treat all students fairly and consistently, without favoritism or bias. Apply rules and consequences consistently and transparently. This helps establish trust and a sense of fairness within the classroom.

10. **Continuous professional development:** Engage in continuous professional development to enhance your teaching skills, knowledge and understanding of student needs. Stay updated on the latest educational research and pedagogical techniques to provide the best learning experience for your students.

It is to remember that building a strong teacher-student relationship takes time and effort. It requires patience, empathy and a genuine commitment to the well-being and success of the students.

Norwegian Wood: A Book to Remember

Ahnaf Ibne Tarik Arko
Class: Twelve, Section: I, Roll: 68

Great books are those which stay with you long after you have finished reading them. Even if you've needed the book just once, you feel like you've read it a thousand times. Each line, each word, each letter of the book is etched on your mind. For me, 'Norwegian Wood' by Haruki Murakami is one of those books. It is a literary masterpiece that explores the theme of love, loss and grief. Set in 1960, Tokyo, the novel follows tour to Watanabe, a college student, as he navigates his way through the complexities of adult life.

At the heart of the story is Toru's love triangle with two very different women. The first is Naoko, a troubled young woman who is dealing with the loss of her best friend and finest love, Kizuki. The second is Midori, a lively outgoing classmate who is in love with Toru. As Toru struggles to choose between the two women, he is forced to confront his own emotional baggage and come into terms with his own feelings of loss and grief.

Noticeable aspects of the story are the roles of the side characters - Storm Trooper and Reiko Ishida. Storm Trooper (not his real name) was the roommate of Toru. He had grown quite a companionship with Toru until his sudden disappearance. Then comes Reiko Ishida, a piano prodigy who went mad. Throughout the story we learn about her dark past and how she got into the sanatorium. Her story gets completed when she becomes ready to move on from her past and finally leaves the sanatorium for good.

One of the most impressive aspects of the book is Murakami's ability to create vivid and complex characters. Each character has their own backstory and motivations, which are revealed gradually throughout the book. Naoko, in particular is a fascinating character. Her struggles with mental health are sensitively portrayed and her love for Kizaki is a constant presence in the novel. Similarly, Midori's bubbly personality masks a deep sense of loneliness and insecurity.

Throughout the story Naoko is represented as a dark and depressing character while Midori is portrayed as light and bubbly. Toru eventually goes after Naoko instead of Midori. This has been interpreted by many as "man's self-destructive nature."

The novel also touches on larger societal issues, such as the student protests that were taking place in Tokyo at the time. Murakami portrays these protests as a backdrop to Tour's personal struggles, highlighting the ways in which larger social issues can impact individual lives.

Norwegian Wood by Haruki Murakami is a moving meditation on the human experience. It is a book about love, it is a book about the value of friendship, it is a book about the repeating nature of history, truly it is a book to remember.

Don’t Judge a Book by its Cover

Salman Shahriar Piash
Class: Twelve, Section: H, Roll: 694

We all read books. We read whether it be a textbook or a novel. We love books as books are like a living friend. They are considered to be the best friend of the people with a pure heart and these people always want to admire their best friend with full effort knowing about them properly. So, they read the whole book. Without reading the whole book, it’s impossible for one to make any comment on it because only the cover paper or its flap can never give us complete idea about the book. Many times the last word or sentence may bring a revolution in mind. One might get bored at the first few pages, but that doesn’t mean the whole book is “disgusting.” We cannot condemn the book or the writer of the book as a bad one. Therefore, unless one reads the whole book, he/she won’t attain the right to judge the book If one really wants to abuse a book, he /she must read the whole book first.

Now, it is very surprising that if only a small book cannot be understood without reading every single page of it, how we judge people at first sight! Here is a tale about our misjudgement about a person.

There was a good looking boy who used to be the topper always. In fact, he was very calm, quiet and modest boy with all his qualifications. But he didn’t talk to anyone in the class. Everyone thought that it was because of his arrogance. One day some of the volunteers of a relief team came to collect donations from students without making any contribution, he left the place. This made his other mates very angry and they started thinking that kid as stone hearted, cruel, arrogant and whatever they could think of.

But no one knew the actual story. That boy had to do a part time job after school. He had a little sister and sick mother who were unfed at home. They were waiting for him to come in the evening with food that was earned by doing that job. So, was it even possible for him to contribute for other leaving own little sister and sick mother starving? Hearing the story and seeing the actual fact, his mates feel sad for the boy.

As every book has got its own story, every individual has his/her own stories too that we don’t know or the problems which are beyond our imagination. Actually, we don’t even try to give it a second thought before judging the person. We start throwing our inconsiderable judgment to the people just from our first sight. And this attitude of us is the only reason behind all misunderstanding about the people living in our society. And most of the time, it results in mental pressure to many and occurrence of many unbearable incidents which none of us want to happen.

So let’s stop! Stop judging people without knowing their story. A single page of a book or first sight of a man can never give us a clear conception about a book or a person. We have to stop this substandard act of ours.

Who Am I

Faria Sultana Orpy
Class: Twelve, Section: H, Roll: 662

In this world, in this society, people call us by our name, know us by our name. Is it what we are? Can it only disclose our identity? When I was young, I asked my mother "Mother, who am I?" She replied to me, with a little smile on her face, "You're my child". When I was in school, I used to ask my teachers, "Teacher, who am I?" They replied to me, with a warm face, "You're a student of our school, my child". Same question for same person, but why the answer is different? Is it the answer I want to hear? Am I really satisfied with their answers? Sometimes it becomes harder to think if we're really us what they say? But we have only one side then why they know us in different ways. If they can know us in different ways then why we can't know us in our ways. Do we even try to know ourselves? Do we even try? No, we don't. Actually we never tried to find ourselves in our way. We have to find ourselves. We have to know where we belong to. For this we have to do only one thing and that is instead of asking them we have to ask ourselves, "What do we want?" Where do we belong to? What does our heart want to do?" Just ask yourself, you'll find the answer. Your heart can give you better realistic answer. Sometimes our heart and brain sing different songs. Our brain sings what they say but heart sings what we say. We have to listen to our heart calmly. We have to do work according to our heart. We have to follow its instructions. Then you can be a successful person in the rest of your life.

Every individual has his own identity. And this is called divine otherness. People are born in this world with this otherness. After birth he/she has to flourish his own otherness to have a personal Identity. For this one should have faith in oneself. One should not ask others "Who am I?" The answer is hidden in oneself.

Psychopath

Farzia Shorker Anna
Class: Twelve, Section: F, Roll: 610

The word 'Psychopath' is associated with mental and personality disorder. It is also known as sociopath. The activities which are unnatural or socially unacceptable to the people are known as psychopath. Someone who lies a lot is a psychopath. Someone who texts us more frequently we want to call him a 'crazy'. The word 'psychopath' is also routinely used to describe serial killers or serial rapists.

According to Craig Neumann, a professor of clinical psychology at the university of North Texas, the true definition of 'Psychopath' is actually pretty narrow. He says that psychopath refers to a pathological personality style that is interpersonally deceptive, effectively cold, behaviorally reckless and often anti social. A psychopath is moreover a kind of DID- Dissociative Identity Disorder. It is also formally known as multiple personality disorder. They are really manipulative, deceitful and narcissistic. In psychology it's known as "The psychopath's charm". They lack remorse. They are callous and may take pleasure in hunting others. They're impulsive.

Now the big question is why do they turn into a psychopath? The answer is very simple. It is mostly because of a chaotic family life, lack of parental attention and guidance, abuse and parents' poor relationship, divorce etc. In addition, adverse socio economic circumstance also causes psychopath. People with high level of psychopathic tendencies are generally unhappy. They show low levels of positive emotions. They do not find any satisfaction in life. They mostly have high levels of negative emotions which cause depression. However, it's not like that they don't have any 'emotions'. Actually they do. They have emotion just like others. They do have feelings like us. They can feel happiness, joy, surprise and disgust. Psychopaths are, for sure, different from us in some cases. They hurt others to achieve what they want. Sense power of psychopaths is different from the normal one. When you look at them for the very first time they seem to be absolutely normal one. What is wrong with these people? Why do they use violence to achieve their goals? The answer is the anatomy of the morality found in their minds. The part of their main pertaining emotions is damaged and it makes them very dangerous. A devil was once an angel.

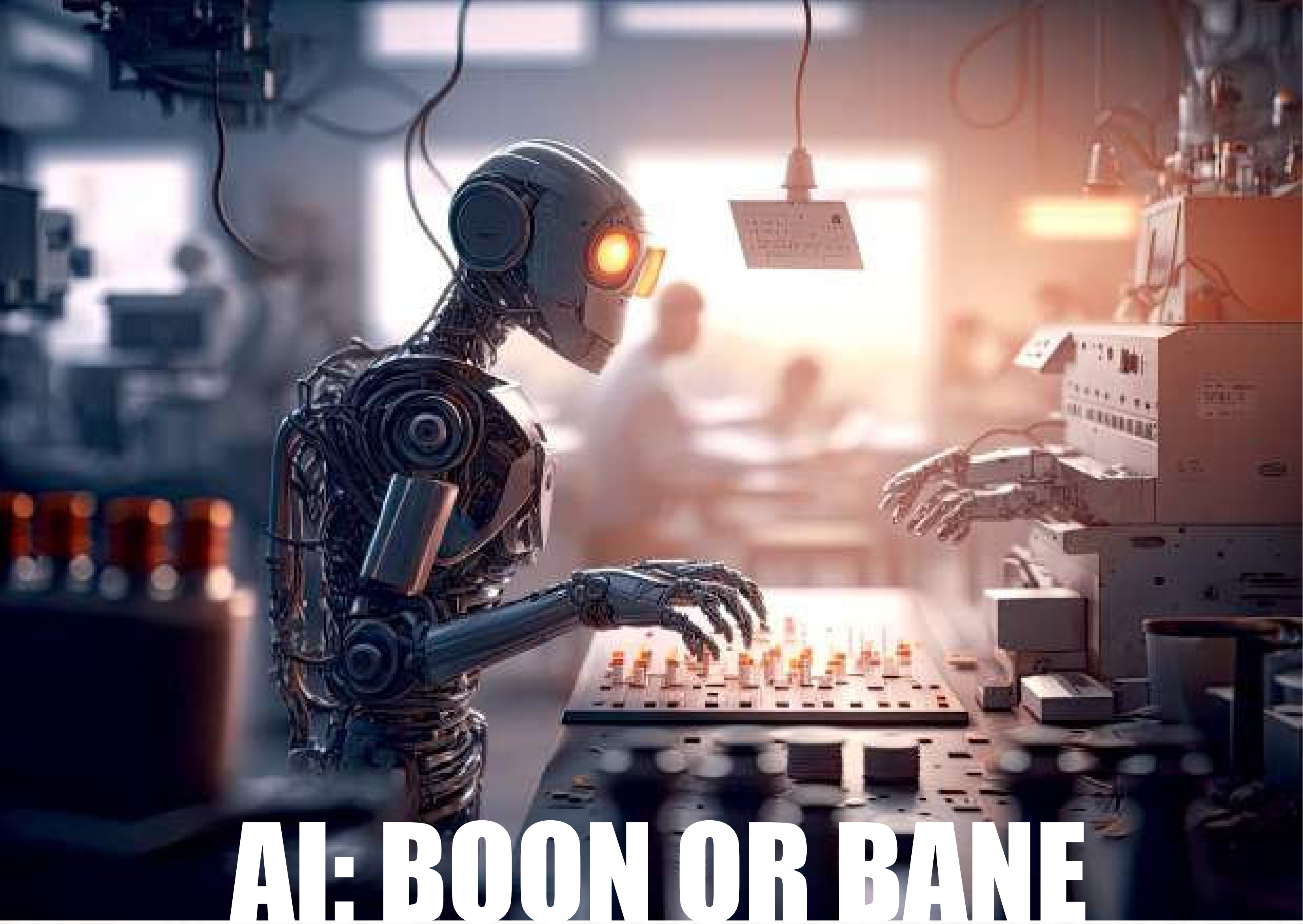

AI: BOON OR BANE

Fabiha Haque
Class: Twelve, Section: E, Roll: 408

In the present world Artificial Intelligence (AI) has reigned supreme. It has brought a revolutionary change in today's world. AI can do the task of thousands of people within a second. It covers almost all kinds of activities from household chores to industrial, financial, medicine and so on. Apparently it has eased the life of people and enhanced the standard of living. But a question has arisen, whether the consequences of our relentless pursuit of automation is a boon or a bane.

The relentless march of AI, once seen as a boon, has now cast a shadow on our society. The jobs that were once the lifeblood of communities have been vanished overnight and replaced by machines and algorithms. The human touch in customer service, once a source of comfort, has been replaced by emotionless Chatbots. Family members, struggled as breadwinners, have found themselves unemployed, unable to compete with the efficiency of machines. Privacy has become a distant memory. AI algorithms know us better

than we know ourselves, mining our data for profit. Personal conversations, once considered sacred, have now been analyzed and monetized. The very notion of individuality seems to be eroded as AI has tailored our preferences and opinions, creating echo chambers that reinforce our existing beliefs.

As we entrusted AI with decision making, bias has crept insidiously into our lives. Discriminatory algorithms perpetuated inequalities in hiring, lending, and law enforcement. The promise of impartiality has given way to a new form of digital discrimination. In healthcare, AI diagnosis is seen as infallible, but they lack the human touch, missing subtle cues that only a doctor's trained eye can catch. Lives hang in the balance as we replace empathy with algorithms. Also AI can't contribute in split second decision making activities. It doesn't have the ability of critical thinking responding to unaware situations. One broad example would be COVID. AI could not give a solution to it. AI has created an emotional challenge for the physicians.

Another concern would be that AI may only output the most common symptoms or treatments which would cover most cases but the few numbers of "abnormal" cases may not benefit from an AI program. It would be nearly perfect if the AI could give an alternative answer to "I don't know answer as Navid suggested." Unlike human physicians, AI will have the ability to unconscious biased ever. Each patient case has got their individual illness or disease. AI will compare the individual's information to a large data set and that's it! It cannot take into consideration the "type" of patient. It cannot see past experiences of patients such as substance abuse. Here, I think, a human physician's opinion can potentially influence patient's treatment. Sometimes knowing the patient's personality does positively influence the type of treatment. Our world is getting large and populated at a fast rate, and no human can keep up. Although AI can take over completely, humans have higher order thoughts and emotions that an AI is far from containing. As long as the AI can continuously gather data from around the world, adapt to the collected data, and there is still human oversight.

According to statistics,70 million of jobs are taken by AI. When the jobs are taken by AI, in our country, the middle class will shrink drastically. The middle class is the primary consumer of any economy- whether developed or developing or under developed. The catastrophic impact, in everyone's life, will be greater than the benefit of AI. It is the middle class that takes most of the debts and once job is lost, the debts will turn into bad debts. Financial structure as we know will be gone. Even the elites would benefit from the lower cost and efficient output of the companies. They would be in pickle as those companies will find it difficult to sell their products.

AI has emerged as a giant in our lives. We cannot be far away from the touch of AI but we have to save ourselves. We should not be dominated by AI, we should dominate it. AI can be a powerful tool for solving complex problems, but it requires skilled problem solvers to define the right problems to tackle and design AI solutions. Skilled professionals are needed to develop and implement AI technologies effectively. This includes data scientists, machine learning engineers, and software developers who design, build, and maintain AI systems. AI systems require ongoing maintenance and optimization. Skilled people are essential to monitor and fine-tune these systems to keep them performing at their best.

African American Stereotype

Rejuwan Rahman
Class: Twelve, Section: E, Roll: 414

Stereotypes are often ingrained perceptions that people have about others based on their ethnicity, gender, religion. African Americans had to deal with many stereotypes throughout history, which have often been used to justify discriminatory practices against them. One of the most pervasive stereotypes about African Americans is that they are lazy and uneducated. This stereotype has been perpetuated for centuries and it is often used to justify discrimination against them in the workplace and in schools. However, this stereotype is not supported by the facts. African Americans have been making significant strides in education in recent year and many are highly educated and successful. Another common stereotype about African American is that they are likely to be criminals or drug addicts than people of other races. This stereotype is often reinforced by the media, which tends to focus on stories about African American crime and drug use. However, studies have shown that this stereotype is not accurate. African Americans are no likely to be criminals or drug addicts than people of other races. The last common stereotype about African Americans is that they are poor and living in poverty. This stereotype is often reinforced by image of African Americans living in urban areas and struggling to make their living. However, while poverty is a significant issue in many American Community, it is not true that all African Americans are poor or living in poverty. Stereotype can have a significant impact on how African Americans are perceived by others and how they perceive themselves. Negative stereotypes can lead to discrimination in the workplace, in schools and in other spheres of life. African Americans have had to deal with many stereotypes throughout history, both positive and negative. It is important to challenge stereotypes and to recognize the diversity and complexity of the African American community. Only then can we move towards more inclusive and equitable society.

Patriotism

Munisa Tahsin Chowdhury
Class: Nine, Section: E, Roll: 162

Patriotism is one of the noblest virtues that inspires a citizen of a country to do everything just and fair for the well being and betterment of the country and countrymen. A country reaches the peak of prosperity and progress when she is blessed with the citizens who are patriots in true sense of the term.

Different people define 'patriotism' in various ways. Some people define it as the feelings and love for the motherland and this arises from the core of heart. Some feel performing respective duties and responsibilities with care and enthusiasm for the country is patriotism. For instance going to stadium and shouting for favorite cricket or football team leaving own duties and responsibilities can no way be treated as patriotic deed. The proverb, 'An action speaks louder than the words' is suited for the patriots. A patriot never counts what he has got or will get in the future from the country. Rather he/she remains immensely delighted when he/she finds his/her countrymen in pleasure and happiness.

The importance of patriotism cannot be described in words. The progress of a country or personal development largely depends on patriotism. It is needed for smooth functioning of every sector including armed forces, politics, bureaucracy, judiciary, economy, education and so on. When the students are patriots, they do not do any subversive activities to the nation; when the soldiers are patriot, they do not go for bloody killing of his fellow soldiers for individual's interest.

Here's an example of patriotism. Almost three million Bangladeshi people sacrificed their lives for the sake of the independence of the country. It has been possible only for the patriotic feelings of those valiant soldiers. A true patriot possesses some unique qualities which place him in a position that is far beyond the touch of many fellow people. He/she feels love for his/her country from the innermost part of hearts. He/she doesn't feel hesitated to lay down his/her life in response to the call of the country without giving second thought or without going absconding.

Patriotism is a quality that helps people go beyond selfishness, conceit and narrowness. It not only raises the feelings of sacrifice, benevolence, compassion, love, brotherhood but also makes people loyal and devoted to their country.

Life Goes On

Ashfia Bintae Hassan
Class: Ten, Section: F, Roll: 92

Life is a God gifted thing. It is beautiful as well as precious. Although life is a short period of time, we experience new challenges every day. In this life we often go through different types of hardships. On the other hand we also spend good time as well. We know, the thing that happens in the world has got a cause. It is called casualty law. So we have to find out the reason. To find out the reason we should consider it from the positive point of view. Eliminating the negative sides we must find out the reason of our own happiness. One smile can solve thousands of problems, no matter how and what happens to our life.

We live in a society as we are a social being. It's full of people and there are many kinds of people around us and they have different mentalities. Some are kind to us and some are evil. Some people give their unnecessary opinions without even knowing about the actual matters. Sometimes they cross their limits and it hurts a lot. They say whatever they wish. We can't let them stop us. So we just have to focus on ourselves and do the right tasks for us. We have different aims and dreams. But we don't get the support from our society to do something new and unique. But that does not mean we should stop dreaming. They don't have the right to stop us, from making our dream come true.

Sometimes, our parents scold us and we think that they do this without any reason. We are wrong. There is always a reason for everything they do. They always want the best for us. But because of a generation gap, they sometimes don't want to understand our psychology. Sometimes they don't want to support us thinking that we're wrong. Despite having those issues, life should go on.

However, we may feel invincible. We think that nothing can bring us down and we may experience success in our personal or professional lives, receive recognition for our achievements or form new relationships that fill us with happiness. These moments remind us of the beauty of life and inspire us to keep going.

Life is not always like rainbows and sunshine. There are many setbacks, failure and disappointments. These moments are challenging, but no matter how difficult situation may be seen. We must remember that life goes on and on. Life is a journey filled with ups and downs and it is essential to remember that life goes on. The 'ups' of life bring joy and happiness, while the 'downs' can be incredibly challenging. However, every experience we gather is an opportunity for growth and learning. We must embrace both the ups and downs of life. No matter how difficult the situation is. We must know that there is always hope and light at the end of the tunnel. So, let us embrace life with all its twists and turns, and remember that no matter what happens, life goes on and on.

Friends in Life

Miftahul Jannat Wohi
Class: Ten, Section: F, Roll: 94

Friendship is a devoted relationship. Friendship is very important in life. When we select someone as our friend, we should know about them, either she/he is good or bad. If we choose a bad company, it will be harmful for us. They will bring us down. They will always encounter us to do wrong deeds in steat of stopping us. On the other hand, a good company will make our life beautiful, Good friends will always be there in our highs and lows. They will always encounter us to make right choice and will discourage us to do something wrong. We can find them when we need them. Friends play a very important role in our life. Our parents are indeed the dear ones. Sometimes they can't give us proper time for their professional life although they do it to make our life better. But not every parents are busy. They can give us time but there is a problem, of a big generation gap or age gap. They don't understand our problems. So, we need someone who can really understand us. Friends are the best company for this. We can share everything with them. When we are sad, they entertain us. They always support us in our ups and downs. We feel secured with them. I have got many friends in my life. But some of them are very close to me and, I can't even think about my life without them. They are just like my soul mates. Our friendship is like that we are different entities but we have one soul. So it can be said that we have a great bonding like a diamond. My friends always help me in my study. They are always with my side and support me. We spend most of the time together. We share everything with each other. We help each other. They always entertain me. I feel pleasure when. I am with them.

Friendship is one of the greatest bonds we can ever wish. It is the second purest bond after a parent-child relationship. A proverb says, "Better alone than a bad company." I don't know what I have got in my life. After all, I just want to say that I am very happy to get them. And they will always be a memorable and beautiful chapter in my life. We should be grateful for having friends. Without them our life will be dull and full of loneliness. However we need to make right choice about our friends circle.

OUR ZAINUL, OUR LAUREL

Arisha Binte Foysal
Class: Eight, Section: A, Roll: 01

Our motherland has been enriched with the glorious touch of our valiant heroes in different fields. Some have given blood to draw a painting of an Independent Nation, some have drawn the picture of our existence with brass, pencil or pen. Today, as an independent country, we have our sunlight of our own. In this country we have got great personalities who have shown their talent in different fields. They were true patriots. Today I will be talking about a great man named Shilpacharya Zainul Abedin, a golden name nourishing in the core of our green motherland.

He was born on 29 December, 1914 in Kishoreganj. Most of his childhood was spent near the scenic beauty of the Brahmaputra River. The river became a source of his inspiration all throughout his career. He was such an artist who had expressed the beauty of our majestic river in many of his works. He framed Brahmaputra with the help of a series of watercolors. Zainul did it as his tribute to the river, his teacher. It is obvious that from his childhood he was a master of art and tried to bloom the scenario of our country with a different and wonderful vibe.

Let me give a short description about Zainul. He was admitted to the government school of Art in Calcutta (now government college of Art & Craft, Kolkata). He was the first Muslim student to obtain first class with distinction from the faculty of the same school. He had worked with the arts and crafts of nature, rural life, folk art with a modern appearance. He was involved in every phase of our historical movement such as our liberation war. He was at the forefront of the cultural movement and at that time he painted a scroll using Chinese ink, watercolor and wax named Nabanna.

When I go to the Museum situated on the bank Bramhaputra, I become amazed to see his paintings. I feel, how realistic and creative an artist can be! His most remarkable and prominent works are his famine sketches. The paintings have a voice that I can hear. They talk about the real sufferings and struggles of the starving people during the great famine of Bengal in 1943.He also revealed the famine's sinister face through the paintings. 'The Rebel Crow' his another art work was a best concept of human struggle with the reality and also combined social inquiry and the protest with higher aesthetics. He made modernist paintings of "Santhal People" notable among them is "Two Santhals". He has also exposed the troubles that people faced during the

natural disasters. He also pained “Bhola Cyclone”. Infact, all of his crafting, painting, art works teach us a spectacular concept of patriotism, love and sacrifice for the people of the country.

The great Artist founded the folk-art museum at Sonargaon in Narayanganj and “Zoynul Abedin Sangrahashala,” a gallery of his own works in Mymensingh. Till today, we remember him with profound respect. He is the pride of our Mymensingh city, our country, our motherland. In our institution, there is a house named ‘Zainul House. There is also a park in our city named Zoynul Abedin Park.

Although he died on 28th May 1976, we can see the presence of Zoynul Abedin in his works. He has played the pioneer role in the development of modern art in this country. He is the evergreen and best originator of our culture, our tradition and the history of our patriotic artistry. His artworks will always shine in the lap of our motherland.

A Tale of Overcoming Fear

Salman Bin Mahmud
Class: Nine, Section: H, Roll: 219

There was a boy named Rafsan who was in 8th grade. He was very smart. He always stood first in all classes. After the end of class VIII, he got admitted into another school. That school was much bigger than the previous one. Rafsan was very scared because he thought that the teachers of this school would be too strict and the students too intelligent. On the first day of school Rafsan was sitting with all students in his class. Some students told him that the English teacher was very strict. He was very scared on hearing this. Because of this, his presence in ninth grade was very poor. However, at the end of the session Rafsan was very happy to find Hasan as a good friend. He shared everything with him about his psychological state, earlier performance. Hasan was very sad to hear this. Then Hasan encouraged Rafsan and said “Student life is a life of learning. Sometimes you have to face fear but should not be afraid of it. Rather you should be regular in class, follow the direction of teachers. Gradually, you’ll overcome fear.” Rafsan was filled with enthusiasm after hearing this. He started working hard and attending classes regularly. Consequently, he scored highest mark in class and promoted to class tenth grade securing first position.

Father of the Nation

Habiba Akter Mim
Class: Twelve, Section: B, Roll: 303

In 1920 was born a brave patriot
He is the father of the nation, Sheikh Mujibur.
He was against injustice since his childhood,
Contained sympathy in heart for the oppressed.
Mujib's dream was freedom,
The Bangalee were succumbed to his idiom.
Mujib had a thunderous predication,
His oath was the Bangalee's emancipation
People were inspired by his speech,
Various movements have been organized.
The whole nation came under Mujib's ideal
Yes, he is the pioneer who liberated Bengal.

Fear of Examination

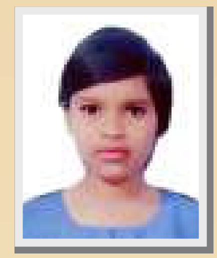

Rabiya Tabassum (Raisa)
Class: Seven, Section: E, Roll: 296

Every student sits for examination,
But it keeps them in tension.
If a student is not well prepared,
For him to pass the exam is hard.
So it's a matter of fear,
Most of the students fall in a danger.
If a student is prepared well,
He cuts a good figure as well.
For taking preparation properly,
One must study regularly.

Oxygen

Tapashya Saha
Class: Three, Section: A, Roll: 76

Don’t cut trees,
Don’t cut trees,
Oh! Dear men, Oh! Dear men,
Because trees give us oxygen.
Don’t cut trees,
Don’t cut trees,
Oh! Dear men, Oh! Dear men,
As cutting trees ruins the oxygen.
If there is no oxygen.
The world will be in danger.
So we should plant trees more,
Oh! My all dears.

Ego

Ormita Akter
Class: Six, Section: C, Roll: 198

Ego is a complex thing,
Makes belief in own being.
Creates chaos and distance,
Among fellows and friends.
Ego! Ego! makes us blind,
Grasps us in the forest of mind.
Pushes us into a maze,
Burns humanity, conscience and peace.
Let us try to win this,
The world will be a better living place.

Under the Sky

Rati Tayyaba Ahmed
Class: Five, Section: D, Roll: 224

The sky is blue and vast
Let the birds move as a host.
Beautiful birds fly,
So high out of my eye.
Trees are high under the sky,
Under the tree I catch butterfly.
Sweet breeze blows, grasshopper hops,
I swim in the river which gently flows.
Under the sky, there is serenity,
For which we can leave our complexity.

I am What You See

Fariba Raina
Class: Six, Section: C, Roll: 150

I am the star,
I am the sky,
I am the wind,
That slowly passes by.
I am the moon,
That shimmers in grace.
I am the God,
That you will soon face.

Bond of Family

Jakariya Rahaman Joy
Class: Seven, Section: B, Roll: 10

No matter how wretched, failure we are!
Our dear family nurtures us with great care.
Whenever we are in need or in any danger,
With warmth of love our family is always there.
A celestial bondage that only families know,
Beginning in childhood increases as we grow.
Grandparents, parents, uncle, aunt and siblings
All are united at the time of sorrows and jolly feelings.
Thanks God for giving a special family of our own,
That protects us and makes us never feel alone.
We stand as a family linked in a chain
The holy bond we share will always remain.

In your Arms

Ashraful Anam
Class: Ten, Section: G, Roll: 9

Mother,
I have walked out from material pride
And come to you as a child.
I know this world can never harm,
When you take me in your arm.
In your hands again,
I forget all my pain.
Your love is so pure,
Each time I get my cure.
I wish to escape my experience,
And return to innocence.
I love to spend my days,
Again blinking in your face.
In this world I've seen,
Like you, there is none.
So, take me once again,
And help me remove my pain.

Lockdown

Tasnim Haque Lamisha
Class: Seven, Section: E, Roll: 07

On March, 2020, the bad news came,
Our lives may never be the same.
Government decided to close all schools
And we had to follow special rules.
Stay inside! Don't go out!
There is common rules about!
You must keep 3 metres distance.
We were in total darkness.
I missed my relatives and friends
I could't wait until the lockdown ends.
It made me angry and a bit sad.
Life was changed but it was ok.
Finally, we could find a way!

The Dhaka Metro Train

Tahmidul Islam Raiyan
Class: One, Section: D, Roll: 71

I Saw,
The doors opened,
And I stepped in.
What a great relief it was!
From the madding crowds,
The chaotic traffic,
The rashly driven buses,
The stray cattle on the road.
When,
The door closed,
The train started gliding,
I spotted a vacant seat,
Then I sat down.
What a great relief it was
To see!
Suddenly,
The train stopped,
And I had reached my stop.

Riddles & Jokes

Sindid Bin Momen Turjo
Class: Seven, Section: C, Roll: 97

1. What goes on four feet in the morning, two feet at noon and three feet in the evening?
2. Suppose, you are in a field and from all sides tornado, thunderstorm, tsunami and cyclone are coming towards you. What will you do then?
3. What is there between the sky and the earth?
4. If you're running in a race and you pass the person in second place, what place are you in? 5.Where does today come before yesterday?
6. A man dies of an old age on his 25th birthday. How is this possible?
7. Without me where would you be? I am not your eyes but I help you see. What am I?

Answer :

1. A man
2. I'll stop supposing
3. And
4. Second place
5. In the dictionary
6. He was born on February 29
7. The light

Khadija Tahsina Hasan
Class: Twelve, Section: B, Roll: 320

- Son: What kind of gender is aeroplane, father?
  Father: It's feminine gender.
  Son: Why?
  Father: Like your mother it sounds much.

- Kabir: What do you know about P B Shelley?
  Fahim: She is my girl friend.

- Teacher: Not a single answer is correct. Go to dogs.
  Student: But I am afraid of dogs, sir.

তুলি আর ব্রাসে মনের কথা

"আমি আমার বিশ্বাসের কথা বলছি। আমার সকল চিন্তা, সবটুকু মেধা, সবটুকু শ্রম দিয়ে যা কিছু নির্মাণ করি তা কেবল মানুষের জন্য, জীবনের জন্য, সুন্দর থেকে সুন্দরতম অবস্থায় এগিয়ে যাবার জন্য আমার ছবির মানুষেরা।" - এস এম সুলতান

রাইয়াত ইসলাম রুহানি, শ্রেণি: ৩য়, শাখা: বি, রোল: ৭৮

আহনাফ সাওকী রশিদ, শ্রেণি: ৪র্থ, শাখা: গ, রোল: ৩০৩

মাশরুকী তাবাস্‌সুম তালুকদার, শ্রেণি: ৬ষ্ঠ, শাখা: ক, রোল: ২২

মুনজেরিনা আহমেদ, শ্রেণি: ৩য়, শাখা: খ, রোল: ৪৩

অপরূপ দত্ত পিনাক, শ্রেণি: ৪র্থ, শাখা: ক, রোল: ৯২

তানিশা তাওসিন আদ্রিতা, শ্রেণি: ৪র্থ, শাখা: চ, রোল: ৪

রাইয়াত

আহনাফ

মাশরুকী

মুনজেরিনা

অপরূপ

তানিশা

স্নিগ্ধা দে, শ্রেণি: ২য়, শাখা: ক, রোল: ২৯১

আকিফুল ইসলাম আকিফ, শ্রেণি: ৩য়, শাখা: খ, রোল: ৩৩

আদিবা শহীদ তানহা, শ্রেণি: ৪র্থ, শাখা: গ, রোল: ১৬৯

নাহসীন শার্মিলী দিয়া, শ্রেণি: ৪র্থ, শাখা: খ, রোল: ১৯৩

পাহলোয়ান লাব্বি, শ্রেণি: ৪র্থ, শাখা: ঘ, রোল: ৬৯

মেহেরিশ, শ্রেণি: ৪র্থ, শাখা: খ, রোল: ৮২

স্নিগ্ধা দে

আকিফুল

আদিবা

নাহসীন

পাহলোয়ান

মেহেরিশ

তাসনিয়া মাহফুজ অরণী, শ্রেণি: ৪র্থ, শাখা: গ, রোল: ২৮

লামিসা, শ্রেণি: ৭ম, শাখা: ই, রোল: ১

সারা মুহসিন রিশানা, শ্রেণি: ৪র্থ, শাখা: ক, রোল: ৬০

সামিউল আহসান তাজ, শ্রেণি: ৪র্থ, শাখা: ঙ, রোল: ১৩

জাসিয়া হাসান জারা, শ্রেণি: ৪র্থ, শাখা: গ, রোল: ৩১

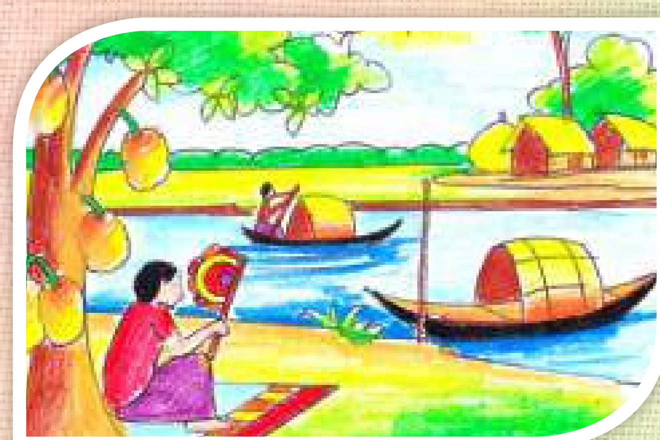

জুন্নুন আল ইসলাম স্বচ্ছ, শ্রেণি: ৪র্থ, শাখা: ঙ, রোল: ০৬

তাসনিয়া

লামিসা

সারা

সামিউল

জাসিয়

জুন্নুন

নুজহাত তাবাস্‌সুম আনিশা, শ্রেণি: ৬ষ্ঠ, শাখা: চ, রোল: ২৬৮

মমি, শ্রেণি: ৬ষ্ঠ, শাখা: ক, রোল: ৪৩

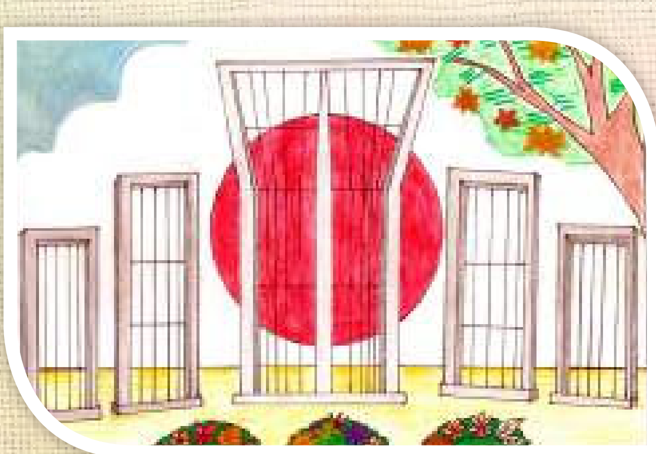

নুজহাত জহির, শ্রেণি: ৬ষ্ঠ, শাখা: চ, রোল: ৩০০

সামিয়া ইসলাম, শ্রেণি: ৬ষ্ঠ, শাখা: খ, রোল: ১১১

সামিউল, শ্রেণি: ৪র্থ, শাখা: ই, রোল: ১

মুঈদ হক মাহি, শ্রেণি: ৭ম, শাখা: ক, রোল: ২১৪

নুজহাত

মমি

নুজহাত

সামিয়া

সামিউল

মুঈদ

জান্নাতুল ফেরদৌস মাওয়া, শ্রেণি: ৭ম, শাখা: ক, রোল: ০৪

মাহা মোর্শেদ নিধী, শ্রেণি: ৬ষ্ঠ, শাখা: ক, রোল: ২৫৪

তাহসীন নুদার, শ্রেণি: ৬ষ্ঠ, শাখা: গ, রোল: ১৪

মোঃ শাফায়েত সামী, শ্রেণি: ৭ম, শাখা: ঙ, রোল: ১০৮

আশফাক ফারহান খান, শ্রেণি: ৭ম, শাখা: ক, রোল: ২৬৩

ফারিহা তাসনিম, শ্রেণি: কেজি, শাখা: ঘ, রোল: ৬৩

জান্নাতুল

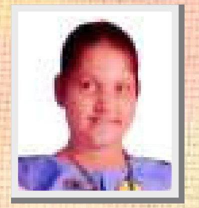

মাহা

তাহসীন

শাফায়েত

আশফাক

ফারিহা

খান ইফফা দানিন, শ্রেণি: কেজি, শাখা: ক, রোল: ১৬৪

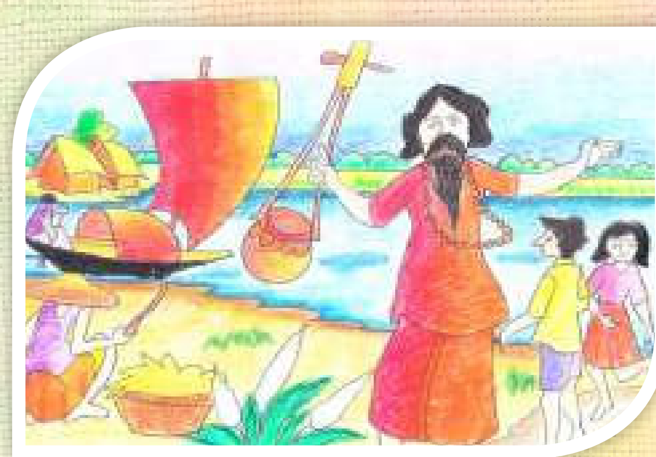

আরিত্রি রশিদ, শ্রেণি: কেজি, শাখা: ঙ, রোল: ২০৩

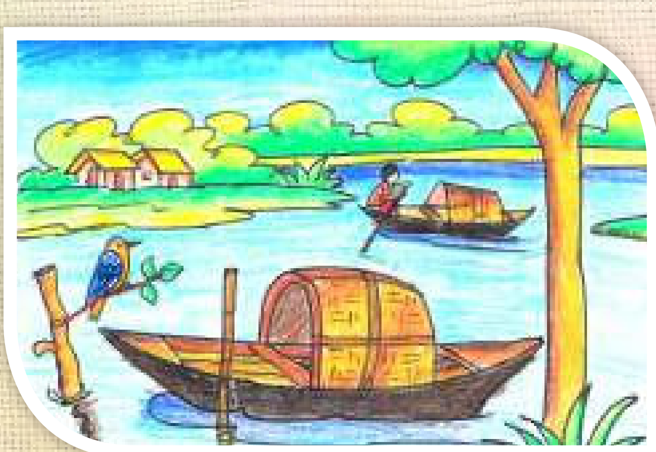

মুহাইমিন রশিদ নুহাশ, শ্রেণি: ৪র্থ, শাখা: খ, রোল: ১৯৭

মুইদ মিরান, শ্রেণি: ৫ম, শাখা: খ, রোল: ১০২

রামিসা মুবাশ্বিরা, শ্রেণি: ৪র্থ, শাখা: ক, রোল: ৪৯

সাদিয়া তাবাস্‌সুম তাহিয়া, শ্রেণি: ৪র্থ, শাখা: গ, রোল: ১০

খান ইফফা

আরিত্রি

মুহাইমিন

মুইদ

রামিসা

সাদিয়া

আফসিয়ান জিনান, শ্রেণি: ৭ম, শাখা: সি, রোল: ৭১

আরেফিন, শ্রেণি: ৪র্থ, শাখা: বি, রোল: ১৫৩

ফাবিহা তাবাস্‌সুম, শ্রেণি: ৪র্থ, শাখা: বি, রোল: ৩৯

তাসনিম আনিকা, শ্রেণি: ৪র্থ, শাখা: সি, রোল: ১৯০

নাজিফা হক, শ্রেণি: ৪র্থ, শাখা: সি, রোল: ১২০

রিফাত, শ্রেণি: ৪র্থ, শাখা: সি, রোল: ৬৬

আফসিয়ান

আরেফিন

ফাবিহা

তাসনিম

নাজিফা

রিফাত

স্থির চিত্রে
বিভিন্ন শ্রেণির শিক্ষার্থীবৃন্দ

শ্রেণিশিক্ষক: মো. তারিকুজ্জামান, শ্রেণি: নার্সারি, শাখা :ক

শ্রেণিশিক্ষক: স্বপ্না রানী দাস, শ্রেণি: নার্সারি, শাখা: খ

শ্রেণিশিক্ষক: রওশন আরা, শ্রেণি: নার্সারি, শাখা: গ

শ্রেণিশিক্ষক: মো. সাইফুল ইসলাম সুজন, শ্রেণি: নার্সারি, শাখা: ঘ

শ্রেণিশিক্ষক: ফাহিমা নাছরিন, শ্রেণি: নার্সারি, শাখা: ঙ

শ্রেণিশিক্ষক: অরুপা ঠাকুর শিল্পী, শ্রেণি: নার্সারি, শাখা: চ

শ্রেণিশিক্ষক: মো. মারুফ হাসান ভূঁইয়া, শ্রেণি: কেজি, শাখা: ক

শ্রেণিশিক্ষক: মাহবুবা আফরোজ, শ্রেণি: কেজি, শাখা: খ

শ্রেণিশিক্ষক: এস এম সোলায়মান, শ্রেণি: কেজি, শাখা: গ

শ্রেণিশিক্ষক: এস এম সোলায়মান, শ্রেণি: কেজি, শাখা: ঘ

শ্রেণিশিক্ষক: মো. নজরুল ইসলাম, শ্রেণি: কেজি, শাখা: ঙ

শ্রেণিশিক্ষক: শায়লা তায়েফ, শ্রেণি: কেজি, শাখা: চ

শ্রেণিশিক্ষক: শারমিন সুলতানা, শ্রেণি: প্রথম, শাখা: ক

শ্রেণিশিক্ষক: মো. জাকির হোসেন, শ্রেণি: প্রথম, শাখা: খ

শ্রেণিশিক্ষক: সুমাইয়া আফরিন আফসানা, শ্রেণি: প্রথম, শাখা: গ

শ্রেণিশিক্ষক: এনামুল হক সুমন, শ্রেণি: প্রথম, শাখা: ঘ

শ্রেণিশিক্ষক: এস এম রাশেদ রায়হান, শ্রেণি: প্রথম, শাখা: ঙ

শ্রেণিশিক্ষক: মো. মনজুরুল হক, শ্রেণি: প্রথম, শাখা: চ

শ্রেণিশিক্ষক: রেহানা পারভীন, শ্রেণি: দ্বিতীয়, শাখা: ক

শ্রেণিশিক্ষক: রোকসানা পারভীন, শ্রেণি: দ্বিতীয়, শাখা: খ

শ্রেণিশিক্ষকঃ স্বদেশ কুমার দত্ত, শ্রেণিঃ দ্বিতীয়, শাখাঃ গ

শ্রেণিশিক্ষকঃ আয়েশা আক্তার রুমা, শ্রেণিঃ দ্বিতীয়, শাখাঃ ঘ

শ্রেণিশিক্ষক: সাবিহা রহমান, শ্রেণি: দ্বিতীয়, শাখা: ঙ

শ্রেণিশিক্ষক: মো. শরীফ হোসেন, শ্রেণি: দ্বিতীয়, শাখা: চ

শ্রেণিশিক্ষক: মো. জসীম উদ্দিন, শ্রেণি: তৃতীয়, শাখা: ক

শ্রেণিশিক্ষক: মো. লিয়াকত আলী খান, শ্রেণি: তৃতীয়, শাখা: খ

শ্রেণিশিক্ষক: সাহিদা আক্তার, শ্রেণি: তৃতীয়, শাখা: গ

শ্রেণিশিক্ষক: মাঈনউদ্দীন আহমেদ মাহী, শ্রেণি: তৃতীয়, শাখা: ঘ

শ্রেণিশিক্ষক: নাহিদা আফরোজ, শ্রেণি: তৃতীয়, শাখা: ঙ

শ্রেণিশিক্ষক: মো. আরাফত হোসেন, শ্রেণি: তৃতীয়, শাখা: চ

শ্রেণিশিক্ষক: মো. আমিনুল ইসলাম, শ্রেণি: চতুর্থ, শাখা: ক

শ্রেণিশিক্ষক: মো. সুজন মিয়া, শ্রেণি: চতুর্থ, শাখা: খ

শ্রেণিশিক্ষক: জাহাঙ্গীর আলম, শ্রেণি: চতুর্থ, শাখা: গ

শ্রেণিশিক্ষক: ইমরান মাহমুদ, শ্রেণি: চতুর্থ, শাখা: ঘ

শ্রেণিশিক্ষক: খন্দকার মৌসুমী নাসরীন, শ্রেণি: চতুর্থ, শাখা: ঙ

শ্রেণিশিক্ষক: কাজী সুম্মন প্রিয়া, শ্রেণি: চতুর্থ, শাখা: চ

শ্রেণিশিক্ষক: মো. সেলিম উদ্দিন, শ্রেণি: পঞ্চম, শাখা: ক

শ্রেণিশিক্ষক: আব্দুর রহমান, শ্রেণি: পঞ্চম, শাখা: খ

শ্রেণিশিক্ষক: মো. শাহ জালাল মিয়া, শ্রেণি: পঞ্চম, শাখা: গ

শ্রেণিশিক্ষক: সঞ্জয় বিশ্বাস, শ্রেণি: পঞ্চম, শাখা: ঘ

শ্রেণিশিক্ষক: মো. মাজাহারুল ইসলাম, শ্রেণি: পঞ্চম, শাখা: ঙ

শ্রেণিশিক্ষক: মো. মাহবুব রহমান ফকির, শ্রেণি: পঞ্চম, শাখা: চ

শ্রেণিশিক্ষক: মো. আল আমিন, শ্রেণি: ষষ্ঠ, শাখা: ক

শ্রেণিশিক্ষক: ফাতেমা খাতুন, শ্রেণি: ষষ্ঠ, শাখা: খ

শ্রেণিশিক্ষক: সিদ্দিকা আক্তার জাহান, শ্রেণি: ষষ্ঠ, শাখা: গ

শ্রেণিশিক্ষক: জুলেখা আখতার, শ্রেণি: ষষ্ঠ, শাখা: ঘ

শ্রেণিশিক্ষক: মৌমিতা তালুকদার, শ্রেণি: ষষ্ঠ, শাখা: ঙ

শ্রেণিশিক্ষক: খালেদা বেগম, শ্রেণি: ষষ্ঠ, শাখা: চ

শ্রেণিশিক্ষক: মুহাম্মদ জানে আলম, শ্রেণি: সপ্তম, শাখা: ক

শ্রেণিশিক্ষক: ইলোরা ইমাম সম্পা, শ্রেণি: সপ্তম, শাখা: খ

শ্রেণিশিক্ষক: কে এ এম রাশেদুল হাসান, শ্রেণি: সপ্তম, শাখা: গ

শ্রেণিশিক্ষক: রোমানা হামিদ, শ্রেণি: সপ্তম, শাখা: ঘ

শ্রেণিশিক্ষক: রোকসানা বেগম, শ্রেণি: সপ্তম, শাখা: ঙ

শ্রেণিশিক্ষক: ফজলে মাসুদ, শ্রেণি: সপ্তম, শাখা: চ

শ্রেণিশিক্ষক: এম এ বারী রব্বানী, শ্রেণি: অষ্টম, শাখা: ক

শ্রেণিশিক্ষক: সোহাগ মনি দাস, শ্রেণি: অষ্টম, শাখা: খ

শ্রেণিশিক্ষক: ফৌজিয়া বেগম, শ্রেণি: অষ্টম, শাখা: গ

শ্রেণিশিক্ষক: এ কে এম খায়রুল হাসান আকন্দ, শ্রেণি: অষ্টম, শাখা: ঘ

শ্রেণিশিক্ষক: মাসুদ রানা, শ্রেণি: অষ্টম, শাখা: ঙ

শ্রেণিশিক্ষক: মো. আমিরুল ইসলাম, শ্রেণি: অষ্টম, শাখা: চ

শ্রেণিশিক্ষক: মুহাম্মদ কামাল হোছাইন, শ্রেণি: নবম, শাখা: ক

শ্রেণিশিক্ষক: রুবাইদা বিন্‌তে রহমান, শ্রেণি: নবম, শাখা: খ

শ্রেণিশিক্ষক: মো. সিরাজুল ইসলাম, শ্রেণি: নবম, শাখা: গ

শ্রেণিশিক্ষক: রেহানা সুলতানা, শ্রেণি: নবম, শাখা: ঘ

শ্রেণিশিক্ষক: মোহাম্মদ ফারুক মিঞা, শ্রেণি: নবম, শাখা: ঙ

শ্রেণিশিক্ষক: ফারিজা জামান, শ্রেণি: নবম, শাখা: চ

শ্রেণিশিক্ষক: মো. ইমতিয়াজ, শ্রেণি: নবম, শাখা: ছ

শ্রেণিশিক্ষক: এ কে এম শহীদ সারওয়ার, শ্রেণি: দশম, শাখা: ক

শ্রেণিশিক্ষক: মো. ওমর ফারুক, শ্রেণি: দশম, শাখা: খ

শ্রেণিশিক্ষক: মো. নূরুল ইসলাম, শ্রেণি: দশম, শাখা: গ

শ্রেণিশিক্ষক: মাহবুবা নূরুন্নেছা, শ্রেণি: দশম, শাখা: ঘ

শ্রেণিশিক্ষক: মো. আব্দুল অহিদ, শ্রেণি: দশম, শাখা: ঙ

শ্রেণিশিক্ষক: মো. মনোয়ার হোসেন, শ্রেণি: দশম, শাখা: চ

শ্রেণিশিক্ষক: আ ন ম মাহমুদুল হাসান, শ্রেণি: দশম, শাখা: ছ

শ্রেণিশিক্ষক: নাহিদ আরা, শ্রেণি: একাদশ, শাখা: এ (বিজ্ঞান)

শ্রেণিশিক্ষক: এস এম জাহিদুজ্জামান, শ্রেণি: একাদশ, শাখা: বি (বিজ্ঞান)

শ্রেণিশিক্ষক: মোহাম্মদ নাসির উদ্দিন মাহমুদ চৌধুরী, শ্রেণি: একাদশ, শাখা: সি (বিজ্ঞান)

শ্রেণিশিক্ষক: মুহাম্মদ আহসান হাবীব, শ্রেণি: একাদশ, শাখা: ডি (বিজ্ঞান)

শ্রেণিশিক্ষক: মো. নাজমুল হক মিজান, শ্রেণি: একাদশ, শাখা: ই (বিজ্ঞান)

শ্রেণিশিক্ষক: গৌতম চন্দ্র দাম, শ্রেণি: একাদশ, শাখা: এফ (মানবিক)

শ্রেণিশিক্ষক: সুলতান আহমেদ, শ্রেণি: একাদশ, শাখা: জি (মানবিক)

শ্রেণিশিক্ষক: মো. শাহীদুল ইসলাম, শ্রেণি: একাদশ, শাখা: এইচ (ব্যবসায় শিক্ষা)

শ্রেণিশিক্ষক: সোহেল মিয়া, শ্রেণি: একাদশ, শাখা: আই (বিজ্ঞান)

শ্রেণিশিক্ষক: মোহাম্মদ আতিকুর রহমান, শ্রেণি: দ্বাদশ, শাখা: এ (বিজ্ঞান)

শ্রেণিশিক্ষক: সাবিনা ফেরদৌসি, শ্রেণি: দ্বাদশ, শাখা: বি

শ্রেণিশিক্ষক: মো. মাহ্মুদুল হাসান, শ্রেণি: দ্বাদশ, শাখা: সি (বিজ্ঞান)

শ্রেণিশিক্ষক: সৈয়দ কাদিরুজ্জামান, শ্রেণি: দ্বাদশ, শাখা: ডি (বিজ্ঞান)

শ্রেণিশিক্ষক: মো. আনিসুজ্জামান রানা, শ্রেণি: দ্বাদশ, শাখা: আই (বিজ্ঞান)

শ্রেণিশিক্ষক: মো. মশিউর রহমান, শ্রেণি: দ্বাদশ, শাখা: ইংলিশ ভার্সন

শ্রেণিশিক্ষক: এমদাদুল হক, শ্রেণি: দ্বাদশ, শাখা: এফ (মানবিক)

শ্রেণিশিক্ষক: মো. মোমিনুল ইসলাম, শ্রেণি: দ্বাদশ, শাখা: জি (মানবিক)

শ্রেণিশিক্ষক: আব্দুল বাতেন, শ্রেণি: দ্বাদশ, শাখা: এইচ (ব্যবসায় শিক্ষা)

আলোকচিত্রে

সিপিএসসিএম

২০২২-২০২৩

পরিচালনা পর্ষদের নবাগত সভাপতি মহোদয়

সভাপতি মহোদয়কে ফুলেল শুভেচ্ছা জানাচ্ছেন অধ্যক্ষ

সভাপতি মহোদয়কে ব্রিফ প্রদান করছেন অধ্যক্ষ

পরিচালনা পর্ষদের নবাগত সভাপতি মহোদয়ের বরণ অনুষ্ঠান

সভাপতি মহোদয়কে প্রতিষ্ঠান এর অবকাঠামো সম্পর্কে ব্রিফ করছেন অধ্যক্ষ

সভাপতি মহোদয়ের প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন

সভাপতি মহোদয়ের শ্রেণিকক্ষ পরিদর্শন

সশস্ত্র বাহিনী দিবস

সশস্ত্র বাহিনী দিবস উপলক্ষে আয়োজিত রচনা প্রতিযোগিতা পরিদর্শনে পরিচালনা পর্ষদের প্রাক্তন সভাপতি ব্রিগেডিয়ার জেনারেল মোঃ মাহবুবুর রহমান ও অধ্যক্ষ মহোদয়

বিভিন্ন প্রতিযোগিতায় পুরস্কার প্রাপ্তদের মাঝে প্রতিষ্ঠানের অধ্যক্ষ লে. কর্নেল শামীম আহমেদ

একজন খুদে শিক্ষার্থীর চিত্রাংকন দেখছেন প্রাক্তন সভাপতি ও অধ্যক্ষ মহোদয়

একজন বিজয়ী শিক্ষার্থীকে মেডেল পরিয়ে
দিচ্ছেন প্রতিষ্ঠানের অধ্যক্ষ মহোদয়

সশস্ত্র বাহিনী দিবসে বক্তব্য রাখছেন
অধ্যক্ষ মহোদয়

বুদ্ধিজীবী দিবস

বুদ্ধিজীবী দিবস উপলক্ষে প্রকাশিত দেয়ালিকা 'শেখ রাসেল দেয়ালিকা'
উন্মোচন করছেন অধ্যক্ষ মহোদয়

বুদ্ধিজীবী দিবস উপলক্ষে আয়োজিত রচনা প্রতিযোগিতা
পরিদর্শন করছেন প্রাক্তন সভাপতি ও অধ্যক্ষ মহোদয়

আলোচনা করছেন ফারিজা জামান, সহ. শিক্ষক

আলোচনা করছেন সুলতান আহমেদ, প্রভাষক

উন্মোচিত 'শেখ রাসেল দেয়ালিকা' পরিদর্শন
করছেন অধ্যক্ষ মহোদয় ও অন্যান্য শিক্ষকমণ্ডলী

বিজয় দিবস

মহান বিজয় দিবস উপলক্ষে আয়োজিত বিভিন্ন প্রতিযোগিতায় বিজয়ী শিক্ষার্থীদের মাঝে পুরস্কার প্রদান করছেন প্রাক্তন সভাপতি ও অধ্যক্ষ মহোদয়

বিজয় দিবসে বক্তব্য রাখছেন প্রাক্তন সভাপতি মহোদয়

চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগিতা পরিদর্শন করছেন অধ্যক্ষ মহোদয়

পুরস্কারপ্রাপ্তদের মাঝে প্রাক্তন সভাপতি ও অধ্যক্ষ মহোদয়

বিজয় দিবস উপলক্ষে শিক্ষক কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের মাঝে আয়োজিত ব্যাডমিন্টন খেলার একটি দৃশ্য

শ্রেষ্ঠ ব্যাডমিন্টন খেলোয়াড় হিসেবে অধ্যক্ষ মহোদয় প্রাক্তন সভাপতি মহোদয়ের নিকট থেকে পুরস্কার নিচ্ছেন

প্রাক্তন সভাপতি মহোদয়ের নিকট থেকে একজন বিজয়ী শিক্ষক পুরস্কার নিচ্ছেন

চতুর্থ শ্রেণির একজন কর্মচারীর হাতে পুরস্কার তুলে দিচ্ছেন প্রাক্তন সভাপতি মহোদয়

অফিস কর্মকর্তা, তৃতীয় ও চতুর্থ শ্রেণির খেলোয়াড়দের মাঝে অধ্যক্ষ মহোদয়

অমর একুশে

ভাষা শহীদদের প্রতি শ্রদ্ধাঞ্জলি নিবেদনের জন্য ও প্রভাতফেরির প্রস্তুতি পর্বে অধ্যক্ষ মহোদয়, অন্যান্য শিক্ষক ও শিক্ষার্থীবৃন্দ

ভাষা শহীদদের প্রতি শ্রদ্ধাঞ্জলি নিবেদন

একুশে ফেব্রুয়ারি উদযাপনের অংশ হিসেবে বিভিন্ন প্রতিযোগিতা পরিদর্শন করছেন অধ্যক্ষ মহোদয়

সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে শিক্ষার্থীদের সংগীত পরিবেশনা

একজন পুরস্কারপ্রাপ্ত শিক্ষার্থীর হাতে পুরস্কার তুলে দিচ্ছেন অধ্যক্ষ মহোদয়

পুরস্কারপ্রাপ্তদের মাঝে অধ্যক্ষ মহোদয়

‘আমার ভাইয়ের রক্তে রাঙানো একুশে ফেব্রুয়ারি, আমি কি ভুলিতে পারি’ গানটির সাথে কণ্ঠ মিলাচ্ছেন অধ্যক্ষ মহোদয়, অন্যান্য শিক্ষক ও শিক্ষার্থীবৃন্দ

আলোচনা করছেন প্রাক্তন সভাপতি মহোদয়

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ম্যুরালে পুষ্পস্তবক অর্পণ

ঐতিহাসিক ৭ই মার্চ দিবস

একজন শিক্ষার্থীর বঙ্গবন্ধুর ভাষণ পরিবেশন

প্রাক্তন সভাপতি মহোদয়ের নিকট থেকে পুরস্কার গ্রহণ করছে একজন শিক্ষার্থী

পুরস্কারপ্রাপ্ত শিক্ষার্থীদের সাথে
প্রাক্তন সভাপতি মহোদয় ও অধ্যক্ষ

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ১০৩ তম জন্মদিন ও জাতীয় শিশু দিবস

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ১০৩ তম জন্মদিন উপলক্ষে দেয়ালিকা উন্মোচন ও পরিদর্শন করছেন প্রাক্তন সভাপতি ব্রিগেডিয়ার জেনারেল হাফিজুর রহমান

জন্মদিন উপলক্ষে আয়োজিত প্রতিযোগিতার বিজয়ী শিক্ষার্থীদের মাঝে পুরস্কার প্রদান করছেন অধ্যক্ষ মহোদয়

অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখছেন অধ্যক্ষ মহোদয়

সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে শিক্ষার্থীদের সংগীত পরিবেশনা

জাতির পিতার ম্যুরালে পুষ্পস্তবক অর্পণ

মহান স্বাধীনতা ও জাতীয় দিবস

২৬ শে মার্চ স্বাধীনতা দিবস উপলক্ষে আয়োজিত দেয়াল পত্রিকা উন্মোচন ও পরিদর্শন করছেন প্রাক্তন সভাপতি মহোদয়

২৬ শে মার্চ স্বাধীনতা ও জাতীয় দিবসে বক্তব্য রাখছেন অধ্যক্ষ মহোদয়

বিজয়ী শিক্ষার্থীদের মাঝে পুরস্কার প্রদান করছেন অধ্যক্ষ মহোদয়

বিজয়ী শিক্ষার্থীদের মাঝে পরিচালনা পর্ষদের প্রাক্তন সভাপতি, অধ্যক্ষ মহোদয় ও অন্যান্য শিক্ষকবৃন্দ

মুজিবনগর দিবস উপলক্ষে আয়োজিত আলোচনা সভায় বক্তব্য রাখছেন অধ্যক্ষ মহোদয়

একজন খুদে শিক্ষার্থী বক্তব্য রাখছে

মুজিবনগর দিবস

অধ্যক্ষ মহোদয় ও অন্যান্য শিক্ষকগণ আলোচনা শুনছেন

মুজিবনগর দিবস উপলক্ষে দোয়ার আয়োজন

'শেখ রাসেল দেয়ালিকা' পরিদর্শন করছেন প্রাক্তন সভাপতি মহোদয় ও অধ্যক্ষ

শেখ রাসেল দিবস উপলক্ষে বৃক্ষরোপণ করছেন অধ্যক্ষ মহোদয়

শেখ রাসেল দিবসে শিক্ষার্থীদের সংগীত পরিবেশনা

চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগিতা

শেখ রাসেল দিবস

শেখ রাসেল দিবস উপলক্ষে আয়োজিত ফুটবল খেলা উদ্বোধন করছেন অধ্যক্ষ মহোদয়

ফুটবল খেলার একটি দৃশ্য

বীর মুক্তিযোদ্ধা শেখ কামাল এর জন্মবার্ষিকী

জন্মবার্ষিকী উপলক্ষে আয়োজিত অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখছেন অধ্যক্ষ মহোদয়

বিজয়ী শিক্ষার্থীর হাতে পুরস্কার তুলে দিচ্ছেন অধ্যক্ষ মহোদয়

শিক্ষার্থীদের রচনা প্রতিযোগিতা

চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগিতা পরিদর্শনে অধ্যক্ষ মহোদয়

বঙ্গমাতা বেগম ফজিলাতুন নেছা মুজিবের ৯৩তম জন্মবার্ষিকী

শেখ ফজিলতুন্নেসা মুজিব এর জন্মদিন উপলক্ষে আয়োজিত চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগিতা পরিদর্শন করছেন অধ্যক্ষ মহোদয়

শিক্ষার্থীদের অঙ্কন পর্যবেক্ষণ করছেন অধ্যক্ষ মহোদয়

শিক্ষার্থীদের রচনা প্রতিযোগিতা পরিদর্শনে অধ্যক্ষ মহোদয়

খুদে শিক্ষার্থীরা তাদের আঁকা ছবি প্রদর্শন করছে

বঙ্গবন্ধুর জুলিও কুরি শান্তি পদক প্রাপ্তি দিবস

অধ্যক্ষ মহোদয় বক্তব্য রাখছেন

জুলিও কুরি শান্তি পদকপ্রাপ্তি দিবস উপলক্ষে বিভিন্ন প্রতিযোগিতায় বিজয়ীদের মাঝে অধ্যক্ষ মহোদয়

বিজয়ীদের মাঝে পুরস্কার বিতরণ

অনুষ্ঠান উপভোগ করছেন
অধ্যক্ষ মহোদয়সহ শিক্ষক ও শিক্ষার্থীবৃন্দ

বঙ্গবন্ধুর ম্যুরালে পুষ্পস্তবক অর্পণ

শোক দিবসে অধ্যক্ষ মহোদয়ের বক্তব্য প্রদান

জাতীয় শোক দিবস

শোক দিবস উপলক্ষে প্রদর্শিত দেয়ালিকা পরিদর্শন করছেন অধ্যক্ষ মহোদয় ও শিক্ষার্থীরা

শোক দিবস উপলক্ষে বিভিন্ন প্রতিযোগিতায় পুরস্কারপ্রাপ্তদের মাঝে অধ্যক্ষ মহোদয়

বিশ্বকবির জন্মবার্ষিকী উপলক্ষে আয়োজিত অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখছেন অধ্যক্ষ মহোদয়

সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণকারী শিক্ষার্থীদের মাঝে অধ্যক্ষ মহোদয়

জন্মবার্ষিকী উপলক্ষে আয়োজিত অনুষ্ঠানে
সঙ্গীত ও নৃত্য পরিবেশনা

বাংলা নববর্ষ উদযাপন

শুভ নববর্ষ ১৪৩০ উপলক্ষে আয়োজিত অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখছেন অধ্যক্ষ মহোদয়

নববর্ষ উপলক্ষে শিক্ষার্থীদের বিভিন্ন ফেস্টুন প্রদর্শন

নববর্ষের গানে কণ্ঠ মিলাচ্ছেন অধ্যক্ষ মহোদয়, অন্যান্য শিক্ষক ও শিক্ষার্থীবৃন্দ

বই উৎসব

শিক্ষার্থীদের মাঝে অধ্যক্ষ মহোদয়

একজন শিক্ষার্থীর হাতে বই তুলে দিয়ে বই উৎসব উদ্বোধন করছেন অধ্যক্ষ মহোদয়

ফল উৎসব

ফল উৎসব পরিদর্শন করছেন অধ্যক্ষ মহোদয়

ফল উৎসবে বিভিন্ন ধরনের ফলের প্রদর্শন

আন্তঃহাউস সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতা

সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতায় সংগীত পরিবেশন

সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতায় নৃত্য পরিবেশন

বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা

আন্তঃহাউস বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা ২০২৩ এর প্রথম দিনে অধ্যক্ষ মহোদয় ও অধ্যক্ষ-পত্নীকে শিক্ষার্থীরা বরণ করে নিচ্ছে

অধ্যক্ষ মহোদয় কুচকাওয়াজ এর সালাম গ্রহণ করছেন

বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতার ১ম দিনে বিশেষ অতিথি হিসেবে পুরস্কার প্রদান করছেন অধ্যক্ষ-পত্নী

মশাল প্রজ্জ্বলন

বেলুন উড়িয়ে প্রতিযোগিতার
উদ্বোধন করছেন অধ্যক্ষ মহোদয়

প্রথম দিনে খেলার একটি দৃশ্য

শিক্ষার্থীদের কুচকাওয়াজ প্রদর্শন এবং
অধ্যক্ষ মহোদয়ের সালাম গ্রহণ

সমাপনী দিবসে প্রধান অতিথিকে ফুলের তোড়া দিয়ে স্বাগত জানাচ্ছেন উপাধ্যক্ষ মহোদয় ও সহকারী প্রধান শিক্ষক

যেমন খুশি তেমন সাজো এর একটি দৃশ্য

সমাপনী দিবসের খেলা উদ্বোধন করছেন প্রাক্তন সভাপতি মহোদয় ও অধ্যক্ষ মহোদয়

সমাপনী দিবসের মার্চপাস্ট

খেলা উপভোগ করছেন প্রাক্তন সভাপতি ও অধ্যক্ষ মহোদয়

কুচকাওয়াজে সালাম গ্রহণ করছেন
প্রাক্তন সভাপতি মহোদয়

আন্তঃহাউস বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা ২০২৩ এর সমাপ্তি ঘোষণা করছেন
প্রাক্তন সভাপতি মহোদয়

মার্চপাস্ট এর সালাম গ্রহণের জন্য মঞ্চে উপবিষ্ট অধ্যক্ষ ও প্রাক্তন সভাপতি মহোদয়

শিক্ষার্থীদের মার্চপাস্ট পরিদর্শনের জন্য মঞ্চের দিকে এগিয়ে আসছেন প্রাক্তন সভাপতি মহোদয়

মনোজ্ঞ মার্চপাস্ট

বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা ২০২৩ এ চ্যাম্পিয়ন দল জাহাঙ্গীর হাউস

ড্রাম বাদক দল

দৌড় প্রতিযোগিতার একটি দৃশ্য

সার্বিক বিচারে চ্যাম্পিয়ন দল জয়নুল হাউস

বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা ২০২৩ এ রানার আপ এবং
সার্বিক বিচারে চ্যাম্পিয়ন দল জয়নুল হাউস

দেশের ইতিহাস, ঐতিহ্য ও সাম্প্রতিক উন্নয়নকে তুলে ধরে

মনোজ্ঞ ডিসপ্লে

নবীন বরণ

একজন শিক্ষার্থীর নৃত্য পরিবেশন

নবীন শিক্ষার্থীদের স্বাগত জানাচ্ছেন উপাধ্যক্ষ মহোদয়

নবীনদের উদ্দেশে বক্তব্য রাখছেন অধ্যক্ষ মহোদয়

নবীন শিক্ষার্থীকে মানপত্র প্রদান করছে কলেজ প্রিফেক্ট

শিক্ষার্থীদের সংগীত পরিবেশনা

অধ্যক্ষ মহোদয়ের সাথে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে অংশ নেয়া শিক্ষার্থীদের ফটোসেশন

ইন-হাউস প্রশিক্ষণ কর্মশালা

নতুন কারিকুলামে দক্ষতা বৃদ্ধি ও শিক্ষকদের মানউন্নয়নে প্রশিক্ষণ কর্মশালা

ইন-হাউস প্রশিক্ষণ কর্মশালা উদ্বোধন ও শিক্ষকদের প্রশিক্ষণ দিচ্ছেন অধ্যক্ষ মহোদয়

এইচএসটিটিআই -এর প্রাক্তন পরিচালক অধ্যাপক রোখসানা বেগম প্রশিক্ষণ দিচ্ছেন

সনদপত্র বিতরণ করছেন অধ্যক্ষ মহোদয়

অধ্যক্ষ মহোদয় অফিস কর্মকর্তা-কর্মচারী ও চতুর্থ শ্রেণির কর্মচারীদের প্রশিক্ষণ প্রদান করছেন

অফিস কর্মকর্তা-কর্মচারী ও চতুর্থ শ্রেণির কর্মচারীদের প্রশিক্ষণ গ্রহণ

শিক্ষার গুণগত মান উন্নয়নে আন্তঃ ক্যান্টনমেন্ট প্রশিক্ষণ কর্মশালা উদ্বোধন করছেন অধ্যক্ষ মহোদয়

আন্তঃ ক্যান্টনমেন্ট মাণসম্মত শিক্ষা প্রশিক্ষণ কর্মশালা

অতিথি প্রশিক্ষক প্রশিক্ষণ প্রদান করছেন

কলেজ শিক্ষার্থীদের অভিভাবকগণের সমাবেশে বক্তব্য রাখছেন অধ্যক্ষ মহোদয় ও পাশে উপাধ্যক্ষ মহোদয়

স্কুল শিক্ষার্থীদের অভিভাবকগণের সমাবেশে সহকারী প্রধান শিক্ষক মহোদয়ের বক্তব্য

অভিভাবক বৃন্দ

সম্মানিত জিওসি মহোদয়ের সাথে আন্তঃ ক্যান্টনমেন্ট বিতর্ক প্রতিযোগিতায় (স্কুল বাংলা) রানার আপ দল ও অধ্যক্ষ

কলেজ পর্যায়ে আন্তঃ ক্যান্টনমেন্ট বিতর্ক (ইংরেজি) প্রতিযোগিতায় ঘাটাইল অঞ্চলে চ্যাম্পিয়ন দল

শ্রেষ্ঠ বিতার্কিককে ক্রেস্ট প্রদান করছেন প্রাক্তন সভাপতি মহোদয়

চ্যাম্পিয়ন হাউসকে ট্রফি প্রদান করছেন প্রাক্তন সভাপতি মহোদয়

বিতর্ক প্রতিযোগিতা

প্রতিষ্ঠানে আন্তঃহাউস বিতর্ক প্রতিযোগিতার আয়োজন

বৃক্ষরোপণ করছেন অধ্যক্ষ মহোদয়

বৃক্ষরোপণ করছেন প্রাক্তন সভাপতি মহোদয়

বৃক্ষরোপণ অভিযান

মোমেনশাহী ক্যান্টনমেন্ট কর্তৃক আয়োজিত বৃক্ষরোপন অভিযানের র‍্যালিতে সিপিএসসিএম পরিবারবর্গ

বৃক্ষরোপণ শেষে দোয়ার আয়োজন

বিদায় সংবর্ধনা

বিদায়ী সভাপতি মহোদয়ের দিকনির্দেশনামূলক বক্তব্য

পরিচালনা পর্ষদের প্রাক্তন সভাপতি ব্রিগেডিয়ার জেনারেল মো. মাহবুবুর রহমান মহোদয়কে ক্রেস্ট প্রদান করছেন অধ্যক্ষ

পরিচালনা পর্ষদের প্রাক্তন সভাপতি ব্রিগেডিয়ার জেনারেল মো. হাফিজুর রহমান মহোদয়কে ক্রেস্ট প্রদান করছেন অধ্যক্ষ

বিদায়ী সভাপতি মহোদয়ের দিকনির্দেশনামূলক বক্তব্য

দীর্ঘ ৩০ বছর চাকুরী শেষে অবসরে মো. নুরুর রহমান স্যার

সিনিয়র শিক্ষক মো. নুরুর রহমান স্যারকে ক্রেস্ট প্রদান করছেন অধ্যক্ষ মহোদয়

মো. নুরুর রহমান স্যারের অভিব্যক্তি প্রকাশ

২০২৩ সালে স্বেচ্ছায় বিদায় নেওয়া শিক্ষকবৃন্দ

এম. এন. তামান্না
এডুকেশনাল সাইকোলজিস্ট

সোহাগ মনি দাস
সিনিয়র শিক্ষক

সঞ্জয় বিশ্বাস
সহকারী শিক্ষক

মাজাহারুল ইসলাম
সহকারী শিক্ষক

মো. শাহ জালাল মিয়া
সহকারী শিক্ষক

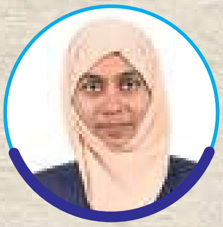

শারমিন সুলতানা
সহকারী শিক্ষক

জাহাঙ্গীর আলম
সহকারী শিক্ষক

এস এম রাশেদ রায়হান
সহকারী শিক্ষক

মো. আমিনুল ইসলাম
সহকারী শিক্ষক

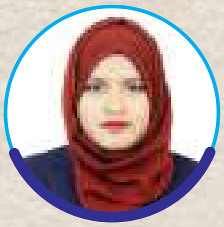

জুয়েনা জাহান এ্যানি
সহকারী শিক্ষক

এইচএসসি শিক্ষার্থীদের বিদায় অনুষ্ঠান

বিদায়ী শিক্ষার্থীদের উদ্দেশে অধ্যক্ষ মহোদয় বক্তব্য রাখছেন

বিদায়ী শিক্ষার্থীকে পরীক্ষার সরঞ্জাম তুলে দিচ্ছেন অধ্যক্ষ

বিদায়ী শিক্ষার্থীদের উদ্দেশে বক্তব্য দিচ্ছেন উপাধ্যক্ষ

বিদায়ী শিক্ষার্থীদের জন্য দোয়ার আয়োজন

শিক্ষাসফর

কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ে জার্ম প্লাজম সেন্টারে অধ্যক্ষ, শিক্ষক ও শিক্ষার্থীরা

বঙ্গবন্ধু সাফারী পার্কে শিক্ষার্থীরা

প্রাথমিক শাখার শিক্ষার্থীদের সাথে অধ্যক্ষ

বিবিধ

চার হাউসের প্রাক্তন স্কুল প্রিফেক্ট

সেনাবাহিনীর গ্রীষ্মকালীন মহড়া পরিদর্শনে অধ্যক্ষ ও শিক্ষার্থীরা

খুদে শিক্ষার্থীদের ক্রীড়া সামগ্রী উপহার দিচ্ছেন অধ্যক্ষ

অধ্যক্ষ মহোদয়ের সাথে
অনুষদ স

অধ্যক্ষ মহোদয়ের সাথে
স্কুল ও কলেজ শাখার
অনুষদ সদস্যবৃন্দ

থ স্কুল ও কলেজ শাখার
সদস্যবৃন্দ

অধ্যক্ষ মহো
প্রশাসনিক কর্মকর্তা-কর্মচ

দয়ের সাথে
ারী ও অফিস সহায়কবৃন্দ